A
DISCOURSE ON THE BENGALI
LANGUAGE AND LITERATURE.

(WITH A BRIEF ACCOUNT OF THE LIVES OF THE FAMOUS BENGALI)
AUTHORS TOGETHER WITH SHORT CRITICISMS ON THEIR WORKS.

SECOND EDITION,

BY

RAMGATI NYAYARATNA.

বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য
বিষয়ক প্রস্তাব।

(বিখ্যাত বাঙ্গালাগ্রন্থকারগণের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও
তাঁহাদের রচিত গ্রন্থসকলের কিঞ্চিৎসমালোচনাসমেত)

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীরামগতিন্যায়রত্নপ্রণীত।

চুঁচুড়া।

রামযন্ত্রে

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

Price 2 Rupees 8 Anas. মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা।

উৎসর্গপত্র।

পরমার্চ্চনীয়

হলধর চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য

পিতৃঠাকুরমহাশয়চরণেষু—

পিতঃ!

পূজ্য, শ্রদ্ধাস্পদ, হিতৈষী ও আত্মীয়জনকে লোকে প্রিয়বস্তু দানকরিয়াথাকে। তোমার ন্যায় পরমপূজ্য, পরমশ্রদ্ধাস্পদ, পরমহিতৈষী ও পরমাত্মীয় ব্যক্তি জগতে আমার কেহই ছিল না। অতএব আমার অনেক পরিশ্রমের বস্তু এই 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' খানি তোমার স্বর্গীয়চরণোপান্তে সমর্পণ করিলাম ইতি। তাং ১২ই আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৯৫।

ত্বদীয় বৎসলপুত্র

শ্রীরামগতি দেবশর্ম্মা।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইল। এই সংস্করণে স্থলবিশেষে অনেক পরিবর্ত্তন ও অনেক পরিবর্দ্ধন হইয়াছে—এবং কোন কোন বিষয় নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথম-বার মুদ্রিত পুস্তকের কতিপয় খণ্ড প্রথমভাগ ও কতিপয় খণ্ড দ্বিতীয় ভাগ নামেও প্রকাশিত হইয়াছিল, এবারে আর তাহা করা হইল না—একখণ্ডেই সমগ্র পুস্তক প্রকাশিত হইল। ইতি

হুগলী নর্ম্মালবিদ্যালয়
২২এ ভাদ্র সংবৎ ১৯৪৪

শ্রীরামগতি শর্ম্মা।

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক বৃহৎ হইয়া উঠিল,দেখিয়া ইহার কিয়দংশের কতিপয় খণ্ড প্রথমভাগ নামে পূর্ব্বে প্রচারিত করিয়াছিলাম। এক্ষণে অবশিষ্টাংশের কতিপয় খণ্ড দ্বিতীয়ভাগ নামে প্রকাশকরিয়া উভয় ভাগেরই অপর সমুদয় খণ্ড এক সম্পূর্ণ খণ্ডে প্রকাশিত করিলাম। এই সমগ্র গ্রন্থ ৪টী পরিচ্ছেদে বিভক্ত। বর্ত্তমানাবস্থ বাঙ্গালা অক্ষর ও বাঙ্গালাভাষা কোন্ সময় হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে,প্রথম পরিচ্ছেদে তদ্বিষয়ের বিচার ও মীমাংসা করিবার চেষ্টা করাগিয়াছে। বাঙ্গালা অক্ষরের সময়নিরূপণপ্রসঙ্গে রাজা লক্ষ্মণসেনের প্রদত্ত যে তাম্রশাসনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তদঙ্কিত সমগ্রবিষয়টী লিথোগ্রাফে মুদ্রিতকরিয়া এক একখণ্ড এই পুস্তকমধ্যে নিবেশিত করিতে আমাদের অতিশয় ইচ্ছা ছিল, কারণ তাহাহইলে,সেইসময়ে এদেশে কিরূপ অক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহা পাঠকগণ স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে,আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়াও সে তাম্রশাসনখানি আর এক বার হস্তগত করিতে পারিলামনা! মজীলপুরের জমীদার শ্রীযুত বাবু হরিদাসদত্ত মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত উহার একটী প্রতিলিপি আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন,গ্রন্থের শেষভাগে আমরা উহা অবিকল মুদ্রিতকরিলাম। ত্রিবেণীর ৺হলধরচূড়ামণিমহাশয়

বিস্তর পরিশ্রম করিয়া ঐ সনন্দের লিপি পাঠ করিয়াছিলেন। তিনিও সমুদয় অক্ষর বুঝিতে পারেননাই—অবুদ্ধ স্থলে স্বয়ং যোজনা করিয়াদিয়াছেন। সন তারিখের স্থল অস্পষ্টই রহিয়াছে। এইরূপে উহার রচনা অনেক বিকৃত হওয়ায়,স্থানে স্থানে স্পষ্টরূপে অর্থ বুঝিতে পারাযায়না—এই জন্যই আমরা উহার বাঙ্গালা অনুবাদ করিলামনা,সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকগণ যতদূর পারেন,উহার অর্থকরিয়া লইবেন। ঐ তাম্রশাসনে যে,'খাড়ীমণ্ডলী'শব্দ দেখিতেপাওয়াযায় অদ্যাপি সুন্দরবন মধ্যে ঐ খাড়ীপরগণা ও খাড়ীগ্রাম বর্ত্তমান আছে।

পূর্ব্বোল্লিখিত প্রথমভাগ প্রচারিত হইলে পর কয়েকখানি প্রসিদ্ধসংবাদ-পত্র এবং কয়েকজন বিজ্ঞমহোদয় অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাতে যেরূপ অভি-প্রায় ব্যক্তকরিয়াছেন,তাহা আমাদের এই সামান্য পুস্তকের পক্ষে বিলক্ষণ উৎসাহবর্দ্ধকই হইয়াছে। তবে কোন কোন মহাশয় ভাষার সময়নিরূপণ ও রূপান্তরতাপ্রাপ্তিবিষয়ে স্থলবিশেষে আমাদের মতেরপ্রতিকূলেওকিঞ্চিৎ বলিয়াছেন। তাহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরাও যেমন কেবল যুক্তি ও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ওবিষয়েযাহা কিছু বলিয়াছি, প্রতিকূলবাদীরাও তাহাই করিয়াছেন। যেহেতু অন্য কোনরূপ প্রমাণদ্বারা উহাতে কিছু প্রতিপন্ন করিবার উপায় নাই। হইতে পারে যে,তাঁহাদের যুক্ত্যাদি আমাদের যুক্ত্যাদি অপেক্ষা প্রবল, কিন্তু অনেক চিন্তা করিয়াও আমাদের বিবেচনায় তাহা কোন মতে বোধহইলনা। অতএব আমরা নিরপেক্ষ পাঠক মহাশয়দিগকে মধ্যস্থ মানিলাম,তাঁহারা এবিষয়ের যথার্থ মীমাংসা করিবেন।

বাঙ্গালাভাষার অবস্থাভেদে আমরা আদ্য,মধ্য ও ইদানীন্তননামে তিনটী কালের কল্পনা করিয়াছি, এবং প্রথম হইতে চৈতন্য দেবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কালকে আদ্যকাল, চৈতন্যদেব হইতে ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কালকে মধ্যকালএবং ভারতচন্দ্র হইতে অদ্য পর্য্যন্ত কালকে ইদানীন্তনকাল নামে অভিহিত করিয়াছি। দ্বিতীয়পরিচ্ছেদে আদ্যকালোৎপন্ন কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বিবরণ, তাঁহাদের রচিত গীতসমূহের সঙ্ক্ষিপ্ত সমালোচন এবং ঐ কালে বাঙ্গালাভাষার যেরূপ অবস্থা ছিল,বোধ হইয়াছে, তাহা

লিপিবদ্ধ হইয়াছে।ঐ পরিচ্ছেদে চৈতন্যদেবকর্ত্তৃক, বিদ্যাপতিবিরচিত-গীতশ্রবণ এবং গোবিন্দ দাসকর্ত্তৃক চৈতন্যলীলাবর্ণন—এই উভয়ের প্রদর্শনদ্বারা আমরা নিঃসংশয়রূপে প্রতিপাদন করিয়াছি যে, বিদ্যাপতি চৈতন্যদেবের পূর্ব্বকালীন ও গোবিন্দদাস উত্তরকালীন লোক ছিলেন। অতএব সে বিষয়ে অন্যরূপ অভিপ্রায় যাহা শুনিতেপাওয়াযায়,তাহা তত বিশ্বাসার্হ হয়না। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস উভয়ের ভণিতিযুক্ত ২। ৪টী কল্পিত গীত,যাহা শুনিতে পাওয়াযায়,অনেকে এই উপাখ্যান বলিয়া তাহার সমাধান করেন যে, রাজা শিবসিংহের মহিষী লছিমাদেবীর সহিত বিদ্যাপতির প্রসক্তি ছিল এবং লছিমাকে না দেখিলে তাঁহার কবিত্ব নিঃসৃত হইতনা। রাজা এই বিষয় অবগত হইয়া সন্দেহভঞ্জনার্থ মধ্যে মধ্যে বিদ্যাপতিকে গৃহে রুদ্ধ করিয়া কবিতা রচিতে বলিতেন; বিদ্যাপতি তাহাতে অসমর্থ হইলে লছিমা কার্য্যান্তরব্যপদেশেঐ গৃহের গবাক্ষপথে উপস্থিত হইয়া দেখাদিতেন এবং অমনি বিদ্যাপতির মুখ হইতে কবিতা নিঃসৃত হইত। এইরূপে যে সকল কবিতা রচিত হয়, তাহা অসম্পূর্ণ ছিল। যাহা হউক রাজা ইহাতে পরম ক্রুদ্ধহইয়া বিদ্যাপতিকে শূলে দেন,বিদ্যাপতি শূলবিদ্ধ-হৃদয় হইয়াও অকস্মাৎ লছিমাকে তথায় দর্শন ও গীতার্দ্ধরচনা করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। অনন্তর বহুকাল পরে (কাহার মতে ১৪৮৯ শকে) গোবিন্দদাস প্রাদুর্ভূত হইয়া ঐ সকল গীতার্দ্ধের পূরণ করেন,এই জন্য ঐ সকল গীতে উভয়ের ভণিতি দেখিতে পাওয়াযায়' ইত্যাদি।———

যাহাহউক এই পরিচ্ছেদে আমরা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের জীবনবৃত্ত-সংক্রান্ত অধিক কথা বলিতে পারিনাই—যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহাও অনুমানমাত্রমূলক। কিন্তু গত১০ই পৌষের সোমপ্রকাশে কোন পত্রপ্রেরক এই ভাবে লিখিয়াছেন যে,"জিলা যশোহরের অন্তর্গত ভূর্শটুর নামকগ্রামে ১৩৫৫ শকে ব্রাহ্মণজাতীয় ভবানন্দরায়ের ঔরসে বিদ্যাপতির জন্ম হয় এবং ১৪০৩শকে ৪৮ বৎসর বয়সে নবদ্বীপে তাঁহার পরলোক হয়। উহাঁর প্রকৃত নাম বসন্তরায়—বিদ্যাপতি উপাধিমাত্র। উহাঁর রচিত পদাবলীর নাম বসন্তসুকুমার কাব্য। চণ্ডীদাসের ১৩৩৯ শকে জন্ম ও ১৩৯৯ শকে

মৃত্যু হয়। ইহাঁর পিতার নাম দুর্গাদাস বাগচী—ইহাঁরা বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইহাঁর রচিত গ্রন্থের নাম গীতচিন্তামণি " ইত্যাদি—যাহাহউক, পত্রপ্রেরক মহাশয়দিগের এইসকল উক্তি কতদূর প্রামাণিক,তাহা আমরা জানিনা।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ভিন্ন আর কাহারও পদ্যরচনার কথা আমরা এই পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিনাই—কিন্তু ঐ কালে যে, আর কাহারও পদ্যরচনা ছিলনা, সে কথাও বলি নাই। প্রসিদ্ধ 'খনার বচন' সকল ঐ কালের পদ্য। যেরূপ প্রসিদ্ধি, তাহাতে খনা রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নান্তর্গত মিহিরের পত্নী ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের সময় প্রায় ২০০০ বৎসর হইল। এ প্রসিদ্ধি যদি সত্য হয়, তবে তৎকালোৎপন্না খনা যে, বাঙ্গালাভাষায় বচনরচনা করিয়াছিলেন, তাহা কোন মতে সম্ভব নহে। অতএব বোধ হয়,এক্ষণকার প্রচলিত খনার বাঙ্গালাবচনসকল খনার রচিত নহে—কাহারও কর্তৃক সংস্কৃত বা প্রাকৃতাদি হইতে ভাষান্তরিত। কিন্তু সেই ভাষান্তরও যে, অল্পকালের নহে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। আমরা এক ব্যক্তির নিকট সংবাদ পাইয়াছি যে, ১৩১৪ [১৩৯২ খৃঃ অ] শকে লিখিত এক বাঙ্গালা পুস্তকে খনার বচনার্থ সকল প্রকাশিত আছে—যদি তাহা সত্য হয়,তবে তাহারও বহুদিন পূর্ব্বে খনার বচন সকল প্রচলিত ছিল, বলিতে হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে চৈতন্যদেবের সংক্ষিপ্তবিবরণ, মধ্যকালোৎপন্ন কবি বৃন্দাবনদাস,কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কৃত্তিবাস, (বা কীর্ত্তিবাস) কবিকঙ্কণ, ক্ষেমানন্দ—কেতকাদাস, কাশীরামদাস, রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও রামপ্রসাদসেন ইহাঁদের যথালব্ধ জীবনবৃত্ত ও ইহাঁদের রচিতচৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থসকলের সমালোচনা সন্নিবদ্ধ হইয়াছে।

রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর সমালোচনাবসরে আমরা প্রাণরামচক্রবর্ত্তিপ্রণীত কালিকামঙ্গল পাই নাই লিখিয়াছিলাম এবং ঐ পুস্তকের সন্ধান পাইবার বাসনায় কয়েক সপ্তাহ ব্যাপিয়া এডুকেশন গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম, কিন্তু তৎকালে কোন মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক

আমাদের বাসনা পূরণ করেন নাই। কিন্তু সম্প্রতি দেখিতেছি যে, গত ৫ই মাঘ হইতে ৪ সপ্তাহের এডুকেশন গেজেটে একজন পত্রপ্রেরক কালিকামঙ্গলের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ যদি প্রকৃত হয়, তবে ১৫৮৮ শকেঅর্থাৎ ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচনার কিঞ্চিদধিক ১০০বৎসর পূর্ব্বে কালিকামঙ্গল রচনা সমাপ্ত হইয়াছিল এবং উহাতে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান সমগ্রভাবে বর্ণিত আছে; কিন্তু যখন্ এপর্য্যন্তও সে পুস্তক দেখিতে পাই নাই, তখন্ তদ্বিষয়ে এখনও কিছু বলিতে পারিলাম না।

চতুর্থ বা শেষপরিচ্ছেদে ইদানীন্তনকালে প্রাদুর্ভূত ভারতচন্দ্র রায়, দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নিধিরাম গুপ্ত, রামবসু, হরুঠাকুর, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, রামমোহন রায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দাশরথি রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ভূদেবমুখোপাধ্যায়, রঙ্গলালবন্দ্যোপাধ্যায়, রামনারায়ণ তর্করত্ন, দীনবন্ধু মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্রচট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাথবিদ্যাভূষণ, প্রভৃতি (লোকান্তরগত ও জীবিত) কতিপয় বাঙ্গালা গ্রন্থকার মহাশয়ের বিস্তৃত বা সঙ্ক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থসকলের সমালোচনা প্রদত্ত হইয়াছে; বাঙ্গালাভাষার বর্ত্তমান অবস্থা এবং তাহা কিরূপ হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ও কিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইয়াছে; বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ছন্দ ও অলঙ্কারের কথাও যথাস্থলে অভিহিত হইয়াছে; এবং পরিশেষে যে সকল গ্রন্থকারের বিষয়ে আমরা এক্ষণে বিশেষরূপে কিছু বলিতে পারিলাম না, তাদৃশ কতিপয় মহাশয়ের নামাবলীও কীর্ত্তিত হইয়াছে।

সমালোচনা পাঠকরিলে সমালোচ্যগ্রন্থদর্শনে পাঠকদিগের ইচ্ছা জন্মিতে পারে, কিন্তুঅমুদ্রিত গ্রন্থের সমালোচনা করিলে তাঁহাদের সে ইচ্ছা সকল স্থলে চরিতার্থ হইতে পায়না। এইজন্য যেসকল গ্রন্থাদি মুদ্রিত ওপ্রকাশিত হইয়াছে, আমরা তাহারই সমালোচনা করিয়াছি, সমালোচনার বিশেষ যোগ্য হইলেও অমুদ্রিত বলিয়া অনেক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিনাই। মুদ্রিত গ্রন্থাদিও যে, অনেকই অস্পৃষ্ট রহিল, সে কথা বলাই বাহুল্য।

যাহা হউক মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে 'শিশুবোধ'নামক পুস্তকখানি দেশমধ্যে বড়ই প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালায় ইহা অতিশয় সমাদৃত ছিল। ইহাতে বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া বৈষয়িক নানাবিধ জ্ঞানগর্ভক বিষয়ের উপদেশ আছে। শুভঙ্করদাস নামক (বোধহয়) কোন কায়স্থের রচিত অঙ্ক ও নানারূপ হিসাববিষয়ক আর্য্যা সকল ইহাতে নিবিষ্ট আছে এবং কবিকঙ্কণ রচিত গঙ্গাবন্দনা, কবিচন্দ্ররচিত কলঙ্কভঞ্জন ও দাতাকর্ণ, অযোধ্যারামকৃত গুরুদক্ষিণা, এবং প্রহ্লাদচরিত ও চাণক্যশতক নামে কয়েকটী পদ্য আছে। পূর্ব্বে কেবল সেইগুলি অভ্যাস করিয়াই অনেকে বাঙ্গালাভাষায় কৃতবিদ্য বলিয়া পরিচয় দিতেন। নিশ্চিত সময় বলিতে পারা না যাউক, কিন্তু ভাষাগত কোন কোন শব্দদর্শন করিলে, এদেশে মুসলমানদিগের প্রাদুর্ভাব হইবার পর যে, শুভঙ্করের আর্য্যাসকল রচিত হইয়াছিল, তাহা অনুমিত হয়।

ইদানীন্তনকালের মধ্যে কত কত মহাশয় যে, নানাবিষয়ক রচনা করিয়া বাঙ্গালাভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, তাহার সঙ্খ্যা করা দুষ্কর। তন্মধ্যে কলিকাতার ঠন্ঠনেনিবাসী ৺লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসের ও শোভাবাজারনিবাসী ৺গঙ্গানারায়ণলস্করের পাঁচালী, পাণ্ডুয়ার সন্নিহিত তাঁবাগ্রামনিবাসী ৺পরমানন্দঅধিকারীর তুক্ক, মুর্শীদাবাদান্তর্গত বেলডাঙ্গানিবাসী ৺রূপঅধিকারীর চপ, বর্দ্ধমানান্তঃপাতী চুপীগ্রামনিবাসী ৺রঘুনাথরায়ের (দেওয়ান মহাশয়ের) ও ৺নরচন্দ্রের শ্যামাবিষয়ক গীত, উলুসেগোপালনগরনিবাসী ৺ মধুসূদন কাইনের কীর্ত্তন, বাঁশবেড়েনিবাসী ৺শ্রীধরকবিরত্নের আদিরসসংক্রান্ত গীত, ৺গোপালেউড়ে, ৺গোবিন্দচন্দ্র অধিকারী, ৺বদনচন্দ্র অধিকারী, ৺নীলকমলসিংহ, ৺দুর্গাচরণঘড়িয়াল, ৺মদনমোহন মাষ্টার প্রভৃতি যাত্রাওয়ালাদিগের সঙ্গীত—এ সকলও বাঙ্গালাভাষার পুষ্টিসাধনপক্ষে সাধারণ সাহায্য করে নাই। আমরা বাহুল্যভয়ে এসমস্তে হস্তক্ষেপ করিতে না পারিয়া দুঃখিত রহিলাম।

অতঃপর আমার উপকারপ্রাপ্তিজন্য কৃতজ্ঞতাস্বীকার করিবার অবসর। আমি এই পুস্তক সঙ্কলনবিষয়ে কত মহাশয়ের নিকট—কত বিষয়ে—

কতরূপ যে সাহায্য পাইয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই, সুতরাং সেই সমস্ত সাহায্যদাতৃমহাশয়ের নামোল্লেখ করিয়া কৃতজ্ঞতাস্বীকার করা একপ্রকার অসাধ্যব্যাপার। অতএব আমি বিনয়াঞ্জলিসহকারে একবারে সাধারণ্যে স্বীকার করিতেছি যে, এই পুস্তকসম্পর্কে যে কোন মহাশয় যে কোন বিষয়ের জন্য আমার যে কিছু সাহায্য করিয়াছেন, আমি তদর্থ তাঁহার নিকট যাবজ্জীবনকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিব; কখনও তাঁহার কৃত উপকার বিস্মৃত হইবনা। কিন্তু এস্থলে আমার প্রিয়তম ছাত্র বহরমপুরনিবাসী পরমক্ষেমাস্পদ শ্রীযুক্তবাবু রামদাসসেনের নাম পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ না করা আমার পক্ষে অনুচিত কার্য্য করা হয়। রামদাস ধনিসন্তান ও অল্পবয়স্ক পুরুষ, কিন্তু ধন ও বয়সের অল্পতা একত্র সমবেত হইলে সচরাচর যে সকল দোষের সজ্ঘটন হয়, রামদাসে সে সকলের কিছু মাত্র নাই। রামদাস অতি বিনয়ী, নিরহঙ্কার, প্রিয়ভাষী ও সদনুষ্ঠানরত। বিদ্যানুশীলনই তাঁহার একমাত্র উপজীব্য। তিনি এপর্য্যন্ত বিলাপতরঙ্গ, কবিতালহরী ও কবিতা কলাপ নামে ৩ খানি পদ্যপুস্তক রচনা করিয়াছেন এবং সর্ব্বদাই প্রধান প্রধান সাময়িকপত্রে স্বরচিত প্রবন্ধ সকল প্রকাশ করিতেছেন। তিনি নিজ ভবনে একটী উৎকৃষ্ট পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছেন, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা যেসকল পুস্তক ক্রয়করিতে পাওয়াযায়, সেসকল পুস্তকই প্রায় ঐপুস্তকালয়ে সংগৃহীত হইয়াছে। আমি এই পুস্তকের রচনাসময়ে আবশ্যকবোধে যখন্ যে বাঙ্গালা পুস্তক দেখিতে চাহিয়াছি, রামদাসবাবু আহ্লাদ ও আগ্রহসহকারে তখন্ই সেই পুস্তক আমাকে প্রদান করিয়াছেন। অধিক কি, রামদাসবাবুর ঐ পুস্তকালয় নিকটে না থাকিলে বহরমপুরে থাকিয়া এই পুস্তক রচনা করা আমার পক্ষে কতদূর কঠিন হইত, তাহা বলিতে পরিনা।

পরিশেষে বিজ্ঞপাঠকমহাশয়দিগের নিকট আমার বিনয়বচনে নিবেদন ও প্রার্থনা এই যে, আমি এই গ্রন্থপ্রণয়নের জন্য সংবাদ সংগ্রহে সাধ্যমত যত্ন করিতে ত্রুটি করি নাই, কিন্তু এ প্রকার গ্রন্থ যেরূপ হইলে লোকের শ্রদ্ধাস্পদ হইতে পারে, সেরূপ করিতে পারিয়াছি, তাহা কোন মতে সম্ভব নহে। ইহাতে বিস্তর ভ্রম—বিস্তরঅসঙ্গতি—ও বিস্তর দোষ আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এতদ্বিধ পুস্তক রচনাপক্ষে ইহা এক প্রকার প্রথম উদ্যম, অন্ততঃ এ অনুরোধেও যদি তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সেই সকল ভ্রমাদি মার্জ্জনাকরেন এবং উপদেশবাক্যে সেই গুলি আমাকে দেখাইয়া দেন, তাহাহইলে তাঁহাদের নিকট অপরিসীম কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব। ইত্যলম্।

বহরম্‌পুর কালেজ।
১২ই আষাঢ় সংবৎ ১৯৩০।

শ্রীরামগতি শর্ম্মা।

সূচীপত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালা ভাষা ও অক্ষর ১—১৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাঙ্গালাভাষাবিষয়ে কালভেদ ১৮
আদ্যকাল .. ২০
বিদ্যাপতি ... ২১
চণ্ডীদাস ... ২৫
এই কালে ভাষার অবস্থা ২৭
" " ছন্দঃ ৩৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মধ্যকাল—চৈতন্যদেব ৪০
চৈতন্যভাগবত ... ৪৪
চৈতন্যচরিতামৃত ... ৪৯
কৃত্তিবাস—রামায়ণ ... ৫২
কবিকঙ্কণ—চণ্ডী ... ৬৬
মনসার ভাসান ... ৮৫
কাশীরাম—মহাভারত ... ৯০
রামেশ্বরশিবসঙ্কীর্ত্তন ... ১০১
রামপ্রসাদ— কবিরঞ্জন ... ১০৯
মধ্যকালের ভাষাদি ... ১২৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ইদানীন্তনকাল ... ১২৭
ভারতচন্দ্র ও তৎকৃতপুস্তকাদি ১২৮
গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী ... ১৪৭
গীত ও কবিতা ... ১৫০
নিধিরামগুপ্ত ... ১৫০
রামবসু—হরুঠাকুর প্রভৃতি ১৫১
ইঙ্গরেজকৃত বাঙ্গালার উন্নতি ১৫৩
প্রবোধচন্দ্রিকা ... ১৫৬
রামমোহনরায় ও তৎকৃত পুস্তকাদি ১৫৯
মদনমোহনতর্কালঙ্কার ও ঐঐ ১৬৪
ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত ও ঐঐ ১৭৪
দাশরথিরায় ও ঐঐ ১৮১
শ্রীঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর ও ঐঐ ১৮৪
অক্ষয়কুমারদত্ত ও ঐঐ ২০১
মাইকেলমধুসূদনদত্ত ও ঐঐ ২১০
শ্রীভূদেব মুখো ও ঐঐ ২২৫
রঙ্গলাল বন্দ্যো ও ঐঐ ২৩৬
রামনারায়ণতর্করত্ন ও ঐঐ ২৪৩
দীনবন্ধুমিত্র ও ঐঐ ২৪৯
আলালেরঘরেরদুলাল প্রভৃতি ২৬০
গ্রন্থের অবলম্বনীয় ভাষা বিষয়ক বিচার ২৬৪
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টো ও ঐঐ ২৬৯
দ্বারকানাথবিদ্যাভূষণ ও ঐঐ ২৮৭
শ্রীহেমচন্দ্রবন্দ্যোপাধ্যায় ও ঐঐ ২৯০
সাময়িক পুস্তিকা... ২৯৮
পঞ্জিকা ৩০১
সংবাদপত্র ৩০২
ব্যাকরণ ৩০৬
ছন্দ ৩০৭
অলঙ্কার ৩১০
ভাষা ৩১১
সাধারণ ভ্রম ৩১৩
উপসংহার ৩১৭
লক্ষ্মণসেনের দত্ত সনন্দ পত্রের প্রতিলিপি ৩২৩

——:০:——

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য

বিষয়ক প্রস্তাব।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কোন ভাষার লক্ষণ নির্দ্দেশকরা সহজ নহে। যেরূপেই কর, তাহা অনায়াসে অন্যের হৃদয়ঙ্গম হয় না। বাঙ্গালীদিগের মাতৃভাষারই নাম বাঙ্গালাভাষা' ইহা বাঙ্গালাভাষার এক প্রকার লক্ষণ হয় বটে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে দোষস্পর্শশূন্য হয় না। অতএব এস্থলে আমরা বাঙ্গালাভাষার লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিতে না যাইয়া এই মাত্র বলিব যে, এই প্রস্তাব বাঙ্গালাভাষাতেই লিখিত হইতেছে।

ভাষাতত্ত্বের প্রকৃতি ভূতত্ত্বশাস্ত্রের প্রকৃতির ন্যায়;—উভয়েরই মূলভাগ নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। যেরূপ ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলিতে পারেন না যে, কোন্ কালে অমুক ভূভাগের প্রথম স্তরের সৃষ্টি হইয়াছে—কোন্ কালে ও কিরূপ ক্রমে উহার দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি স্তর সকল উহাতে বিন্যস্ত হইয়াছে, এবং কোন্ কালেই বা ঐ সকল স্তর বিসারিত, বিপ্লুত বা বিপর্য্যস্ত হইয়া ঐ ভূভাগকে বর্ত্তমান অবস্থায় অবস্থাপিত করিয়াছে; সেইরূপ ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও কোন ভাষার প্রারম্ভবিষয়ে অথবা সেই ভাষায় পূর্ব্বপূর্ব্বে অসংখ্যরূপ যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তদ্বিষয়ে কালের ক্রম কিছুই বলিতে পারেন না। ভূতত্ত্ববিৎ বলিতে পারেন যে, অমুক দেশের উপরিস্থ মৃত্তিকার প্রকৃতি এইরূপ; সেই মৃত্তিকার নিম্নে অমুক প্রকার মৃত্তিকা বা প্রস্তর আছে, কিন্তু সেই সকল মৃত্তিকা বা প্রস্তর কোন্ সময়ে এবং কিরূপে ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়াছে, তাহার তিনি কিছুই বলিতে পারেন না। ভাষাতত্ত্বজ্ঞও সেইরূপ বলিতে

পারেন যে, অমুক ভাষার প্রকৃতি এইরূপ—ঐ ভাষার মূলে অমুক ভাষা বা অমুক জাতীয় ভাষার শব্দের যোগ আছে; কিন্তু কোন্ সময়ে যে ঐ মূল ভাষার শব্দ জন্মিয়াছিল, বা তাহা বর্ত্তমান ভাষার মধ্যে আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছিল, তাহার তিনি কিছুই বলিতে পারেন না। মাতৃ-ভাষার তত্ত্বনিরূপণ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্রচিত্ত হইয়া অনেকে এরূপ মনে করেন যে, স্বদেশের তাদৃশ প্রাচীন ইতিহাস থাকিলে, ভাষার সৃষ্টি বিবরণ অনেক দূর জানা যাইত, কিন্তু অপরে তাহা সম্ভব মনে করেন না। তাঁহারা কহেন, কোন দেশেরই তাদৃশ ইতিহাস নাই—এবং থাকিতেও পারে না। কারণ, ইতিহাস যতই প্রাচীন পুরুষ হউন না কেন, তিনি ভাষারই একটী অপত্য ভিন্ন আর কিছুই নহেন। তিনি কেমন করিয়া আপনার জননীর জন্মবিবরণ জানিবেন? যেরূপ অগ্রে দেশ জন্মে, তৎপরে তাহাতে লোকের বসতি হয়, সেইরূপ অগ্রে ভাষা জন্মে, তৎপরে তাহাতে পুরাণই বল—ইতিহাসই বল—আর যাহাই বল—বিরচিত হয়।

বাঙ্গালাভাষার প্রারম্ভ কোন্ সময়ে ও কিরূপে হয় এবং কোন্ সময়ে কোন্ ভাষান্তর তাহাতে আসিয়া মিশ্রিত হয়, এ সকল চিন্তা করিতে গেলে মনকে অপার অতীত কালসাগরে নিক্ষিপ্ত করিতে হয়; কিন্তু তাহা করিয়াও আশানুরূপ ফললাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব তাহা না করিয়া শেষের যে কয়েক শতাব্দীর লিপিবদ্ধ গ্রন্থাদি পাওয়া-যায়, তাহা হইতেই তথ্যানুসন্ধান করা আবশ্যক বোধ হয়। ভূতত্ত্বজ্ঞেরা পৃথিবীর তলাতল রসাতল পর্য্যন্তের কোন সংবাদ রাখেন না; তাঁহারা উহার উপরিস্থ ত্বক্‌মাত্রের বিবরণ লিখিয়াই আপনাদের বিশাল শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। ভাষাতত্ত্বজ্ঞেরাও সেইরূপ ইতিহাস জন্মিবার পূর্ব্ব-সময়রূপ রাত্রিকালের কোন সংবাদ দিতে পারেন না—কাব্যারুণের উদয় হইলেই তাঁহাদের চক্ষু উন্মীলিত হয়, এবং তাহার আলোকেই যাহা দেখিতে পান, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া আপনাদের শাস্ত্র সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

সংস্কৃতেই ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়াযায়। তন্ত্রশাস্ত্র সংস্কৃতে লিখিত। তন্ত্রশাস্ত্রে বাঙ্গালা অক্ষরের বর্ণন আছে। কামধেনু-তন্ত্রে লিখিত আছে—

"অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি ককারতত্ত্ব মুত্তমং।
বামরেখা ভবেদ্ ব্রহ্মা বিষ্ণু র্দক্ষিণরেখিকা॥
অধোরেখা ভবেদ্ রুদ্রো মাত্রা সাক্ষাৎ সরস্বতী।
কুণ্ডলী অঙ্কুশাকারা মধ্যে শূন্যঃ সদাশিবঃ॥
ঊর্দ্ধকোণে স্থিতা কামা ব্রহ্মশক্তি রিতীরিতা।
বামকোণে স্থিতা জ্যেষ্ঠা বিষ্ণুশক্তি রিতীরিতা॥
দক্ষকোণে স্থিতা বিন্দু রৌদ্রী সংহারকারিণী।
ত্রিকোণ মেতৎ কথিতম্" ইত্যাদি।

'একণে আমি ককারের তত্ত্বনিরূপণ করিব। উহার বামরেখা ব্রহ্মা, দক্ষিণরেখা বিষ্ণু, অধোরেখা মহেশ্বর, মাত্রা সরস্বতী, অঙ্কুশাকারা অর্থাৎ আকুঁড়ি কুণ্ডলীনামক দেবতা এবং মধ্যস্থ শূন্য সদাশিব। ককারের ঊর্দ্ধকোণে কামানামে ব্রহ্মশক্তি, বামকোণে জ্যেষ্ঠা নামে বিষ্ণুশক্তি এবং দক্ষিণকোণে বিন্দু নামে রুদ্রশক্তি অবস্থিত আছেন। ককার ত্রিকোণ' ইত্যাদি।

এইরূপ বর্ণনা বাঙ্গালা ককার ব্যতিরেকে দেবনাগরের ককারে কথন সঙ্গত হয় না। কারণ উহা (क) ত্রিকোণ নহে। তন্ত্রে অপরাপর বর্ণেরও এইরূপ বিবরণ আছে। সুতরাং স্মৃতি ও রামায়ণাদির ন্যায় তন্ত্রশাস্ত্রকে অতি প্রাচীন কালের গ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস করিলে বাঙ্গালা অক্ষরও অতি প্রাচীন কালের অক্ষর বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তন্ত্রের ভাষা ও বর্ণিত বিষয়াদির পর্য্যালোচনা করিয়া একণে অনেকেই তন্ত্রকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের গ্রন্থ বলিয়াই বিবেচনা করেন। যাহাই হউক কোন কোন তন্ত্র খুব আধুনিক হইতে পারে, কিন্তু সকল তন্ত্রই যে তত আধুনিক, তাহা বোধ হয় না। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য

'দীক্ষাতত্ত্ব' নামে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। দীক্ষা তান্ত্রিক সংস্কার—বৈদিক নহে। ঐ পুস্তকে তিনি বীরতন্ত্র যোগিনীতন্ত্র প্রভৃতি কয়েকখানি তন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। রঘুনন্দন গৌড়ের নবাব হোসেন সাহের (১) সমসাময়িক—অর্থাৎ এক্ষণ হইতে প্রায় ৩৭৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত, বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, রঘুনন্দনের সময়ে তন্ত্রশাস্ত্রের বিশেষ প্রাদুর্ভাব না থাকিলে তিনি অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব মধ্যে দীক্ষাতত্ত্ব লিখিতেন না। আমাদের দেশে—যেখানে মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার ছিল না, সেখানে যে অতি অল্পকালের মধ্যেই কোন গ্রন্থ বিশেষরূপে প্রচলিত হইবে, তাহা সম্ভব নহে। অতএব রঘুনন্দনের বহু পূর্ব্বে যে, তন্ত্রশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল ও তন্ত্রবর্ণিত বাঙ্গালা অক্ষর বিদ্যমান ছিল, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। ঐ কামধেনুতন্ত্র যে কত কালের গ্রন্থ তাহা জানিবার কোন উপায় নাই।

সুন্দরবনের মৃত্তিকার মধ্যহইতে যে কয়েক খানি তাম্রশাসন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার একখানি (২) আমরা দেখিয়াছি। উহা রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে কোন ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত ভূমির সনন্দপত্রস্বরূপ। ঐ তাম্রসাশন সংস্কৃত পদ্য ও গদ্যে অঙ্কিত। কলিকাতার দক্ষিণ জয়নগর-নামক গ্রামের কোন জমীদার উহা পাইয়াছিলেন। উহার অক্ষর-সকল অদ্ভুবিধ;—তাহা না দেবনাগর না বাঙ্গালা;—কতকগুলির দেব-নাগরের, ও কতকগুলির বাঙ্গালার সহিত সাদৃশ্য আছে। অতএব অনুমান হয়, দেবনাগর হইতে বাঙ্গালা অক্ষর উৎপন্ন হইবার সন্ধিকালে ঐরূপ অক্ষর হইয়াছিল। এই সনন্দদাতা লক্ষ্মণসেন যে, বল্লাল সেনেরই পুত্র, তাহা সনন্দেই উল্লিখিত আছে। এই লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকাল প্রায়

---

(১) হোসেন সা ১৪৮৯ হইতে ১৫২০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জ্যোতিস্তত্ত্বের "বিষুবং মীনকন্যার্দ্ধে ত্রেকাক্ষীন্দ্র শকাব্দকে" এই বচনে যে, ১৪৩১ শকের (১৫০৯ খৃঃ অব্দের) উল্লেখ আছে, তাহাও এ অনুমানের বিসম্বাদী হইতেছে না।

(২) ঐ তাম্রশাসনে লিখিত বিষয়ের প্রতিলিপি পুস্তকের শেষে প্রকাশিত রহিল।

৮০০ বৎসর অতীত হইল, অতএব বলা যাইতে পারে যে, ঐ সময়েই দেবনাগর হইতে বাঙ্গালা অক্ষরের উদ্ভব হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

দেবনাগর হইতেই যে বাঙ্গালা অক্ষর উদ্ভূত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অদ্যাপি দেখা যায়—

ग	घ	ङ	ड	थ	न	प	म	य	श
গ	ঘ	ঙ	ড	থ	ন	প	ম	য	শ

প্রভৃতি বর্ণগুলি উভয় বর্ণমালাতেই প্রায় একরূপ। দেবনাগর ভারতবর্ষের প্রায় সমস্তদেশব্যাপক ও অতিপ্রাচীন বলিয়াই চিরপ্রসিদ্ধ; বাঙ্গালা কেবল এই দেশেই প্রচলিত এবং আধুনিক বলিয়াই উহাকে সকলে জানে, সুতরাং বিপরীত অনুমান সঙ্গত হয় না। এক্ষণকার পুস্তকে মুদ্রিত যে বাঙ্গালা অক্ষর দেখা যায়, তাহাই যে প্রাচীনকালের বাঙ্গালাঅক্ষর নহে, তদ্বিষয়ে স্পষ্টই প্রমাণ আছে। এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়দিগের গৃহে ৩।৪ শত বৎসরের হস্তলিখিত যে সকল সংস্কৃত পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অক্ষর সকল এক্ষণকার অক্ষর অপেক্ষা অনেক ভিন্ন। সচরাচর ঐ সকল অক্ষরকে 'তিরুটে' (বোধ হয় ত্রিহূটে) অক্ষর বলে। ঐ অক্ষরে দেবনাগরের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। দেবনাগরে অন্তঃস্থ ব ও বর্গীয় ব বিভিন্ন প্রকার; ঐ তিরুটে অক্ষরেও দুই বকারের বিভিন্নতা দেখাযায়—যথা অন্তঃস্থ বকার (ব) এইরূপ, বর্গীয় বকার (ব) এইরূপ এবং রকার (ৰ) এইরূপ। এক্ষণকার বাঙ্গালা বর্ণমালায় বকারদ্বয়ের কিছুমাত্র ভেদ নাই এবং রকার পূর্ব্বকালীন অন্তঃস্থ বকারের সমানাকার হইয়াছে। প্রাচীন রকার যে অধিক দিন ভিন্নবেশ হইয়াছে তাহা নহে। অদ্যাপি পল্লীগ্রামের প্রাচীন গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালায় 'করপারা ব পেটকাটা' বলিয়া রকার লেখান হইয়া থাকে।

যাহা হউক বাঙ্গালা অক্ষর যে ৮০০ বৎসরেরও পূর্ব্ব হইতে ইহার বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এক প্রকার

বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু বাঙ্গালাভাষা যে, কোন্ সময়ে ঐরূপ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।—ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা নানাবিধ প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া কহিয়া থাকেন যে, অতি পূর্ব্বকালে ইরাণ দেশে (প্রাচীন পারস্যে) এক প্রকার ভাষা ছিল, তাহা ইউরোপে যাইয়া রূপান্তর গ্রহণপূর্ব্বক লাটিন, গ্রীক, জর্ম্মন্ প্রভৃতি এবং আসিয়ায় উপস্থিত হইয়া ঐ প্রকারে সংস্কৃত ও জেন্দ (প্রাচীনপারস্য) ভাষার উৎপাদন করিয়াছে। উক্ত সমুদায় ভাষাকে এক্ষণে সাধারণতঃ এরিয়ান্ অর্থাৎ আর্য্যভাষা কহে। আর্য্যভাষাসকলের বর্ণমালা, উচ্চারণ, প্রকৃতি, প্রত্যয়, বিভক্তি, বচন, ধাতু, উপসর্গ প্রভৃতির অনেকাংশে চমৎকার-জনক সাদৃশ্য আছে—এরূপ সাদৃশ্য যে, অনেক স্থলে বোধহয় যে, একই কথা কেবল ভিন্ন ভিন্ন রূপে উচ্চারিত হয় বলিয়াই কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ শুনায়। প্রফেসর্ বপ্, মাক্স মূলর্, মিউর্ প্রভৃতি মহা-মহোপাধ্যায়গণ ভূরি ভূরি প্রমাণসহকৃত বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়া এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। আমরা তদ্বিষয়ে আর বাগাড়ম্বর না করিয়া কেবল উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটী আর্য্যভাষার একবিধ কথা নিম্নভাগে প্রদর্শন করিলাম।

সংস্কৃত।	জেন্দ্।	গ্রীক্।	লাটিন্।	সংস্কৃত।	জেন্দ্।	গ্রীক্।	লাটিন্।
প্রথমা	ফ্রাথিমা	প্রোতা	প্রাইমা	নামন্	নাম	অনমা	নোমেন্
দ্বিতীয়া	বিত্যা	দিউতেরা	„	মাতৃ	মাদর্	মাতর্	মাতর্
তৃতীয়া	থ্রিত্যা	ত্রিতা	„	পিতৃ	পদর্	পাতর্	পাতর্
ষষ্ঠী	„	হেক্তা	সেক্ষ্টা	ভ্রাতৃ	ব্রাদর্	ফ্রাতিয়া	ফ্রাটর্
সপ্তমী	হপ্তমা	হেব্দমা	সেপ্তিমা	দুহিতৃ	দোখ্তর	থুগাতর্	„
অহম্	আজেম্	„	„	দ্বি	দো	দুও	দুও
ত্বম্	তুম্	„	তু	পঞ্চন্	পঞ্জ	পেন্‌চি	„
দন্তম্	„	অদন্ত	দেন্তেম্	দশন্	„	দেকী	দেশেম্
নক্তম্	„	নক্তম্	নক্তম্	ইত্যাদি—ইত্যাদি			

এই সমস্ত ভাষাকে প্রধানভাষা কহে। ইঙ্গরেজি ওরূপ নহে। উহা লাটিন গ্রীক্ সাক্সন্ প্রভৃতি নানা ভাষার সহযোগে উৎপন্ন হওয়ায় অপ্রধান ভাষা মধ্যে পরিগণিত। নিম্নলিখিত কয়েকটী উদাহরণে স্পষ্ট দৃষ্ট হইবে যে, উহাতেও সংস্কৃতসম শব্দের বহুল অন্তর্নিবেশ আছে—যথা

সংস্কৃত	ইঙ্গরেজি		সংস্কৃত	ইঙ্গরেজি	
স্থা	ষ্টে	Stay.	ঘাস	গ্রাস্	Grass.
গো	কৌ	Cow.	উপরি	অপর্	Upper.
উক্ষা	অক্স	Ox.	দ্বিবাদ	ডিবেট্	Debate.
কেন্দ্র	সেণ্ট্র	Centre.	রূঢ়	রুড্	Rude.
ত্রিপদী	ত্রিপদ্	Triped.	অন্তর্	ইণ্টর্	Inter.
হোরা	আউয়ার্	Hour.	জ্ঞা	(ক্নো) নো	Know.
মানব	মান্	Man.	সর্প	সর্পেণ্ট	Serpent.
নস্	নোস্	Nose.	অক্ষ	অক্জিল্	Axle.
ত্রিকোণ	ত্রিগণ্	Trigon.	দ্বার	ডোর্	Door.
দ্বৈধ	ডাউট্	Doubt.	মূষা	মৌস্	Mouse.
স্বসৃ	সিষ্টর্	Sister.	অন্ত্র	এণ্ট্রেল্স্	Entrails.
দ্বিপদ	বাইপদ্	Biped.	পথ	পাথ্	Path.
নাভি	নেভেল্	Navel.	উলূক	আউল	Owl.
নাবী	নেবি	Navy.			&c.
নূ	নিউ	New.			

কোরাইওলেনস্, রোমিয়স্, জূলিয়স্, ব্রূটস্ ইত্যাদি স্থলে শেষে যে স্ কার দৃষ্ট হয়, অনেকে কহেন উহা সংস্কৃতের প্রথমাবিভক্তির একবচন-নিষ্পন্ন পদের অন্তভাগের অনুরূপ; অর্থাৎ সংস্কৃতে অকারান্ত শব্দের প্রথমাবিভক্তির একবচনে স্ কারাগম হয়—যথা রাম শব্দে 'রামস্'; পরে ঐ সকার বিসর্গ হইয়া 'রামঃ' হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের মতে কোরাইওলেন, রোমিয়, জূলিয় ও ব্রূট ইত্যাদি অকারান্ত

শব্দই প্রথমে ছিল; পরে উহা প্রথমাবিভক্তিযুক্ত হইয়া ঐরূপ সকারান্ত হইয়াছে এবং কালক্রমে সেই প্রথমান্তপদসকলই শব্দরূপে পরিগণিত হইয়াগিয়াছে। যাহাহউক, এ সকল দুর্ব্বিগাহ বিষয়ে অবগাহন চেষ্টা ত্যাগ করিয়া এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

অনেকে কহিয়াথাকেন যে, ঐ সংস্কৃতভাষা বাঙ্গালার জননী—অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত সংস্কৃত হইতেই বাঙ্গালাভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু আমাদের তাহা বোধ হয় না;—আমাদের বোধে বাঙ্গালা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন নহে, কিন্তু পরম্পরা সম্বন্ধে। সংস্কৃত গ্রন্থগণের মধ্যে বেদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া পরিগণিত। বেদের সংস্কৃত দুরূহ দুরুচ্চার্য্য ও শ্রুতিকটু। বেদরচনার বহুকাল পরে রামায়ণ, সংহিতা, মহাভারত, তন্ত্র, পুরাণ ও কাব্যাদি অপেক্ষাকৃত সুখোচ্চার্য্য ও সুকোমল ভাষায় ক্রমশঃ রচিত হইয়াছে। এমন কি পশ্চাদুল্লিখিত গ্রন্থসকলের ভাষা ও বেদের ভাষা এরূপ বিভিন্ন যে, উহাকে যেন একভাষা বলিয়াই বোধ হয় না। এক্ষণকার প্রচলিত ব্যাকরণসকল ও প্রচলিত সাহিত্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বেদের ভাষাবোধে সম্যক্ অধিকারী হওয়া যায় না। প্রাচীন পাণিনীয় ব্যাকরণে বেদভাষাবোধার্থ 'বৈদিকপ্রক্রিয়া' নামে একটী পৃথক্ প্রকরণ আছে। বর্ত্তমানকালে বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপনাদির তাদৃশ চর্চ্চা না থাকায় উহা সচরাচর অধীত হয় না এবং আধুনিক ব্যাকরণসমস্তে ঐ ভাগ একবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। মুগ্ধবোধকার বোপদেবগোস্বামী সর্ব্বশেষে একটী সূত্র দিয়াছেন—

"বহুলং ব্রহ্মণি"

"যদিদং লৌকিকপ্রয়োগব্যুৎপত্তয়ে লক্ষণ মুক্তং তদ্বৈদিক প্রয়োগব্যুৎপত্তৌ বহুলং জ্ঞেয়ং; কচিদ্বিহিতং নস্যাৎ, ক্বচিন্নিষিদ্ধং স্যাৎ, কচিদ্বাস্যাৎ কচিদুক্তাৎতোহন্যস্যাপীত্যর্থঃ—পূর্ব্বেভিঃ ব্রাহ্মণাস্ ইত্যাদৌ বেদসিদ্ধেঃ।"

'লৌকিক প্রয়োগসিদ্ধির নিমিত্ত যে সকল সূত্র কথিত হইল, বৈদিক প্রয়োগে তত্তৎ সূত্রের অনেক বিপরীত কার্য্যও সম্পাদিত হইবে—অর্থাৎ কোন স্থলে বিহিত কার্য্যও হইবে না—কোন স্থলে নিষিদ্ধ কার্য্যও হইবে—কোন স্থলে বিকল্পে হইবে ইত্যাদি—যথা-পূর্ব্ব শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে 'পূর্ব্বৈঃ' না হইয়া 'পূর্ব্বেভিঃ'; ব্রাহ্মণ শব্দের প্রথমার বহুবচনে ব্রাহ্মণা না হইয়া 'ব্রাহ্মণাস্' ইত্যাদি—

যাহা হউক আমাদিগের বোধ হইতেছে যে, বেদের ভাষা কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হওয়ায় যেরূপ পুরাণাদির কোমলতর সংস্কৃত জন্মিয়াছিল, সেইরূপ পুরাণাদির সংস্কৃতও ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত এবং স্থল বিশেষে ভারতবর্ষের আদিমনিবাসিগণের ভাষার সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া সহজতর প্রাকৃতভাষার আকারে পরিণত হইয়া থাকিবে। সংস্কৃত ও প্রাকৃতের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই স্পষ্ট বোধ হইবে যে, উক্ত উভয় ভাষা সর্ব্বাংশে অবিকল একরূপ। অর্থাৎ—ঐ দুই ভাষার কারক, বিভক্তি, ক্রিয়া রচনাপ্রণালী প্রভৃতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই, কেবল স্থানে স্থানে শব্দবিশেষের বর্ণগত কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য দৃষ্টহয়। যথা প্রতিকূলঃ=পড়িউলঃ; রাজা=রাআ; চন্দ্রম্=চন্দম্; ভবন্তি=হোন্তি ইত্যাদি—

হেমচন্দ্র নামক প্রাচীনপণ্ডিত প্রাকৃত শব্দের এই অর্থ করেন—

প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্, তত্র ভবং তত আগতং বা প্রাকৃতং সংস্কৃতমূলকমিত্যর্থঃ।

'সংস্কৃত প্রকৃতি অর্থাৎ মূল, তাহা হইতে উৎপন্ন এই অর্থে প্রাকৃত—অর্থাৎ সংস্কৃতমূলক'। কিন্তু এ অর্থ আমাদিগের সম্যক্ প্রীতিকর হয় না। আমাদের বোধ হয়, সংস্কৃত শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ (Refined) এবং প্রাকৃত শব্দের অর্থ সাধারণ (Common)। সংস্কৃত আমাদিগের আর্য্যপুরুষদিগেরই চলিত ভাষা ছিল। তাঁহাদিগের সহিত ভারতবর্ষের আদিমনিবাসীদিগের যেমন সংস্রব বৃদ্ধি হইতে লাগিল, বিশুদ্ধ সংস্কৃতেরও তেমনই রূপান্তরতা ঘটিতে আরম্ভ হইল। সেই রূপান্তরিত

ভাষা সাধারণ বা প্রাকৃত লোকের বলিয়াই উহার নাম প্রাকৃত হইল। প্রাকৃত যেরূপই হউক উহার গ্রন্থনের সূত্র সমুদয় সংস্কৃতেরই অনুরূপ হইল।

কৃতবিদ্য ও সাধারণ লোকদিগের ভাষা যে অনেকাংশে বিভিন্ন হয়, তাহার প্রামাণ্যার্থ অন্যত্র যাইতে হইবে না—আমাদিগের নিজের ভাষা এবং আমাদিগের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের এবং প্রতিবেশী ইতরজাতীয়-দিগের ভাষার প্রতি অভিনিবেশসহকারে কর্ণপাত করিয়া তুলনা করিয়া দেখিলেই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, ঐ সকল ভাষার বাস্তবিক স্বরাদিগত অনেক বৈলক্ষণ্য আছে—কেবল সততশ্রবণজন্য অভ্যাসবশতঃ আমাদিগের তাহা বুঝিতে ক্লেশবোধ হয় না। সংস্কৃত নাটকেও অবিকল এই ব্যবহার দৃষ্ট হয়—যেখানে রাজা, মন্ত্রী, তপস্বী প্রভৃতি উৎকৃষ্ট পুরুষেরা সংস্কৃতে বাক্যালাপ করেন, সেই স্থলেই তপস্বিনী ভিন্ন স্ত্রীজাতি ও ভৃত্যপ্রভৃতি সাধারণ লোকেরা স্ব স্ব পদোচিত প্রাকৃতভাষায় কথা কহিয়া থাকে।

সংস্কৃত যেরূপ অতিপ্রাচীন বলিয়া প্রথিত, প্রাকৃত তাহা নহে। পাণিনীয়াদি প্রাচীন ব্যাকরণে প্রাকৃতের উল্লেখও নাই। ইহাতে বোধহয় তৎকালে উহাতে গ্রন্থাদি রচিত হইতে আরম্ভ হয় নাই। পরে অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে গ্রন্থাদিপ্রণয়ন আরম্ভ হইলে উহার ব্যাকরণেরও সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। বররুচি, শাকল্য, ভরত, কোহল, বৎসরাজ, মার্কণ্ডেয় ক্রমদীশ্বর প্রভৃতি অনেকানেক মহোদয় কর্তৃক প্রাকৃতব্যাকরণ বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে বররুচি কৃত 'প্রাকৃত-প্রকাশ'কেই সর্ব্ব প্রথম প্রাকৃতব্যাকরণ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। যেরূপ প্রসিদ্ধি, তাহাতে বররুচি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের এক রত্ন ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের বয়ঃক্রম প্রায় ১৯৪০ বৎসর হইল। সুতরাং প্রাকৃতপ্রকাশ যদি ঐ সময়ে রচিত হইয়া থাকে, তাহা-হইলে তাহার বহুকাল পূর্ব্বে যে প্রাকৃতভাষায় গ্রন্থাদি প্রচার হইয়া-ছিল, একথা বলা যাইতে পারে। খৃষ্টের প্রায় ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে

অশোক রাজার অধিকারকালে এণ্টিওকস্ প্রভৃতি যে গ্রীক্ রাজা-দিগের বিবরণ প্রস্তরাঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার ভাষাও এক প্রকার প্রাকৃত—অতএব তদ্দ্বারা বিলক্ষণ অনুমান হইতেপারে যে, তৎ-কালে প্রাকৃতভাষাই দেশমধ্যে সাধারণ্যে চলিত ভাষা ছিল, এবং তাহা হইলেই উহা যে, প্রদেশভেদে মহারাষ্ট্রী, মাগধী, শৌরসেনী, পৈশাচী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিবে তাহা বিলক্ষণ সম্ভব বোধ হয়। বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র যে অর্দ্ধমাগধী বা পালীভাষায় লিখিত, উহাও এক প্রকার প্রাকৃত। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ঐ ভাষা প্রথমে পল্লীগ্রামের লোককর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছিল, এজন্য উহার নাম পালী হইয়াছে।

সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাকৃত অনেক সহজ। সংস্কৃতে যত্ব ণত্বের যে এক দুরূহ কাণ্ড আছে, প্রাকৃতে সে ব্যপার কিছুমাত্র নাই—প্রাকৃতে সর্ব্বস্থলেই (সাধারণতঃ) এক দন্ত সকার, এক মূর্দ্ধন্য ণকার এবং এক বর্গীয় জকার প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন আধুনিক অপরাপর ভাষার ন্যায় প্রাকৃতেও দ্বিবচনের প্রয়োগ নাই কেবল একবচন ও বহুবচন। সুতরাং ইহার রচনাপ্রণালী সহজতর; এবং এই ভাষা যে সুখগ্রাহ্য অর্থাৎ অনায়াসবোধ্য, তাহা মহাকবি কালিদাস নিম্নলিখিত শ্লোক-দ্বারা অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন—

> দ্বিধাপ্রযুক্তেন চ বাঙ্ময়েন সরস্বতী তন্মিথুনং নুনাব।
> সংস্কারপূতেন বরং বরেণ্যং বধূং সুখগ্রাহ্যনিবন্ধনেন॥ কুমারসম্ভব ৭ম সর্গ।

'সরস্বতী দুইপ্রকার পদাবলী দ্বারা হরপার্ব্বতীর স্তব আরম্ভ করি-লেন;—সংস্কৃত দ্বারা হরের এবং সুখগ্রাহ্যনিবন্ধন অর্থাৎ প্রাকৃত দ্বারা পার্ব্বতীর।'

এক্ষণে আমাদের প্রকৃত বক্তব্য বিষয় এই যে, পূর্ব্ববর্ণিতরূপ প্রাকৃত ভাষাই বাঙ্গালার জননী; সংস্কৃত উহার জননী নহেন—কিন্তু মাতামহী। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ভাষা জনসাধারণের ব্যবহার্য্য হইতে হইতেই

তাহার রূপান্তরতা ঘটিতে থাকে। রূপান্তরতা-সঙ্ঘটন নানাপ্রকারে হয়। তন্মধ্যে ভাষাগত সংযুক্ত শব্দ সকলের শিথিলতা সম্পাদনদ্বারা এক প্রকার রূপান্তরতা ঘটে। ঐ শিথিলতাকরণও দুই প্রকারে সম্পন্ন হয়, এক প্রকার সম্প্রসারণ, দ্বিতীয়প্রকার বিপ্রকর্ষণ। নদ্যাদি শব্দের সন্ধিচ্ছেদ করিয়া 'নদী আদি' করাকে সম্প্রসারণ এবং 'ধর্ম্ম' শব্দের সংযুক্ত বর্ণের বিশ্লেষ করিয়া 'ধরম' করাকে বিপ্রকর্ষণ কহে। এই সম্প্রসারণ ও বিপ্রকর্ষণ প্রক্রিয়া দ্বারা দুরুচ্চার্য্য শব্দ সকলের সুখোচ্চার্য্যতা সম্পাদিত হয়—নিম্নলিখিত শব্দগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা উৎপন্ন হইবার সময়ে অনেক স্থলেই যে, সেই ক্রিয়া বিলক্ষণরূপে ঘটিয়াছিল তাহা স্পষ্ট বোধ হইবে—

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গাল	সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
ত্বম্	তুমম্	তুমি	বিদ্যুৎ	বিজ্জুলী	বিজুলী
অহম্	অহম্মি	আমি	দংষ্ট্রা	দাঢ়া	দাড়া
লবণ	লোণ	লুন	বহিঃ	বাহির	বাহির
প্রস্তর	পথর	পাথর	বধূ	বহূ	বহূ—বৌ
শ্মশান	মসান	মশান	চন্দ্র	চন্দ	চাঁদ
গৃহ	ঘর	ঘর	মধ্য	মজ্ঝ	মাঝ
স্তম্ভ	থম্ভ	থাম্বা	বৃদ্ধ	বুড্ঢ	বুড়া
চক্র	চক্ক চাক বা চাকা		জ্যেষ্ঠ	জেট্ঠ	জেঠা
কার্য্য	কজ্জ	কাঁজ	ভক্ত	ভত্ত	ভাত
অদ্য	অজ্জ	আজ	স্নান	হ্লাণ	নাহা
মিথ্যা	মিচ্ছা	মিছা	সন্ধ্যা	সঞ্ঝা	সাঁঝ
বৎস	বচ্ছ	বাছা	উপাধ্যায়	উবজ্ঝাঅ	ওঝা
কার্ষাপণ	কাহাবণ	কাহণ	যষ্টি	লট্ঠী	লাঠী
হস্ত	হত্থ	হাত			ইত্যাদি।

ভাষার পরিবর্ত্তসময়ে যে, পূর্ব্বোক্তরূপ সম্প্রসারণ ও বিপ্রকর্ষণ

কার্য্যই কেবল হইয়াথাকে তাহা নহে; অনেক স্থলে নূতন বর্ণের আগম—কোন স্থলে বর্ণবিশেষের লোপ এবং স্থলবিশেষে কোন কোন বর্ণের অন্যথাভাবও হইয়াথাকে। উপরিপ্রদর্শিত শব্দসকলের মধ্যেই ইহার উদাহরণ পাওয়া যাইবে।

সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত উৎপন্ন হইবার যেরূপ প্রণালীবদ্ধ নিয়মপদ্ধতি পাওয়াযায়, প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা উৎপন্ন হইবার সেরূপ নিয়মাদি কিছুই পাওয়াযায় না। সুতরাং কি প্রণালীতে ও কি ক্রমে প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা হইয়াছে, তাহা নিরূপণকরা অতি দুরূহ ব্যাপার। বোধহয় কেবল প্রাকৃতই বর্ত্তমান বাঙ্গালার উপাদান নহে। দেশভেদে ভাষাভেদ হইয়া থাকে। আমাদের শাস্ত্রকারেরা ভাষাভেদকে দেশ-ভেদেরই লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—

বাচো যত্র বিভিদ্যন্তে গিরির্ব্বা ব্যবধায়কঃ।
মহানদ্যন্তরং যত্র তদ্দেশান্তর মুচ্যতে॥ উদ্বাহতত্ত্বধৃত বৃহন্মনুবচন।

"যে দেশে ভাষার বিভিন্নতা হয়—গিরি বা মহানদী যাহাতে ব্যবধান থাকে, তাহাতে দেশান্তর কহা যায়।" সুতরাং যৎকালে বঙ্গদেশে কোনরূপ প্রাকৃতভাষা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তৎকালে এদেশে যে একটী আদিমভাষা ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বোধ হয় সেই ভাষার সহিত প্রাকৃতভাষার সর্ব্বতোভাবে মিশ্রণ হওয়ায় এই বাঙ্গালা-ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। অদ্যাপি এই ভাষায় ঢেঁকি, কুলা, ধুচুনি প্রভৃতি এমত কতকগুলি শব্দ পাওয়া যায় যে, সে সকল না প্রাকৃত, না সংস্কৃত, না পারসী, না আরবী। তদ্ভিন্ন বাঙ্গালার ক্রিয়া কারক বিভক্তি প্রভৃতি এপ্রকার ভিন্নরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ইহাকে কোন মতেই কেবল প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত একথা বলিতে পারা যায় না—অবশ্যই ভাষান্তরসংকৃত প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, স্বীকারকরিতে হয়। এক ভাষা কিরূপে ও কি প্রণালীতে ভাষান্তরে পরিণতা হয় তাহা নিরূপণ করিবার উৎকৃষ্ট উপায় ঐ ভাষার প্রাচীন গ্রন্থ পর

স্পর্। কিন্তু বাঙ্গালার মূলে যে আদিম ভাষা ছিল, তাহার কথা দূরে থাকুক, বাঙ্গালা ভাষারই অতি প্রাচীন গ্রন্থ একখানিও পাওয়া যায় না। ইহার কারণ এই বোধ হয় যে, পূর্ব্বকাল হইতে সংস্কৃত দেবভাষা বলিয়া সাধারণের পরমশ্রদ্ধাস্পদ হইয়া আছে। সংস্কৃতভিন্ন অপর ভাষাকে লোকে কেবল ব্যবহারিকভাষা বলিয়া বোধকরিত; বিদ্যানুশীলনও পূর্ব্বে সাধারণতঃ এরূপ প্রবলপ্রচার ছিল না। সুতরাং যাঁহারা তৎকালে বিদ্যালাভ করিতেন এবং যাঁহাদের গ্রন্থাদি-রচনা করিবার সামর্থ্য জন্মিত, তাঁহারা সেই শক্তি সংস্কৃতগ্রন্থ-রচনে প্রযুক্ত করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিতেন; সুতরাং কৃতবিদ্যদিগের কর্তৃক বাঙ্গলা অনাদৃত ও উপেক্ষিত হওয়াতে বহুকালপর্য্যন্ত ইহার বিলক্ষণ দুরবস্থা ছিল। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদাবলী ও জীবগোস্বামীর করচা প্রভৃতি যাহা বাঙ্গালার প্রাচীন পুস্তক বলিয়া পরিচিত, তাহাও ৪ শত বৎসরের অধিক পূর্ব্বের নহে; সুতরাং তদ্দ্বারা ভাষার মূলানুসন্ধান হওয়া অসম্ভব। যাহা-হউক ওরূপ অশক্য ব্যাপারে অধ্যবসায় ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালার ক্রিয়া কারকাদি যেরূপে প্রযুক্ত হয় এবং সে সকল যেরূপে উৎপন্ন বলিয়া আমাদের প্রতীতি জন্মিয়াছে, কেবল তদ্বিষয়ের কয়েকটী স্থূল স্থূল কথা বলিয়া আমরা এ প্রকরণ পরিত্যাগ করিব।

সন্ধি—সংস্কৃতে যেরূপ পদদ্বয়ের অন্ত্য ও আদ্যবর্ণের পরস্পর মিলন হইয়া সন্ধি হয়, বাঙ্গালাতেও অবিকল সেইরূপ সন্ধির ব্যবহার আছে; সুতরাং এ অংশে বাঙ্গালা সংস্কৃতের সম্পূর্ণরূপ অনুকারক। তবে কোন কোন প্রয়োক্তা স্থলবিশেষে ইচ্ছাপূর্ব্বক সন্ধি করেন না এবং তাহা না করাতেও বিশেষ দোষ হয় না।

সমাস—সমাসও সংস্কৃতের ন্যায় বাঙ্গালাতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে

লিঙ্গ—সংস্কৃতে যে শব্দ যে লিঙ্গ, বাঙ্গালাতেও সেই শব্দকে সেই-লিঙ্গ বলিয়াই ব্যবহার করাহইতেছে তবে যে স্থলে শুনিতে কদর্য্য-বোধ হয়, কেবল সেই স্থলেই লিঙ্গসূচক চিহ্নাদি দেওয়া হয় না।

কারক ও বিভক্তি—সংস্কৃতের ন্যায় বাঙ্গালাতেও কর্ত্তা কর্ম্ম করণ, অপাদান সম্প্রদান অধিকরণ এই ছয় কারক ও সম্বন্ধপদ আছে এবং সেই সকল স্থলে যথাযথ প্রথমাদি বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াথাকে। বাঙ্গালায় দ্বিবচন নাই; কেবল একবচন ও বহুবচনের বিভক্তি যোগ হইয়া বাঙ্গালাপদ সম্পন্ন হয়। এই সকল বিভক্তি আকার কিছু ভিন্ন-রূপ। কর্ত্তায় 'রা' 'এরা', কর্ম্মে 'কে' "দিগকে' 'রে', করণে 'দ্বারা' 'দিয়া' আপদানে 'হইতে' অধিকরণে 'তে' ও সম্বন্ধে, 'র' 'এর' দিগের' প্রভৃতি যোগ হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল বিভক্তির চিহ্ন যে, কোথা হইতে আসিল তাহা স্থির বলাযায় না।

'দ্বারা' ও 'দিয়া' এদুইটী করণ-কারকচিহ্ন যে সংস্কৃত হইতেই আসিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। অধিকরণের 'এ' চিহ্ন ও সংস্কৃত মূলক এবং ঐ 'এ' চিহ্নই স্থল ভেদে উচ্চারণ-সৌকর্য্যার্থ 'তে' হইয়া যায়। কর্ত্তৃপদচিহ্ন 'রা' এবং সম্বন্ধের চিহ্ন 'র' কোন অনার্য্য আদিম ভাষা হইতেই সংগৃহীত হইয়া থাকিবে। কেহ কেহ কহেন অনেক আনার্য্য ভাষার 'আর' শব্দে পুরুষ বুঝায়—পুরুষেরা প্রধান বা কর্ত্তা বা অধিকারী। ঐ 'আর' হইতেই কি কর্ত্তার 'রা' বা 'এরা' বিভক্তির উৎপত্তি এবং উহা হইতেই কি অধিকারি বোধনার্থে সম্বন্ধ চিহ্ন 'র' এর উদ্ভব হইয়াছে?। সংস্কৃত সুবন্তপদে উপান্তিমবর্ণের পূর্ব্বে 'অক' হইবার নিয়ম আছে যথা, রামঃ=রামকঃ, ত্বাং=ত্বকাং, মাং=মকাং, যং=যকম্, দরিদ্রং=দরিদ্রকম্ ইত্যাদি। ঐ অকযুক্ত সংস্কৃত বা প্রাকৃত পদ হইতে বাঙ্গালার কর্ম্ম ও সম্প্রদান বিভক্তির চিহ্ন 'কে' র উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব বোধ হয় না। অকারান্তশব্দের সংস্কৃত পঞ্চম্যন্ত পদ 'আৎ' ভাগান্ত এবং সকল প্রকার সকল শব্দেরই ঐ পদ 'তস্' ভাগান্ত হয়। যথা রামৎ—রামতঃ, হরিতঃ, ইত্যাদি। ঐ 'আৎ' বা 'তস্' ভাগ হইতেই বহু পরিবর্ত্তনে বাঙ্গালার আপদান কারকচিহ্ন 'হইতে'র উৎপত্তি হওয়া সম্ভব হইতেও পারে।

ধতু ও ক্রিয়া—বাঙ্গালার যে সকল ক্রিয়া পদ দেখিতে পাওয়াযায়, তাহার ধাতুসকল প্রায়সমস্তই সংস্কৃত মূলক। সেই সংস্কৃত ধাতুহইতে প্রাকৃতভাষায় যে ক্রিয়া জন্মে, সেই ক্রিয়া অপভ্রংশিত হইয়া বাঙ্গালা-ক্রিয়াপদের উৎপাদন করিয়াছে, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। ইহার প্রামাণ্যার্থ কতকগুলি সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা ক্রিয়াপদ প্রদর্শিত হইতেছে—

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা-ক্রিয়া	সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা-ক্রিয়া
ভবতি	হোই	হয়	কথয়তি	কহই	কহে
করোতি	করই	করে	অস্তি	অচ্ছি	আছে
বক্তি	বোলই	বলে	ক্ষিপতি	ফেলদি	ফেলে
ক্রীণাতি	কিণই	কেনে	পঠতি	পঢ়ই	পঢ়ে
বর্দ্ধতে	বডঢই	বাড়ে	পততি	পড়ই	পড়ে
স্মরতি	সুমরদি	সুমরে	মৃদাতি	মলদি	মলে
নৃত্যতি	নচ্চই	নাচে			ইত্যাদি।

উপরি প্রদর্শিত পদগুলির প্রতি অভিনিবেশপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধহইবে যে, ‘হোই’ প্রভৃতি প্রাকৃত ক্রিয়া হইতেই ‘হয়’ প্রভৃতি বাঙ্গালাক্রিয়ার উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু আমাদিগের বোধহয় ‘হইতেছে’ প্রভৃতি ক্রিয়া একমাত্র ভূ ধাতু হইতে উৎপন্ন নহে, কিন্তু ভূ ও অস এই উভয় ধাতুর যোগে উৎপন্ন। অস ধাতুর সংস্কৃত ক্রিয়া ‘অস্তি’ হইতে ক্রমশঃ বাঙ্গালায় ‘আছে’ হইয়াছে। পরে ভূ ধাতুর অসমাপিকাক্রিয়া হইতে ও অস ধাতুর সমাপিক্রয়া ‘আছে’ এই দুই ক্রিয়া একত্র মিলিত হইয়াও ‘আছে’ র আকারের লোপ হইয়া ‘হইতেছে ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। দেখিতেছে’ করিতেছে, কিনিতেছে এবং হইয়াছে দেখিয়াছে করিয়াছে ইত্যাদি স্থলেও বোধ হয় ঐরূপ প্রক্রিয়া হইয়াথাকিবে। অস ধাতুর অতীতকালিকা সংস্কৃতক্রিয়া আসীৎ হইতে বোধহয় বাঙ্গালায়

'আছিল' ক্রিয়া জন্মিয়াছে। প্রাচীন পুস্তকে 'আছিল' ক্রিয়ার অনেক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়াযায়। যথা—

'কখন্ আছিল সব ঘোর অন্ধকার' (জীবগোস্বামীর করচা)।

'আছিল দেউল এক পর্ব্বতপ্রমাণ' (শুভঙ্করের আর্য্যা)।

এক্ষণে আর কলিকাতার নিকটবর্ত্তী প্রদেশে 'আছিল' ক্রিয়ার প্রয়োগ নাই; তৎপরিবর্ত্তে 'ছিল' হইয়াছে। বোধহয় 'হইয়া' ও 'আছিল' এই দুইক্রিয়ার যোগে 'হইয়াছিল' ক্রিয়ার উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। 'করিয়াছিল' 'দেখিয়াছিল' প্রভৃতি স্থলে এবং 'হইতেছিল' 'করিতেছিল' ইত্যাদি স্থলেও ঐরূপ প্রক্রিয়া হইয়াছে বলাযাইতেপারে। 'হউক' 'করিল' 'দেখিবে' 'কিনিতাম' ইত্যাদি অন্যান্য যে সকল ক্রিয়াপদ আছে, তৎসমস্তের মূলাকর্ষণ করিতে পারা যাউক বা না যাউক কিন্তু সকলই যে, ঐরূপ সংস্কৃতমূলক কোন না কোন ধাতু বা ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালায় স্বতন্ত্র সমাপিকাক্রিয়া অল্প আছে। অনেক স্থলে ভাবক্রিয়াকে কর্ম্মপদ ও কৃ ধাতুর ক্রিয়াকে সমাপিকাক্রিয়াপদ করিয়া বাক্য নিষ্পন্ন করা যায়। যথা গমন করিতেছে, ভক্ষণ করিয়াছে, ক্রীড়া করিয়াছিল, বধ করিব ইত্যাদি। ক্রিয়াপদের এইরূপ অপর্য্যাপ্ততা ভাষার পক্ষে সুবিধা নহে। বাঙ্গালার এই অসুবিধা অনেকেই সময়ে সময়ে বিলক্ষণ অনুভব করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে 'হইতে' 'হইয়া' প্রভৃতি যে সকল অসমাপিকা ক্রিয়ার কথা উল্লিখিত হইল, তন্মধ্যে বোধহয় 'হইতে' নিমিত্তার্থক তুমন্ত 'ভবিতুং' বা 'হোতুং' হইতে এবং 'হইয়া' অনন্তরার্থক ক্ত্বান্ত 'ভূত্বা' বা 'ভবিত্ত' হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। দেখিতে, দেখিয়া; করিতে, করিয়া ইত্যাদি অসমাপিকা ক্রিয়াকেও ঐরূপে উৎপন্ন বলাযাইতেপারে। বিশেষতঃ ক্ত্বান্ত পদগুলির প্রাকৃত যাহা হয়, অনেক স্থলেই তাহা হইতে বাঙ্গালাক্রিয়া (প্রধানতঃ) কেবল এক আকারযোগে নিষ্পন্ন হয়। যথা

করিঅ—করিয়া; মিলিঅ—মিলিয়া, শুণিঅ—শুনিয়া, ভণিঅ—ভণিয়া ইত্যাদি।

যাহা হউক, এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা বলা গেল, তদ্দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকিবে, অথবা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করাগিয়াছে যে, বাঙ্গালা-ভাষা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ও সমধিকপরিমাণে প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত; কিন্তু প্রাকৃতের উপাদান উপকরণ প্রভৃতি প্রায় সমুদয়ই সংস্কৃত, সুতরাং বাঙ্গালাও পরম্পরাসম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে সংস্কৃত-মূলক। ইহা যেরূপ প্রণালীতে ও যেরূপ ক্রমে সংস্কৃত বা প্রাকৃত হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়াছে, তাহাও সঙ্ক্ষেপতঃ কিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইল। পরে কালক্রমে ইহার যেরূপ পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে, তাহাও যথাযোগ্য স্থলে ক্রমশঃ উল্লেখ করিবার চেষ্টা করাযাইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে যে, বাঙ্গালাভাষার উদ্ভব ও প্রচার বহু পূর্ব্বকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সজীব প্রাণীমাত্রেই জন্মলাভকালে যদবস্থ থাকে, বয়স্ হইলে কখনই তদবস্থ থাকে না। আমরা যৎকালে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম, আমাদিগের তাৎকালিক অবস্থা হইতে বর্ত্তমান অবস্থা কতদূর পৃথগ্বিধ হইয়াছে, তাহা অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তা করিতে গেলে বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হইতে হয়। ভাষা যদিও স্বয়ং সজীব প্রাণী নহে, কিন্তু সজীবপ্রাণীর সর্ব্বাপেক্ষা সারপদার্থ যে অন্তঃকরণ, তাহা হইতেই ইহার উৎপত্তি, সজীবপ্রাণীর বাগিন্দ্রিয়েই ইহার চিরনিবাস এবং ইহা সজীবপ্রাণীকে নিয়ত পরিচালনকরিবার যন্ত্রস্বরূপ; সুতরাং ইহারও কৌমার, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা যে একভাবেই

যাইবে, তাহা কখন সম্ভব নহে। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা কান্যকুব্জ হইতে আসিয়া এদেশের যে ভাষা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং ক্রমশঃ অত্রত্যদিগের সহিত মিলিত হইয়া যেরূপ ভাষায় কথোপকথন আরম্ভ করিয়াছিলেন, আমরা আজিও যে, সেই ভাষাই ব্যবহার করিতেছি, তাহা কখনই নহে। কিন্তু সেই ভাষাই না হউক, ভিন্ন ভাষাও নহে—যদি রামচন্দ্রনামক কোন দুইবর্ষবয়স্ক বালককে আমরা কিয়দ্দিন দেখিয়া তৎপরে একবারে বিংশতিবৎসর পরে তাহাকে আবার দর্শনকরি, তাহা হইলে কখনই সেই রামচন্দ্র বলিয়া প্রথমে চিনিতে পারিনা—কিন্তু চিনিতে পারিনা বলিয়াই যে, সে ব্যক্তি সেই রামচন্দ্র নহে, তাহাও বলিতে পারাযায় না; কারণ সেই রামচন্দ্রনিষ্ঠ অনন্যসাধারণ কিঞ্চিৎ পদার্থ সর্ব্বক্ষণই তাহাতে বিদ্যমান আছে। সেইরূপ আমাদিগের কান্যকুব্জাগত পূর্ব্বপুরুষেরা যদি এই সময়ে একবার গাত্রোত্থান করেন, তাহাহইলে তাঁহারা প্রথমতঃ আমাদিগের এই চলিত ভাষাকে অন্যবিধ ভাষা বলিয়াই বোধ করিবেন; কিন্তু তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের সন্তানেরা যে ভাষা ব্যবহার করিতেছেন, তাহা তাঁহাদিগের সমসাময়িক সাধারণ লোকদিগের সেই পূর্ব্বব্যবহৃত ভাষাই—অন্য কিছু নহে; তবে সেই ভাষার শরীরে অনেকটা পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে এইমাত্র—মূল প্রকৃতির কিছুমাত্র বিপর্য্যয় হয় নাই। জগতীস্থ সমস্ত বস্তুর ন্যায় ভাষাও নিয়ত পরিবর্ত্তশীল। সেই পরির্ত্তের অবস্থা বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ় নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

প্রথম হইতে অদ্যপর্য্যন্ত সময়কে ভাগত্রয়ে বিভক্ত করিয়া তদনুসারে বাঙ্গালা ভাষার বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ় অবস্থার নির্দ্দেশকরা অসঙ্গত বোধহয়না। আমাদিগের বিবেচনায় প্রথম হইতে চৈতন্যচন্দ্রের উৎপত্তির পূর্ব্বপর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৪০৭ শক [১৪৮৫ খৃষ্ট অব্দ] পর্য্যন্ত সময়কে আদ্যকাল; তৎপরে চৈতন্যের সময় হইতে ভারতচন্দ্ররায়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত

অর্থাৎ ১৬৭৪ শক [১৭৫২ খৃঃ অঃ] পর্য্যন্ত সময়কে মধ্যকাল এবং তৎপরে ভারতচন্দ্রের সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত সময়কে ইদানীন্তনকাল বলা অযৌক্তিক হয় না। ঐ তিনকালের বাঙ্গালাভাষার অবস্থা যথাক্রমে বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ়রূপে নির্দ্দেশ করিতে পারাযায়। এক্ষণে আমরা প্রথমতঃ বাঙ্গালার সেই বাল্যাবস্থার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আদ্যকাল।

কোন ব্যক্তিই আপনার বাল্যাবস্থার বিবরণ নিশ্চয় বলিতে পারে না। আমরা কোন্ পিতামাতা কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়াছি, কোন্ দেশে বা কোন্ সময়ে ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, বাল্যকালে আমাদের কে কে অভিভাবক ছিলেন, কাহার দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছি, এ সকল কথা অন্য কেহ বলিয়া না দিলে, আমরা কখনই জানিতে পারি না। ভাষার পক্ষেও সেইরূপ। কিন্তু পূর্ব্বেই বলাহইয়াছে যে, বাঙ্গালাভাষা প্রথমাবস্থায় কিরূপ ছিল, তাহা বলিয়া দিতেপারে এরূপ গ্রন্থ নাই। আমরা যে সকল বাঙ্গালাগ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি—দেখিতেছি, সে সমস্তই প্রায় চৈতন্যদেবের উৎপত্তির পরকালীন গ্রন্থ—পূর্ব্বকালীন নহে। কেবল বিদ্যাপতির ও চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক কতকগুলি গীতই চৈতন্যের পূর্ব্বকালে বিরচিত বলিয়া জানিতে পারা যাইতেছে। যেহেতু বৈষ্ণবদাস-সঙ্কলিত পদকল্পতরু নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে চৈতন্যদেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গীতাবলি শ্রবণ করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন যথা—

জয় জয়দেব কবিনৃপতিশিরোমণি বিদ্যাপতি রসধাম।
জয় জয় চণ্ডীদাস রসশেখর অখিলভুবনে অনুপাম॥
যাকর রচিত মধুররস নিরমল গদ্য পদ্যময় গীত।
প্রভু মোর গৌরচন্দ্র আস্বাদিলা রায় স্বরূপ সহিত॥ (পদকল্পতরু ১৫)

যাহাহউক এই দুই জনকে লইয়া এবং ইহাঁদিগের রচনার উপরেই নির্ভর করিয়া বাঙ্গালার প্রথমাবস্থার বিষয় নিঃশেষিত করিতে হইল, তদ্ব্যতিরেকে ঐ সময়ের আর কোন গ্রন্থই পাওয়া গেল না।

বিদ্যাপতি।

আমরা পূর্ব্বে অনুমান করিয়াছিলাম যে, বিদ্যাপতি বীরভূম বা বাঙ্কুড়ার কোন প্রদেশে উৎপন্ন এবং ঐ প্রদেশেরই কোন রাজা শিবসিংহের সভাসদ্ ছিলেন। কিন্তু বঙ্গদর্শন নামক মাসিক পত্রিকার ১২৮২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের একটী প্রস্তাবে প্রমাণপ্রয়োগসহকারে বিদ্যাপতি বিষয়ক এই কয়েকটী নুতন কথা লিখিত হইয়াছে, যথা—"বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী এবং মিথিলারই ব্রাহ্মণ রাজা শিবসিংহের সভাসদ্ ছিলেন। শিবসিংহের রাজত্বের প্রারম্ভকাল ১৩৬৮ শক, সুতরাং বিদ্যাপতি, অনুমান, ১২৪০ শকে অর্থাৎ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ৫০। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ রাজারই আদেশানুসারে সংস্কৃত ভাষায় পুরুষপরীক্ষা নামক একখানি পুস্তকরচনা করেন। বাঙ্গালাভাষায় যে পুরুষপরীক্ষা দেখাযায়, তাহা বহুকাল পরে অপর কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত। বিহারের অন্তর্গত (বাঢ় নামক রেলওয়ের ষ্টেশনের সন্নিহিত) বিসপী নামক গ্রামখানি রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতি শর্ম্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির বংশীয়েরা অদ্যাপি ঐ গ্রামে বাস করেন। মিথিলায় প্রচলিত পঞ্জীগ্রন্থ নামক সংস্কৃতপুস্তকে বিদ্যাপতির আর আর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়াযায়" ইত্যাদি *

আমরা পূর্ব্বে বিদ্যাপতিকে বঙ্গদেশবাসী ও তাঁহার রচনাকে বাঙ্গালার আদ্যকালের রচনা বিবেচনা করিয়াছিলাম, কিন্তু বিদ্যাপতি যদি সত্যই মৈথিল হয়েন, তাহা হইলে আমাদের সে বিবেচনাকে ভ্রমমূলক বলিতে হয়, এবং বিদ্যাপতি বাঙ্গালাভাষার প্রাচীন কবি

* বিশেষ দর্শনেচ্ছুগণ উল্লিখিত বঙ্গদর্শন দেখিবেন

বলিয়া আমরা বহুকাল হইতে যে গর্ব্ব করিয়া আসিতেছিলাম, সে গর্ব্ব ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু আমরা তাহা করিতে প্রস্তুত নহি। তাহার কারণ এই যে, বিদ্যাপতির অনেক গীত এরূপ অবিমিশ্র সরল বাঙ্গালা-ভাষায় রচিত যে, তদ্দর্শনে বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালী ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারা যায় না। আমাদের অনুমান হয়, বাঙ্গালাদেশই বিদ্যাপতির জন্মভূমি; তিনি এ দেশেই বিদ্যোপার্জ্জনাদি সমাধান করিয়া যৌবনাবস্থায় মিথিলায় গমনপূর্ব্বক তত্রত্য রাজার সভাসদ নিযুক্ত হয়েন এবং সেইস্থানে থাকিয়াই আপনার কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের সৌরভ চতুর্দিকে বিস্তৃতকরেন। আমাদের এই অনুমানকে সত্য বোধকরিলেই বিদ্যাপতির অনেক গীত যে, হিন্দিসম শব্দে এবং কতক গীত যে শুদ্ধ বাঙ্গালাশব্দে কেন বিরচিত হইয়াছে, তাহার কারণ উপলব্ধি করিতে পারাযায়, এবং এইরূপ মীমাংসা করা যায় যে, বিদ্যাপতির যে সকল গীতে হিন্দিসম শব্দের অধিক মিশ্রণ তাহা মৈথিলীভাষায়, যাহাতে অল্পমিশ্রণ তাহা মৈথিলীমিশ্রিত বাঙ্গালাভাষায় এবং যাহাতে মিশ্রণ নাই, তাহা কেবল বাঙ্গালাভাষায় রচিত হইয়াছে।

আমাদের এ সিদ্ধান্তে অসম্মত হইয়া যদি কেহ বিদ্যাপতিকে মিথিলানিবাসী বলিতেই নির্ব্বন্ধ করেন, তাহা হইলেও বিদ্যাপতিকে আমরা বাঙ্গালার প্রাচীন কবিশ্রেণী হইতে অপসারিত করিব না। যেহেতু বিদ্যাপতির সময়ে মিথিলা ও বঙ্গদেশে এক্ষণকার অপেক্ষা অধিকতর ঘনিষ্ঠতা ছিল; অনেক মৈথিল ছাত্র বঙ্গদেশে আসিয়া সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিতেন এবং অনেক এতদ্দেশীয় ছাত্র মিথিলায় যাইয়া পাঠসমাপন করিয়া আসিতেন। প্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ও চৈতন্যদেব ইহাঁরা তিন জনেই মিথিলার পক্ষধরমিশ্রের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এরূপ জনশ্রুতি আছে। মিথিলার অক্ষর এ দেশের পণ্ডিতসমাজে এবং এ দেশের অক্ষর মিথিলার পণ্ডিতসমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছে। অনেকের মতে বাঙ্গালার সেনবংশীয় রাজাদিগের সময়ে

বঙ্গদেশ ও মিথিলা অভিন্নরাজ্য ছিল, এবং সম্ভবতঃ উভয়দেশের ভাষাও অনেকাংশে একবিধ ছিল। তাহার প্রামাণ্যপ্রদর্শনার্থ উল্লিখিত হয় যে, 'দ্বারভাঙ্গা' প্রদেশ ঐ সময়ে 'দ্বারবাঙ্গা' বা 'বঙ্গদ্বার' নামে আখ্যাত হইত, তাহার কারণ এই যে, সেন রাজারা ঐ প্রদেশকে তাঁহাদের বঙ্গরাজ্যের পশ্চিমদ্বার বিবেচনা করিতেন। সুতরাং তৎকালে বঙ্গরাজ্য বলিলে মিথিলাও তাহার অন্তর্ভূত হইত। তদ্ভিন্ন বঙ্গদেশের রাজা লক্ষ্মণসেনের শক এ দেশে নাই, কিন্তু ঐ দেশে 'ল সং' নামে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। অতএব যখন্ বঙ্গদেশ ও মিথিলায় এতদূর ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ হইতেছে, তখন্ যে কবি বঙ্গ দেশের কবি জয়দেবের প্রণীত গীতগোবিন্দের অনুকরণে রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন,—যে সকল সঙ্গীত বঙ্গদেশের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তয়িতা চৈতন্যদেব পাঠ করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন, যাহা বঙ্গদেশীয় প্রাচীন কবির প্রণীত, এই বোধেই পরম ভক্তি সহকারে বঙ্গদেশীয় গায়কগণ বহুকাল হইতে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন এবং যে সকল সঙ্গীতের অনুকরণেই বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় শত শত গীত রচনা করিয়াছেন, আজি আমরা সেই কবিকে মিথিলাবাসী বলিয়া বঙ্গদেশীয় কবির আসন হইতে সরিয়া বসিতে বলিতে পারিব না। ফল কথা, যিনি যাহা বলুন, আমরা বিদ্যাপতিকে বঙ্গদেশেরই প্রাচীন কবি মনে করিব, এবং তাঁহার রচনা বঙ্গদেশেরই আদ্যকালের রচনা বলিয়া বোধ করিব।

বিদ্যাপতিবিরচিত কোন স্বতন্ত্র ভাষাগ্রন্থ আমরা দেখিতে পাই নাই। কেবল পদামৃতসমুদ্র, পদাবলী, পদকল্পতরু, প্রাচীন পদাবলী, প্রভৃতি বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে তাঁহার ভণিতিযুক্ত গীত সকল দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকল গীতের সঙ্খ্যা অল্প নহে, অতএব বোধ হয় তাঁহার রচিত গ্রন্থ অবশ্য ছিল।

বিদ্যাপতির অনেক গীতেই তাঁহার আশ্রয় রাজা শিবসিংহ ও তন্মহিষী লছিমা (লক্ষ্মী) দেবীর নামোল্লেখ আছে—যথা—

" কবি বিদ্যাপতি ইহ রস জানে। রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে " ॥ (প, ক, ত, ২৬৫)।
" ভণয়ে বিদ্যাপতি অপরূপ মূরতি রাধারূপ অপারা।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ একাদশ অবতারা "॥ (ঐ ২৮৩)

প্রবাদ এইরূপ যে, লছিমা দেবীর সহিত বিদ্যাপতির গূঢ় প্রণয় ছিল এবং মহিষীকে দেখিলেই তাঁহার কবিত্বস্রোতঃ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইত। বিদ্যাপতির কোন কোন গীতে যে রূপনারায়ণ, বিজয়নারায়ণ ও বৈদ্যনাথের নামোল্লেখ পাওয়া যায়, বোধ হয় তাঁহারা বিদ্যাপতির বন্ধু ছিলেন।

বিদ্যাপতির কোন কোন গীতে গীতগোবিন্দান্তর্গত শ্লোকবিশেষের স্পষ্ট অনুকরণ দেখিতে পাওয়া যায়, নিম্নভাগে একটী গীত ও একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

বিদ্যাপতি-গীত—কতিহুঁ মদন তনু দহসি হামারি। হাম নহ শঙ্কর হুঁ বর নারী ॥
নাহি জটা ইহ বেণী বিভঙ্গ। মালতীমাল শিরে নহ গঙ্গ ॥
মোতিমবন্ধমৌলি নহ ইন্দু। ভালে নয়ন নহ সিন্দুরবিন্দু॥
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদসার। নহ ফণিরাজ উরে মণিহার ॥
নীলপটাম্বর নহ বাঘছাল। কেলিক কমল ইহ না হয় কপাল ॥
বিদ্যাপতি কহে এ হেন সুচ্ছন্দ। অঙ্গে ভসম নহ মলয়জ পঙ্ক ॥

গীতগোবিন্দ-শ্লোক—হৃদি বিসলতাহারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ।
মলয়জরজো নেদং ভস্ম প্রিয়াবিরহিতে ময়ি
প্রহর ন হরভ্রান্ত্যাঽনঙ্গ ক্রুধা কিমু ধাবসি ॥

বিদ্যাপতির প্রায় সমুদায় গীতেই বিলক্ষণ কবিত্বশক্তির চিহ্ন পাওয়া যায়। তাঁহার রচনা প্রগাঢ়, ভাব-গভীর, রসাঢ্য ও মধুর—সম্পূর্ণরূপ অর্থ পরিগ্রহ না হইলেও শ্রবণবিবরে যেন মধুধারা বর্ষণ করে। নিম্নভাগে তিনটী গীত উদ্ধৃত হইল। পাঠকগণ তাহাতে যথাক্রমে হিন্দীসম শব্দের বহুল মিশ্রণ, অল্প মিশ্রণ ও অমিশ্রণ দেখিয়া লইবেন।

প্রেমকণ্ডুণ কহই সব কোই। যে প্রেমে কুলবতী কুলটা হোই॥
হাম যদি জানিয়ে পিরীতি দুরন্ত। তব কিয়ে যাওব পাবক অন্ত॥
অব সব বিষসম লাগয়ে মোই। হরি হরি পিরীতি না কর জনি কোই॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারি। পানি পীয়ে পিছে জাতি বিচারি॥ ১॥

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর। চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপ সুধাকর যত দুঃখ দেল। পিয়ামুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই। তব হাম পিয়া দূরদেশে না পাঠাই॥
শীতের ওঢ়নী পিয়া গিরিষীর বা। বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি। সুজনক দুঃখ দিন দুই চারি॥ ২॥

আজি কেন তোমায় এমন দেখি। সঘনে ঢুলিছে অরুণ আঁখি॥
অঙ্গে মোড়া দিয়া কহিছ কথা। না জানি অন্তরে কি ভেল ব্যথা॥
দৈব অবঘাত হয়েছে পারা। সঘনে গগনে গণিছ তারা॥
যদি বা না কহ লোকের লাজে। মরমি জনার মরম বাজে॥
আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি। প্রেম কলেবরে দিয়াছে সাখী॥
বিদ্যাপতি কহে একথা দঢ়। গোপত পিরীতি বিষম বড়॥ ৩॥

চণ্ডীদাস।

বিদ্যাপতির ন্যায় চণ্ডীদাসেরও পৃথক্ কোন গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় নাই, কেবল নানা বৈষ্ণবগ্রন্থে তাঁহার রচিত পদাবলী দেখিতে পাওয়াযায়। চণ্ডীদাস জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন—নান্নুর নামক গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। এই গ্রাম বীরভূম জেলার অন্তর্গত সাকুল্লীপুর থানার অব্যবহিত পুর্ব্ব দিকে অবস্থিত। ঐ গ্রামে বাশুলী নামে এক শিলাময়ী দেবী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। ইনি চণ্ডীদাসের উপাস্য-দেবতা বলিয়া বিখ্যাত। ইহাঁর প্রকৃত নাম বিশালাক্ষী; অপভাষায় বাশুলী বলে। প্রসিদ্ধি আছে, চণ্ডীদাস প্রথমে ইহাঁর উপাসনা করিতেন, পরে ইহাঁরই উপদেশে তাহা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপরায়ণ হয়েন,

এবং কৃষ্ণবিষয়ক নানা পদাবলী রচনা করেন। চণ্ডীদাসের স্বরচিত পদাবলীতে এই বৃত্তান্তের কতক উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

কি মোহনী জান বন্ধু কি মোহনী জান। অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি। বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর। পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর॥
বন্ধু তুমি যদি মোরে নিদারুণ হও। মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়। পরের লাগিয়া কি আপনা পর হয়॥

(প, ক, ত, ৮১৮)।

তথা—* * নান্নুরের মাঠে, গ্রামের হাটে, বাশুলী আছয়ে যথা।
তাঁহার আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,—ইত্যাদি (প, ক, ত, ৮১৯)॥

চণ্ডীদাস কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে এই বলাযাইতেপারে যে, বিদ্যাপতির জন্ম যদি ন্যূনাধিক ১৩৪০ শকে অর্থাৎ চৈতন্যদেবের উৎপত্তির ৬০। ৬৫ বৎসর পূর্ব্বে হইয়া থাকে, তবে চণ্ডীদাসও সেই সময়েই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা স্থির করিতেহইবে। কারণ উহাঁরা দুই জনেই একসময়ে অবস্থিত ছিলেন, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। তদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত গীতেও উহাঁদের পরস্পর সাক্ষাৎকার বর্ণিত হইয়াছে যথা—

চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতিগুণ দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি তব, চণ্ডীদাসগুণ দরশনে ভেল অনুরাগ॥
দুঁহুউৎকণ্ঠিত ভেল। সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল বিদ্যাপতি চলিগেল॥
চণ্ডীদাস তব, রহই ন পারই চললহি দরশন লাগি।
পন্থহি দুঁহু জন দুঁহু গুণ গায়ত দুঁহুহিয়ে দুঁহু রহু জাগি॥
পন্থহি দুঁহু দোঁহা দরশন পাওল লখই ন পারই কোই।
দুঁহু দোঁহ নামশ্রবণে তহি জানল রূপনারায়ণ গোই॥ (প, ক, ত, ২৪১০)
তথা—ভণে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস তথি, রূপনারায়ণ সঙ্গে।
দুহু আলিঙ্গন, করল তখন, ভাসল প্রেমতরঙ্গে॥ (ঐ ২৪১২).

ঐ সাক্ষাৎকারসময়ে উভয়ের কবিত্ব রসিকত্ব পাণ্ডিত্য প্রভৃতির প্রকাশক প্রশ্নোত্তরাবলীও দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং উহাঁদের সাক্ষাৎকারবিষয়ক উপাখ্যান কাল্পনিক বলিয়া বোধহয়না।

বিদ্যাপতির যেরূপ লছিমাপ্রসক্তির জনশ্রুতি আছে, চণ্ডীদাসেরও সেইরূপ রামী বা রামতারা নাম্নী রজকাঙ্গনার সহিত সঙ্গতির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। চণ্ডীদাস স্বয়ংই "রজকীসঙ্গতি, চণ্ডীদাস গতি" ইত্যাদি গীতদ্বারা তাহা স্বীকার করিয়াছেন। চণ্ডী ও রামীসংক্রান্ত অনেক অলৌকিক উপাখ্যান আছে, অনাবশ্যকবোধে তাহা লিখিত হইল না।

চণ্ডীদাসের কল্পনাশক্তি বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়াযায়। মানবতী-রাধাসমীপে শ্রীকৃষ্ণের নাপিতী, মালিনী, বিদেশিনী, বণিক্‌পত্নী প্রভৃতি বেশে গমনবিষয়ক যে সকল বর্ণনা আছে, তাহাতে এবং অন্যান্যস্থলেও কল্পনাশক্তির বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। কিন্তু বিদ্যাপতির গীতাবলীতে যেরূপ ভাবগাম্ভীর্য্য ও বচনবৈচিত্র্য অধিক আছে, ইহাঁর গীতে সেরূপ পাওয়াযায় না। ইহাঁর রচনা সাদাসিদা সামান্য ভাব লইয়াই অধিক—বিশেষতঃ প্রায় সকল গীতই নিতান্ত আদিরসসম্পৃক্ত হওয়াতে প্রীতিকর বোধহয়না। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাকে একজন প্রধান কবি বলিয়া অবশ্য গণনাকরিতে হইবে। কারণ তিনি যে সময়ের লোক, সে সময়ে ঐরূপ ছন্দোবন্ধে রচনা করা সাধারণ ক্ষমতার কার্য্য নহে। তিনি তৎকালে অপরের অনুকরণ করিতে অধিক পান নাই, যাহা কিছু রচনা করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার স্বাভাবিকীশক্তিসম্ভূত বলিয়া বোধহয়। তাঁহার রচিত যে সকল গীত উদ্ধৃত হইয়াছে ও পরে হইবে, তৎপাঠেই পাঠকেরা এ বিষয়ের প্রমাণ পাইবেন।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনা যে, অতি প্রাচীন, তদ্বিষয়ে সংশয়ই নাই। কিন্তু ইহাই বাঙ্গালার আদি রচনা—অর্থাৎ আদ্যকালে এই

দুইজন ভিন্ন আর কেহই কোন বিষয়ে কোন রচনা করেন নাই—তাহা বলিতে পারা যায়না, প্রত্যুত ইহাঁদিগের রচনাতে যেরূপ কিঞ্চিৎ পারিপাট্য লক্ষিত হয়, তাহাতে ইহাঁদেরও পূর্ব্বে যে, বাঙ্গালারচনার কিছু অনুশীলন ছিল, কেহ কেহ কোন বিষয়ে কিছু লিখিয়াছিলেন—কালক্রমে সে সকলের লোপ হইয়াছে, অথবা অদ্যাপি স্থানে স্থানে আছে, আমরাই তাহার সন্ধান জানিতে পারিনাই, ইহাই বিলক্ষণ সম্ভব।

যাহাহউক আদ্যকালে গদ্যে কোন গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল কি না, তাহা বিলক্ষণ সন্দেহস্থল। এই পুস্তকের ২০শ পৃষ্ঠে উদ্ধৃত ১৫ সঙ্খ্যক পদে উল্লিখিত আছে যে, বিদ্যাপতি, ও চণ্ডীদাস গদ্যময়ও গীত রচনাকরিয়াছিলেন। কিন্তু সে গদ্য কখন দেখাযায় নাই এবং গদ্যময় গীত কিরূপ হইতে পারে, তাহাও সহজে বুঝিতে পারাযায়না; এই জন্য ওলেখার উপরে বিশেষ আস্থা প্রদর্শন অনাবশ্যক। বিশেষতঃ ইহা এক সাধারণ নিয়ম বলিয়া বোধহয় যে, সকল দেশেই গদ্যের পূর্ব্বে পদ্যই প্রথম রচিত হয়। গ্রীসদেশে লিনস্ অর্ফিয়স্ মিউজিয়স্ হোমর এবং ইটালী অর্থাৎ রোমে লিবিয়স্ এণ্ড্রোনিকস্ প্রভৃতি কবিগণ সর্ব্বপ্রথমে পদ্যেরই রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃতেও বেদ * সংহিতা রামায়ণ প্রভৃতি পদ্য গ্রন্থেরই প্রথম সৃষ্টি হয়। অতএব বাঙ্গালাতে যে, সে নিয়মের ব্যভিচার হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। পদ্যের মধ্যেও গীতই প্রথমে রচিত হয়। লোকে চিত্তবিনোদনার্থ স্বরসংযোগে গান গাইতে প্রবৃত্ত হইয়াই কবিত্বশক্তির প্রথম অঙ্কুর রোপণকরে। ঐ সকল গান প্রথমতঃ লিপিবদ্ধ থাকে না—বহুকালপর্য্যন্ত জনগণের রসনাবাসীই থাকে। পরে ক্রমশঃ লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়। পূর্ব্বোক্ত লিনস্

---

* বেদকে আপাততঃ গদ্য বলিয়া বোধহয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। উহাতে এক প্রকার ছন্দ আছে এবং উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত নামক তিন স্বরের সহযোগে উহা উচ্চারিত হয়, অতএব উহাও পদ্য ও গীতগ্রন্থ মধ্যে পরিগণিত।

হোমরাদির রচনা এবং বেদ রামায়ণাদি সকলই ঐরূপ গীতময়। অতএব বাঙ্গালারও আদ্যকালে পূর্ব্বোক্ত কবিদ্বয়ের অথবা তাদৃশ অন্য কোন কবির গীতময় রচনাই যে, প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাই সম্ভব বোধহয়।

এক্ষণে আদ্যকালে ভাষার কিরূপ অবস্থা ছিল, তদ্বিষয়ে অনুধাবন করিয়াদেখা আবশ্যক। বিদ্যাপতির যে কয়েকটী গীত পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে, ও নিম্নে যে—

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম্ রূপ নিহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু শ্রুতিপথে পরস না গেল॥
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়াইনু না বুঝিনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া যুড়ন না গেল॥
যত যত রসিক জন রসে অনুমগন অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতিকহে প্রাণ যুড়াইতে লাখে না মিলিল এক॥ প্রাচীন পদাবলী।

এই গীতটী উদ্ধৃত হইল ইহাতে—এবং তৎপ্রণীত এইরূপ অপরাপর গীতে নয়নপাত করিলেই আপাততঃ বিলক্ষণ এই প্রতীতি জন্মিবে যে, ঐ সময়ে বাঙ্গালাভাষা হিন্দির সহিত অত্যন্ত মিশ্রিত ছিল—অন্যথা বাঙ্গালাগীতে হাম্, কৈছন, মোয়, সোই, ঐছে ইত্যাদি ভূরি ভূরি হিন্দিশব্দ এবং হিন্দির ন্যায় ক্রিয়া কেন রহিল? কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, বিদ্যাপতিরচিত গীতে যেরূপ হিন্দিমিশ্রণ আছে, যদি ঐ সময়ের দেশভাষাই ঐরূপ হিন্দিমিশ্রিত হইত, তাহা হইলে তৎকালে যাহা কিছু রচিত হইয়াছে, তৎসমস্তেই ঐরূপ হিন্দিমিশ্রণ থাকিত—কিন্তু বস্তুগত্যা তাহা নহে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ইহাঁরা সমসাময়িক লোক। চণ্ডীদাসের যে সকল গীত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে এবং পর পৃষ্ঠে উদ্ধৃত—

তোমার প্রেমে বন্দী হইলাম শুন বিনোদ রায়। তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায়॥
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি। ভরমে তোমার রূপ ধরণিতে লিখি॥
গুরুজনমাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া। পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥
পুলকে পুরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে জল। তাহা নেহারিতে আমি হই যে বিকল॥
নিশি দিশি বন্ধু তোমায় পাসরিতে নারি। চণ্ডীদাসে কহে হিয়ায় রাখ স্থির করি॥

(প, ক, ত, ৭৮৬)

এই গীতে এবং এইরূপ সকল গীতেই হিন্দির ভাগ প্রায় কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইবে না। অতএব বিবেচনা কর যে, যদি ঐ সময়ের ভাষাই ওরূপ হিন্দিমিশ্রিত হইত, তাহা হইলে সমসাময়িক দুই কবির রচনা কখন এরূপ বিসদৃশ হইতে পারিত না।

দ্বিতীয়তঃ বিদ্যাপতিরও কোন কোন গীতে হিন্দির অংশ নাই—চণ্ডীদাসেরও ১।২টী গীতে হিন্দির অংশ বিলক্ষণ আছে এবং ইহাঁদিগের শতাধিকবৎসরপরবর্ত্তী গোবিন্দদাসপ্রভৃতির প্রায় সমস্ত গীতেই বিদ্যাপতির অপেক্ষাও অধিক হিন্দি আছে। উদাহরণার্থ নিম্নভাগে আরও কয়েকটী গীত উদ্ধৃত হইতেছে—

"রাই জাগ রাই জাগ শুকসারী বলে। কত নিদ্রা যাও কাল মাণিকের কোলে॥
রজনী প্রভাত হইল বলি যে তোমারে। অরুণ কিরণ দেখি প্রাণ কাঁপে ডরে॥
সারী বলে শুক তুমি গগনে উঁড়ি ডাক। নব জলধর আনি অরুণেরে ঢাক॥
শুক বলে শুন সারী আমরা পশু পাখী। জাগাইলে না জাগে রাই ধরম্ কর সাখী॥
বিদ্যাপতি কহে চাঁদ গেল নিজঠাঞি। অরুণ কিরণ হবে আমি ঘরে যাই"॥

(প, ক, ত, ৬৭১)

* * * "তুহু একে রমণীশিরোমণি রসবতী কোন্ ঐছে জগমাহ।
তোহারি সমুখে শ্যামসঞে বিলসব কৈছন রস নিরবাহ॥
ঐছন সহচরীবচন শ্রবণ ধরি সরমে ভরমে মুখ ফেরি॥
ঈষত হাসি মনে মান তেয়াগল উলসিত দোঁহে দোঁহা হেরি॥
* * দ্বিজ চণ্ডীদাস আবির জোগায়ত সকল সখীগণ সাথে"॥ ঐ ১৪৮৮।

" কাহে পুন, গৌরকিশোর। অবতনমাথে লিখত মহীমণ্ডল নয়নে গলয়ে ঘন লোর ॥
কনক বরণ তনু, ঝামর ভেল জনু, জাগরে নিদ নাহি ভায়।
যোই পরশে পুন, তাক বদন ঘন, ছল ছল লোচনে চায় ॥
খেনে খেনে বদন পাণিতলে ধারই ছোড়ই দীঘ নিশাস।
ঐছন চরিতে তারল সব নর নারী, বঞ্চিত গোবিন্দদাস" ॥ (ঐ ১৮৩৩)।

অতএব এস্থলে বিবেচনা করিতেহইবে যে, এক সময়ের দুইজন কবির মধ্যে একের অধিকাংশ রচনাতেই হিন্দির অত্যন্ত মিশ্রণ কিন্তু কোন কোন রচনাতে প্রায় কিছুই নাই এবং দ্বিতীয়ের সমস্ত রচনাতেই হিন্দির সংস্রব প্রায় কিছুই নাই কিন্তু কোন কোনটীতে বিলক্ষণ আছে। অতএব ঐ সময়ে এ দেশের সাধারণ ভাষাই ঐরূপ হিন্দিমিশ্রিত ছিল কি না এবং উক্ত কবিদ্বয়ের ওরূপ বিসদৃশ রচনা কেন হইল? তদ্বিষয়ের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করা আবশ্যক।

আমরা যখন্ বিদ্যাপতিকে মিথিলাবাসী বলিয়াছি, তখনই এ প্রশ্নের সমাধান হইয়াগিয়াছে। যদিও তৎকালে বঙ্গদেশ ও মিথিলা অভিন্নরাজ্য ও সম্ভবতঃ একভাষাভাষী ছিল, স্বীকার করা যায়, তথাপি পরস্পর অত দূরবর্ত্তী উক্ত দুই দেশের ভাষাগত কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ছিল না, তাহা সম্ভব নহে। বিদ্যাপতির রচনায় সেই বৈলক্ষণ্য প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে যে, বিদ্যাপতি কয়েকটী গীত কেবল বঙ্গদেশে প্রচলিত শব্দের দ্বারা এবং অধিকাংশ গীত মিথিলা-প্রচলিত শব্দ দ্বারা রচনা করিয়াছিলেন। তৎকালে উভয় দেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং কিয়ৎপরিমাণে এক ভাষাভাষিত্ব থাকায় কবির এরূপ বোধও হইয়া থাকিবে যে, তাঁহার প্রণীত গীত সকল সাধারণতঃ উভয় দেশেরই কৃতবিদ্য লোকে বুঝিতে পারিবে।

বিদ্যাপতির রচনায় হিন্দীসম শব্দের মিশ্রণের হেতু উক্তরূপে নির্ণীত হইতে পারে সত্য বটে, কিন্তু আবার জিজ্ঞাসা হয় যে, উহাঁরই সমসাময়িক প্রকৃত বঙ্গদেশবাসী চণ্ডীদাসের কোন কোন রচনায় এবং তদুত্তর-

-কালবর্ত্তী গোবিন্দদাস প্রভৃতির রচনায় বহুল হিন্দীসম শব্দের মিশ্রণ কেন হইল? এপ্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, যে সকল রচনার উপর নির্ভর করিয়া এই বিচার করাযাইতেছে, তৎসমস্তই রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণনবিষয়ক সংগীত। উক্তরূপ সংগীত প্রথমে বৃন্দাবনের সন্নিহিত স্থানে এবং ব্রজভাষাতেই বিরচিত হইয়াথাকিবে। বঙ্গদেশবাসী কবিগণ তাহা হইতেই ঐ প্রথা প্রথমে শিক্ষাকরেন এবং শিক্ষা করিয়া, যাঁহাদিগের ঐ ভাষা নিতান্ত মধুর বলিয়া বোধহয়, তাঁহারা ঐ মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, কিছু দুর্ব্বোধ হইলেও ঐ ভাষার অনেক শব্দ ও ক্রিয়া স্বদেশীয়ভাষার সংগীতমধ্যে বিনিবেশিত করিয়াছেন; কিন্তু কেহ কেহ আবার মাধুর্য্যবোধসত্বেও কিছু দুর্ব্বোধ বলিয়া তদ্‌গ্রহণে তত যত্ন করেন নাই। অতএব গীতমধ্যে ব্রজভাষার শব্দগ্রহণ ঐচ্ছিক হওয়াতে এবং প্রত্যেক লোকেরই রুচি বিভিন্নপ্রকার হওয়াতে চণ্ডীদাস গোবিন্দদাসাদির রচনা ওরূপ বিসদৃশ হওয়া অসঙ্গত হয়না। পূর্ব্বোদাহৃত গীতাবলীতে যে সকল হিন্দিসম শব্দ দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল হিন্দিই নহে; উহার কতক প্রাকৃত ও কতক ব্রজভাষা—অথবা তাহাদেরই কোনরূপ অপভ্রংশ। দহসি, পারই, পুছসি, ধারই, হম্‌, সো, তুহ ইত্যাদি শব্দত অবিকল প্রাকৃত এবং ঐছন, যৈছন, তৈছন, কৈছন, হিয়া, ঈসা, বীসা, তীসা, কীসা, কাহে ইত্যাদি শব্দ প্রাকৃতের অপভ্রংশ। তদ্ভিন্ন যাকর, কতিহুঁ, মোতিম, ভেল, রহই, চললহি, পয়হি, গায়ত, পাওল, লখই, তহি, জানল, করল, ভাসল, নিহারলু, রাখলু, কাহু, না পেখ, তুহু, অগমাহ, বিলম্ব, জোগায়ত, জনু, লিখত—ইত্যাদি পদ সকলের একটীও খাটী হিন্দি নহে; বোধহয় ওগুলি ব্রজভাষা হইবে। তবে এক্ষণকার কাহারও কাহারও মতে হিন্দি ও ব্রজভাষা একই—অথবা ঘনিষ্ঠরূপে পরস্পর নিতান্তসম্পৃক্ত—হিন্দুস্থানী বা উর্দ্দু ভাষা তাহাহইতে স্বতন্ত্র। যদি এ মত গ্রাহ্য করা যায়, তাহাহইলে পূর্ব্বোল্লিখিত ব্রজভাষার শব্দ সকলকে হিন্দি বলিলেও আমাদের কোন আপত্তি

নাই। যাহাহউক দেখা যাইতেছে যে, কৃষ্ণচরিত্রবর্ণনে ব্রজভাষামিশ্রিত রচনাই অনেকের অধিকতর প্রীতিকর হয়। বোধহয় ব্রজভাষার মাধুর্য্যই ইহার একমাত্র কারণ নহে; পবিত্রতাবোধও কিছু কারণ হইতে পারে। যে সকল কৃষ্ণপরায়ণ ভক্ত পরম পবিত্রবোধে ব্রজের মৃত্তিকা পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে ব্রজের ভাষাকে ওরূপ সমাদর করা অসম্ভব নহে। পূর্ব্বে গোবিন্দদাসের যে গীতটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে ব্রজভাষার শব্দ অনেক আছে। গোবিন্দদাস চৈতন্যের পরবর্ত্তী লোক। তাঁহার সময়ে এবং তাঁহার পরেও জ্ঞানদাস, রাধামোহনদাস, কবিশেখর, রামানন্দ, প্রভৃতি যে সকল কবি সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের রচনাতেও ব্রজভাষার কথা অনেক আছে—কিন্তু সেই সময়েই অথবা তাহারই সন্নিকট সময়ে চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত, জীবগোস্বামীর করচা প্রভৃতি, সঙ্গীতময় নহে এরূপ, যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাতে ব্রজভাষার ভাগ অতি অল্পই দেখা যায়। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, বিদ্যাপতি প্রভৃতির সময়েও কৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীতময় রচনাতে ব্রজভাষা বা হিন্দির সংস্রব যেরূপ অধিক ছিল, তৎকালের সাধারণভাষাতে সেরূপ ছিল না। যে সময়ের ভাষাতে ব্রজভাষার সংস্রব কিছুমাত্র নাই, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, সে সময়েরও ২।১ জন কবি, যখন্ সাধ করিয়া ব্রজভাষামিশ্রিত গীত লিখিতে গিয়াছেন, তখন্ ও বিষয়ে আমাদের আর কিছুই বক্তব্য নাই। সে গীত এই—

'এতহুঁ নিরখত, অতহুঁ বরিখত, নয়ন অবিরত বরিখে" ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

"কাহে সোই জীয়ত মরত বিধান।'

ব্রজকিশোর সোই কাঁহা গেল ভাগই, ব্রজজন টুটায়ল পরাণ।" শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র।

তবে এতাবতা এরূপ সিদ্ধান্তও করাযাইতেছে না যে, আমরা যাহাকে আদ্যকাল বলিতেছি, তখন যেরূপ বাঙ্গালা ছিল, এখনও অবিকল সেইরূপ বাঙ্গালাই আছে। তাহা কখন হইতে পারে না। যেমন

আকরোত্থিত অসংস্কৃত বস্তুর গাত্র নিরীক্ষণ করিলে তাহাতে তদাকরিক অন্যান্য দ্রব্যের সংযোগ লক্ষিত হয়, সেইরূপ আদ্যকালের বাঙ্গালাতে তদাকরীভূত সংস্কৃত বা প্রাকৃতের অধিকসংস্রব লক্ষিত হইবে, তাহা যুক্তিসঙ্গতই বটে। এই জন্যই পুচ্ছসি, দহসি, করই, হসই, বোলে, ইত্যাদি সংস্কৃত বা প্রাকৃত ক্রিয়ার যোগ প্রাচীন বাঙ্গালায় অনেক দেখা যায়।

বাঙ্গালাভাষায় এক্ষণে যেরূপ শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে, আমাদিগের অবলম্বিত আদ্যকালের বাঙ্গালাতেও রজনীপ্রভাত, মৃগমদসার, নবজলধর, বন্দী, ধরণী, গুরুজন, মধুযামিনী, পুলক ইত্যাদি সংস্কৃত শব্দসকলই অনেক ব্যবহৃত হইত। কিন্তু এক্ষণকার ন্যায় সমাসঘটিত বড় বড় কথা ব্যবহৃত হইত না। বিশেষণও এক্ষণকার ন্যায়ই তখন প্রায় বিশেষ্যের পূর্ব্বেই বিনিবেশিত হইত। স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ হইলে তাহাতে যে, স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন ঈ আ দিতেই হইবে, এরূপ কোন নিয়ম ছিল না—মধুরতা ও শ্রুতিকটুতার অনুরোধে রচয়িতার ইচ্ছামতই প্রদত্ত হইত। ফলতঃ তৎকালে বাঙ্গালার কোন ব্যাকরণ ছিল না—সুতরাং রচয়িতাদিগকে ব্যাকরণের নিয়মে চলিতে হইত না। বাঙ্গালা সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হইলেও সংস্কৃত মহামাহাত্ম্যশালী বলিয়া ক্রমশঃ উহারই অনুসরণ বাঙ্গালায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সুতরাং সংস্কৃতের বাক্যবিন্যাসপ্রণালী যেরূপ, বাঙ্গালার রচয়িতারা ক্রমে ক্রমে সেইরূপই করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। স্থূল কথা এই যে, আদ্যকালের যে সকল গ্রন্থ আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি—তাহাদের রচনার সহিত এক্ষণকার রচনার আত্যন্তিকী বিভিন্নতা লক্ষিত হয় না। তবে স্থল বিশেষে ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ, কারক, বিভক্তি ও সর্ব্বনাম প্রভৃতিতে স্পষ্ট প্রাচীনতা দেখা যায়, তাহা অবশ্য বলিতে হইবে। তাৎকালিক দেশভাষায় প্রাকৃত, হিন্দি বা ব্রজভাষায় অত্যধিকরূপে মিশ্রণ না থাকুক, কিন্তু অল্পমিশ্রণ ছিল তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন আর একটী কার্য্যে প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালায় অনেক বৈলক্ষণ্য দেখা

যায়।—সংযুক্ত বর্ণের বিশ্লেষকরণরূপ বিপ্রকর্ষণকার্য্য আধুনিক পদ্যেও অনেক আছে বটে কিন্তু প্রাচীন পদ্যে ঐ কার্য্যের অত্যন্ত আধিক্য অনুভূত হয়। সেই বিপ্রকর্ষণকার্য্য এইরূপ—মূর্ত্তি=মূরতি, নির্ম্মল=নিরমল, নির্ব্বাহ=নিরবাহ, ধর্ম্ম=ধরম, কর্ম্ম=করম, প্রমাণ=পরমাণ, লক্ষ্মী=লছিমা, জন্ম=জনম, প্রীতি=পিরীতি, দর্শন=দরশন, তৃপ্ত=তিরপিত, স্পর্শ=পরশ, ভ্রম=ভরম, প্রসঙ্গ=পরসঙ্গ, দ্রব্যে=দরবযে, ব্যক্ত=বেকত ইত্যাদি।

এস্থলে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে—আদ্যকালে ষ কে লোকে অনেকস্থলে খ রূপে উচ্চারণ করিত, যথা—পুরুষ=পুরুখ, ষষ্ঠ=খখঠ ইত্যাদি। হিন্দিতে অদ্যাপি এইরূপ ব্যবহার আছে।

ছন্দ—আদ্যকালের যে সকল পদ্য রচনা দেখা যায়, তাহাতে পয়ার ও ত্রিপদী এই দুইটীমাত্র ছন্দ দৃষ্ট হয়। এক্ষণকার চলিত পয়ারের নিয়ম এই যে, উহার দুইটী সমান অংশ থাকে। তাহার প্রথম অংশটীকে পূর্ব্বার্দ্ধ ও শেষটীকে পরার্দ্ধ কহে। পূর্ব্বার্দ্ধের উপান্তিম ও অন্তিম বর্ণ যাহা হইবে, পরার্দ্ধের ঐ ঐ বর্ণও অবিকল তাহাই হওয়া চাই। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক অর্দ্ধেরই ৮ম ও ১৪শ অক্ষরে যতি—অর্থাৎ বিরাম থাকা আবশ্যক। ত্রিপদীতেও দুইটী অর্দ্ধ থাকে, প্রত্যেক অর্দ্ধে বিংশতিটী করিয়া অক্ষর; উভয় অর্দ্ধের শেষ বর্ণে পয়ারের ন্যায় মিল, প্রত্যেক অর্দ্ধেই ষষ্ঠ দ্বাদশ ও বিংশ অক্ষরে যতি এবং ৬ষ্ঠ ও ১২শ বর্ণে পয়ারের ন্যায় মিল। এই ত্রিপদীকে লঘুত্রিপদী কহে—এতদ্ভিন্ন অন্যবিধ ত্রিপদীও আছে। এই পয়ার ও ত্রিপদীর শেষবর্ণে মিলন থাকাতে ইহাকে মিত্রাক্ষর ছন্দ কহে।

এক্ষণে যেরূপ অক্ষরগণনার নিয়মানুসারে বিশুদ্ধ পয়ার ও ত্রিপদী রচিত হইতেছে, আদ্যকবিরা সেরূপ নিয়মের বশবর্ত্তী ছিলেন না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহাদের পদ্যসকল সঙ্গীতময়—সুতরাং সঙ্গীতের স্বরের

ধ, যেখানে আবশ্যকবোধ করিয়াছেন সেইখানেই, তাঁহারা যতি দিয়াছেন—তাহাতে কোনস্থলে অক্ষর অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, কোন-স্থলে বা কমিয়া পড়িয়াছে। তদ্ভিন্ন তাঁহারা বর্ণের মিলনবিষয়েও অধিক সাবধান ছিলেন না। যে সকল বর্ণের উচ্চারণ কর্ণে প্রায় একবিধ বলিয়াই বোধ হয়, তাঁহারা তাদৃশ বর্ণেরও অর্থাৎ বর্গের ১ম ও ২য় বর্ণের এবং ৩য় ও ৪র্থ বর্ণের—যথা ক ও খ এর, ত ও থ এর, গ ও ঘ এর এবং ব ও ভ এর—মিল রাখিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ তাঁহারা ওবিষয়ের এক-প্রকার স্মৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহাদিগকে কাহারও শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হয় নাই, তাঁহাদিগেরই সৃষ্ট শৃঙ্খল আমরা পরিতেছি।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে, পয়ার ও ত্রিপদীর মূল কি?—যখন্ বাঙ্গালাভাষারই আদি মূল সংস্কৃত হইল, তখন তদঙ্গীভূত ছন্দের মূলও যে সংস্কৃতই হইবে ইহাই বিলক্ষণ সম্ভব। সংস্কৃতে অনুষ্টুপ্ ছন্দ যেরূপ সাধারণ, বাঙ্গালায় পয়ার সেইরূপ। সুতরাং পয়ারকেই অনুষ্টুভের স্থানীয় বলিয়া বোধহয়। কিন্তু ইহা যে, অনুষ্টুপ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা সহসা বলিতে পারা যাইতেছে না। যেহেতু উভয়ের প্রকৃতি একরূপ নহে। প্রথমতঃ অনুষ্টুপ্ চতুষ্পাদ, ইহা দ্বিপদ; অনুষ্টুভে সমুদয়ে ৩২ অক্ষর, ইহাতে ২৮; অনুষ্টুভে বর্ণের গুরু লঘুতার নিয়ম আছে, ইহাতে তাহার প্রায় কিছুই নাই—শুনিতেও দুই ছন্দ কর্ণে একবিধ বলিয়া কোন মতেই বোধ হয় না। এই জন্য কেহ কেহ কহেন, বাঙ্গালার বর্ত্তমান পয়ার সংস্কৃত কোন ছন্দের অনুরূপ নহে, উহা পারসীর 'বয়েৎ' নামক ছন্দের অনুকারক। একটী বয়েৎ নিম্ন ভাগে লদ্ধৃত হইল—

করীমা ববখ্সায় বরহালমা। কে হাস্তেম্ আসিরে কমন্দে হাওয়া॥

পারসীর শ্লোক বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিয়া তাহার বর্ণ সংখ্যাদিকরা যুক্তিসঙ্গত হয় না বটে, কিন্তু আমরা ইহা অন্য অক্ষরে লিখিয়া বিচার করিতে পারি না—সুতরাং ইহা বাঙ্গালাতেই লিখিয়া বিচার করা

যাইতেছে।—দেখ এই শ্লোক অষ্টাদশ অক্ষরে পরিমিত; ইহার পূর্ব্বার্দ্ধে অষ্টাক্ষরের পর যতি আছে বটে, কিন্তু পরার্দ্ধে সপ্তাক্ষরের পর; পূর্ব্বার্দ্ধের যতির পর ৫টী অক্ষর এবং পরার্দ্ধের যতির পর ৬টী অক্ষর অবশিষ্ট থাকে, এবং কর্ণেও পয়ারের সহিত একরূপতা ঠিক্ বোধ হয়না। ফলতঃ পয়ারের সহিত উহার কিঞ্চিন্মাত্র সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু তন্মাত্র দর্শনেই এক বিজাতীয় ভাষার ছন্দকে বাঙ্গালা পয়ারের মূল বলিতে যাওয়া অপেক্ষা সংস্কৃতের যে ছন্দের সহিত উহার কতক সাদৃশ্য আছে, তাহাকেও উহার মূল বলা সঙ্গত হয়। সম্ভ্রম নষ্ট করিয়া যার তার অধমর্ণ হওয়া অপেক্ষা, যাহার নিকট সম্ভ্রম রাখিবার প্রয়োজন নাই, তাদৃশ চিরন্তন মহাজনের খাদক বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দেওয়াই ভাল। আমরা দেখিতেছি—গীতগোবিন্দের স্থানে স্থানে যে কতকগুলি গীত আছে সে সকলের সহিত পয়ারের কতক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। নিম্নে কয়েকটী সেই গীত উদ্ধৃত হইল—

রাধিকা তব বিরহে কেশব।—

সরস মসৃণমপি, মলয়জপঙ্কং। 'পশ্যতি বিষমিব, বপুষি সশঙ্কং'।
শ্বসিত পবনমনু-পমপরিণাহং। মদন দহনমিব বহতি সদাহং॥
দিশি দিশি করতি স-জলকণ জালং। নয়ননলিনমিব, বিগলিতনালং॥
নয়নবিষয়মপি, কিশলয়তল্পং। 'গণয়তি বিহিতহু-তাশবিকল্পং'॥
হরিরিতি হরিরিতি, জপতি সকামং। 'বিরহ বিহিত মর-ণেব নিকামং'॥

এই সকল ছন্দোবদ্ধ গীত অক্ষরগণনানুসারে রচিত নহে, মাত্রা * গণনানুসারে রচিত। ইহার প্রতি অর্দ্ধে ষোল মাত্রা, অষ্টমমাত্রার পর যতি এবং উভয় অর্দ্ধের শেষবর্ণে মিল। সুতরাং মাত্রার নিয়মানুসারে গণনায় কোন অর্দ্ধের অক্ষর স্থলবিশেষে বাড়িয়াযায়, স্থলবিশেষে কমিয়াপড়ে। সেই জন্যই অপরাপর পাদ সকল পয়ারের তুল্য হইলেও

---

* লঘুস্বর একমাত্রা, গুরুস্বর দুইমাত্রা। সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্বস্বর এবং অনুস্বার ও বিসর্গাবশিষ্ট স্বর গুরু হয়।

',' চিহ্নিত ২য় ৮ম ও ১০ম পাদে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। যাহাহউক একণে ইহা বলা যাইতে পারে যে, উপরিউক্তবিধ গীতময় বৃত্ত হইতেই পয়ারের সৃষ্টি হইয়াছে। উচ্চারণস্বরেও এই বৃত্ত এবং পূর্ব্বলিখিত—

কতিহুঁ মদন তনু, দহসি হামারি। হাম নহ শঙ্কর হুঁ বর নারী।

ইত্যাদি পূর্ব্বোদহৃত পদকল্পতরুর ৮৬৮ সংখ্যক প্রাচীন পয়ার একরূপই বোধহয়।

ত্রিপদী ও গীতগোবিন্দের নিম্নলিখিত প্রকার গীত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, একথাও একণে বলা যাইতে পারে—

পততি পতত্রে, বিচলতি পত্রে, শঙ্কিত ভবদুপয়ানং।
রচয়তি শয়নং, সচকিত নয়নং, পশ্যতি তব পন্থানং॥
মুখর মধীরং, ত্যজ মঞ্জীরং, রিপুমিব কেলিষু লোলং।
চল সখি কুঞ্জং, সতিমির পুঞ্জং, শীলয় নীল নিচোলং॥

এই বৃত্তের প্রতি অর্দ্ধে ২৮টী মাত্রা আছে, ৮ম এবং ১৬শ মাত্রায় যতি ও মিল এবং উভয় অর্দ্ধের শেষবর্ণেও মিল। ইহারও অনেক পঙক্তি অক্ষরগণনানুসারেও ত্রিপদীর সহিত একরূপ হয় এবং কর্ণেও উভয়েরই উচ্চারণ একরূপ বলিয়াই বোধহয়। অতএব এই সঙ্গীতময়বৃত্তের অনুকরণেই যে, ত্রিপদীর উৎপত্তি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সম্ভব বিবেচনা করিতে গেলেও ইহাই প্রতীয়মান হয়। কারণ জয়দেব বাঙ্গালাদেশের বীরভূম প্রদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন—তাঁহার গীতগোবিন্দ অতি কোমল, ললিত ও মধুর ভাষায় বিরচিত—তজ্জন্যই লোকের মন বিলক্ষণ আবর্জ্জিত হয়—বিশেষতঃ উহা পরমারাধ্য রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণন-সংক্রান্ত সঙ্গীতময় হওয়ায় এবং উক্ত সঙ্গীতের অন্যতমে "দেহি পদপল্লব মুদারং" এই অংশটী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক লিখিতহওয়ার প্রসিদ্ধি থাকায়, উক্তগ্রন্থ ভাগবতদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছিল। সুতরাং, আদ্য কবিরা বাঙ্গালায় উক্তরূপ গীতবিরচনে প্রবৃত্ত হইয়া স্বদেশসম্ভূত তাদৃশ শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকে আদর্শ করিয়া স্বকীয়

গীতের ছন্দোরচনা করিবেন, ইহা যুক্তিবহির্ভূত নহে। কিন্তু এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আধুনিক পয়ার ও ত্রিপদীতে অক্ষরগণনার যেরূপ নিয়ম হইয়াছে—পূর্ব্বে তাহা ছিল না। আদ্য কবিরা বোধ হয় প্রথমে মাত্রানুসারেই উক্তরূপ পদ্যের রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—কতিহুঁ মদন তনু ইত্যাদি পদ্য মাত্রাগণনানুসারেও প্রায় ঠিকই হয়। কিন্তু বাঙ্গালাতে মাত্রাগণনার রীতি রক্ষা করা তাদৃশ সুবিধাজনক হয়না, দেখিয়া তদ্বিষয়ে তাঁহারা ক্রমশঃ শিথিলাদর হয়েন এবং সুরের অনুরোধে আবশ্যকমত বিরাম দিয়া যান। অক্ষরগণনার রীতি কাল-ক্রমে আপনাআপনিই হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা তদ্বিষয়ে কোন নিয়মপদ্ধতি করিয়া যান নাই এবং তদনুসারে চলেনও নাই।

'পয়ার' এই শব্দটী কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়-রূপে বলিতে পারাযায়না, কিন্তু বোধহয় 'পাদ' শব্দের অপভ্রংশে পায়া বা পয়া শব্দ উৎপন্ন হয়—যথা সেপায়া, খাটের পায়া ইত্যাদি এবং ঐ পয়া হইতেই পয়ার শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছে, অতএব পয়ার শব্দের অক্ষরার্থ পাদ (চরণ) বিশিষ্ট। ক্রমশঃ উহা নির্দ্দিষ্টরূপ ছন্দোবোধার্থ যোগরূঢ় হইয়া উঠিয়াছে।

'ত্রিপদী' ইহা সংস্কৃতশব্দ। উহার প্রতি অর্দ্ধে ৩ স্থানে যতি, অথবা উহার ৩টী করিয়া পদ (চরণ থাকাতে উহাকে ত্রিপদী কহে।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মধ্যকাল।

চৈতন্যদেবের উৎপত্তিকাল হইতে আমরা মধ্যকাল গণনা করিয়াছি। চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে (১৪৮৫ খৃঃ অঃ) নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হইয়া ১৪৫৫ শকে* (খৃঃ ১৫৩৩ অব্দে) নীলাচলে (জগন্নাথক্ষেত্রে) তিরোভূত হয়েন। মৃতবৎসা মাতার পুত্র বলিয়া নারীগণ প্রথমে ইহাঁকে 'নিমাই' এবং অত্যুজ্জ্বলগৌরবকান্তি বলিয়া কেহ কেহ 'গৌরাঙ্গ' বলিয়াও ডাকিত। অন্নপ্রাশনের সময়ে ইহাঁর নাম 'বিশ্বম্ভর' হয়; পরে পঞ্চবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বিষয়বাসনাবিসর্জ্জনপূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবার সময়ে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' এই নূতন নামকরণ হইয়াছিল। ইনি অলৌকিক-বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন বলিয়া অতি অল্পকালমধ্যেই ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কার পুরাণ ন্যায় স্মৃতি বেদান্ত প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে পরম প্রাবীণ্যলাভ করেন, এবং বৃহন্নারদীয় পুরাণলিখিত—

হরে নাম হরে র্নাম হরে র্নামৈব কেবলং। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতি রন্যথা॥

এই বচন প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া কলিতে হরিনামোচ্চারণ, হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন ও হরিভক্তি ভিন্ন জীবের পরিত্রাণ পাইবার উপায়ান্তর নাই, এই মত প্রচার করিয়া নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, মাধব, হরিদাস, রূপ, সনাতন প্রভৃতি বহুসঙ্খ্যক স্বগণ ও স্বসহচর সমভিব্যাহারে মৃদঙ্গের সহিত তানলয়-বিশুদ্ধ স্বরসংযোগে হরিনামসঙ্কীর্ত্তনের প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার লোকাতীত রূপলাবণ্য ও অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধ্যাদিসন্দর্শনে

---

* শাকেহষ্টচতুর্দ্দশশতে রবিবাজিযুক্তে গৌরোহরি র্ধরণিমণ্ডল আবিরাসীৎ।
তস্মিং শ্চতুর্নবতিভাজি তদীয়লীলাগ্রন্থোহয় মাবিরভবৎকতমস্য বক্ত্রাৎ॥ চৈতন্য চন্দ্রোদয়।
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ। চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইলা অন্তর্ধান।
চৈতন্য চরিতামৃত আদ্যখণ্ড।

পূর্ব্বহইতেই তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া কতক লোকের বোধ হইয়াছিল। এক্ষণে আবার তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ে নূতনপ্রকার মতের উদ্ভাবন ও সঙ্কীর্ত্তন সময়ে অকৃত্রিম পরমানন্দে মগ্নহইয়া নর্ত্তন এবং হরিনামোচ্চারণমাত্রেই রোমাঞ্চ অশ্রুপাতাদি সাত্ত্বিকভাবের আবির্ভাব অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগের ঐ বোধ আরও বদ্ধমূল হইয়াছিল। বিশেষতঃ তাঁহার উদ্ভাবিত ধর্ম্ম শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতাদি সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থসকল হইতেই উদ্ধৃত বচনপরম্পরাদ্বারা সপ্রমাণ করা হইত—উহার অনুষ্ঠানপ্রণালী প্রচলিত-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানপ্রণালী অপেক্ষা অনেক সহজ—কি হিন্দু, কি মুসলমান কাহাকেও উহা অবলম্বন করাইতে বাধা ছিল না—এবং তিনি নিতান্ত দুঃশীলের সুশীলতাসম্পাদন, কুষ্ঠীর কুষ্ঠবিমোচন প্রভৃতি কতকগুলি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কার্য্যসম্পাদন করিয়াছেন, এরূপ প্রবাদ দেশমধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল, সুতরাং অচিরকালমধ্যেই তাঁহার শিষ্য অসংখ্য হইয়া উঠিল। সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বনের পর তিনি শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে বারাণসী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা, জগন্নাথক্ষেত্র, সেতুবন্ধ প্রভৃতি নানাদেশে পর্য্যটন, এবং তত্তদ্দেশীয় পণ্ডিতদিগের সহিত বিচার করিয়া স্বমত সংস্থাপনকরেন। ঐ সময়ে শিষ্যগণ তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচারকরিত, সুতরাং তিনি যেখানে যেখানে যাইতেন, সেইখানেই শিষ্যসংখ্যাবৃদ্ধি হইত। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে অনেকে মহামহোপধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারাই বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ সকলের পুনরুদ্ধার করেন এবং তদীয় লীলাবর্ণন-সংক্রান্ত বহুসগ্রন্থ রচনাকরেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এক রূপগোস্বামীই ১২। ১৩ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনাকরিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ২ খানি উৎকৃষ্ট নাটক, ১ খানি অলঙ্কার ও ১ খানি ব্যাকরণ আছে। তদ্ভিন্ন সনাতনগোস্বামী, জীবগোস্বামী, গোপালভট্ট, কর্ণপুর প্রভৃতি তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যদিগের বিরচিত বহুল গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে। ফলতঃ চৈতন্যের উৎপত্তি হইতে কিছুদিন পর্য্যন্ত সময়কে বাঙ্গালাদেশের

সৌভাগ্যের কাল বলিয়া গণনাকরিতে হইবে। ঐ সময়ে গৌড়ের বাদসাহ হোসেন্‌সার সুবিচারে প্রজালোক অনেক নিরুপদ্রব ছিল; ঐ সময়েই তর্ককেশরী রঘুনাথ শিরোমণি দুর্বিগাহধিষণাশক্তিসহকারে ন্যায়-শাস্ত্রের নূতনরূপ পন্থা আবিষ্কৃত করেন, এবং ঐ সময়েই স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাপাণ্ডিত্যসহকারে তৎকালপ্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা-সকল বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়া অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব নামক অভিনবপ্রকার স্মৃতিসংগ্রহের প্রণয়নকরেন। অধিক কি বাঙ্গালাদেশে সংস্কৃতশাস্ত্রের যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহা ঐ সময়েই হইয়াছে বা হইবার সূত্রপাত হইয়াছে, এ কথা অবশ্য বলাযাইতেপারে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে বলিতে গেলে ঐ সময়কেই ইহার উৎপত্তিকাল বলিলেও অসঙ্গত হয় না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পূর্ব্বোক্তরূপ পদাবলী ভিন্ন আদ্যকালের একখানিও গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। চৈতন্যের সময় হইতেই বাঙ্গালায় গ্রন্থরচনা আরম্ভ হয়। ইহাও একপ্রকার উল্লিখিত হইয়াছে যে, আদ্যকালের পণ্ডিতদিগের চিত্তভূমিতে যে কিছু নূতনভাব অঙ্কুরিত হইত, তাহা তাঁহারা পণ্ডিতসমাজেরই প্রদর্শনার্থ সংস্কৃতক্ষেত্রে রোপণ করিতেন—জনসাধারণকে দেখাইবার প্রয়োজনবোধ করিতেন না। চৈতন্যোপাসকদিগের ধর্ম্ম আপামর সাধারণ সকলেরই আশ্রয়ণীয়, অতএব তাঁহারা খৃষ্টিয় মিসনরিদিগের ন্যায় তৎপ্রচারার্থ দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া সর্ব্ববিধ লোকের চিত্তাকর্ষণের চেষ্টা করিয়া ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা স্বাবলম্বিত ধর্ম্মপ্রণালীসকল কেবল পণ্ডিতজনগম্য সংস্কৃতে নিবদ্ধ না করিয়া সাধারণের বোধার্থ চলিতভাষা বাঙ্গালায় গ্রন্থাকারে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অতএব ঐ সময়কে বাঙ্গালাগ্রন্থপ্রণয়নের আদিকাল বলা অসঙ্গত হয়না। তাঁহাদিগের ঐ সকল গ্রন্থকেই আদর্শ করিয়া কৃত্তিবাস কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কবিগণ লেখনী-চালনা করিয়াছিলেন। অতএব দেখাযাইতেছে যে, বৈষ্ণবসম্প্রদায় হইতেই বাঙ্গালাকাব্যের উৎপত্তি ও উন্নতি হইয়াছে। শাক্ত ও বৈষ্ণব

সম্প্রদায়ের পরস্পরবিবাদসংক্রান্ত যে সকল গল্প আছে, তাহাতে বীরধর্ম্মী শাক্তদিগের জয় ও নিরীহস্বভাব বৈষ্ণবদিগের পরাজয়ের কথাই বর্ণিত হয়; তচ্ছ্রবণে শাক্তেরা সহাস্যমুখ ও বৈষ্ণবেরা ম্লানকান্তি হইয়াথাকেন; কিন্তু কাহাদের হইতে বাঙ্গালাকাব্যের জন্মলাভ হইয়াছে? কাহারা মাতৃভাষাকে বসনভূষণাদি দ্বারা সাজাইবার চেষ্টা করিয়াছেন? এবিষয়ে ইতিহাস কাহাদের নাম চিরকাল সগৌরবে স্মরণ করিবে? ইত্যাদিরূপ বিচার ও বিবাদ উপস্থিত হইলে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নিকট শাক্তদিগের মুখ অবশ্য মলিন ও অবনত হইয়া পড়িবে সন্দেহ নাই।

যাহাহউক উক্তসম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্ মহাত্মা বাঙ্গালাভাষায় প্রথমে লেখনীচালনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা দেখা আবশ্যক। অনেকে জীবগোস্বামীর করচাকেই বাঙ্গালার আদিগ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াথাকেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার জীবগোস্বামীকে রূপ-সনাতনের * ভ্রাতুস্পুত্র বলিয়া লিখিয়াছেন। জীবগোস্বামী কৃষ্ণবিষয়ক নানা সংস্কৃত গ্রন্থ রচনাকরিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতকার তাঁহার যে সকল গ্রন্থের নাম করিয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহার বাঙ্গালা করচার নামোল্লেখ নাই। আমরাও নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়াও জীবগোস্বামীর করচা প্রাপ্ত হই নাই। বোধহয় তাহা বিরলপ্রচার হইয়াছে। কেহ কেহ কহেন জীবগোস্বামীর বংশীয়েরা এক্ষণে মুর্শীদাবাদের সন্নিহিত কোঙার পাড়া নামক গ্রামে বসতি করেন; তাঁহাদের বাটীতে উহা আছে কি না, বলিতে পারা যায় না। আমাদের কোন বন্ধু 'জীবগোস্বামীর করচা' বলিয়া যে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক আমাদিগকে

* চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে স্পষ্টরূপে উল্লেখ থাকায় আমরা প্রথম সংস্করণে রূপ ও সনাতন গোস্বামীকে গৌড়ের বাদসাহ হোসেনসার মুসলমানমন্ত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে কেহ কেহ প্রতিবাদ করিয়া উহাঁদিগকে ব্রাহ্মণ জাতীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বিশেষ জিজ্ঞাসুগণ ১২৭৯ সালের ৮ই এবং ২২এ আশ্বিনের সোমপ্রকাশ পত্র দেখিলে উভয় পক্ষীয় মতের বলাবল বিবেচনা করিতে পারিবেন।

দিয়াছিলেন, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। তবে অনেকে জীবগোস্বামীর করচাকেই বাঙ্গালার প্রথম রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এই জন্যই আমরা সংক্ষেপে তাহার বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এই পুস্তকে, রূপ বৃন্দাবনে গমন করিলে পর কিরূপে সনাতন স্বপ্রভু হোসেন্‌সার কারাগার হইতে পলায়ন করেন তাহা, এবং বারাণসীতে গৌরাঙ্গের সহিত সনাতনের সাক্ষাৎকার, বৃন্দাবনে রূপের সহিত মিলন, দুই ভ্রাতার গোবর্দ্ধনদর্শন—তথায় নিত্যবস্তু বিষয়ক কথোপকথন—এবং ললিতা বিশাখা রূপমঞ্জরী চম্পকলতা প্রভৃতি কৃষ্ণসহচরীদিগের বয়োনিরূপণাদি অতি সামান্য সামান্য বিষয় বর্ণিত আছে। সে বর্ণনায় গ্রন্থকারের কিছু মাত্র পাণ্ডিত্য প্রকাশ নাই। তবে রচনা কিছু প্রাচীন বলিয়া বোধহয় বটে। বিবিধার্থসংগ্রহলেখকের মতানুসারে উক্ত করচা চৈতন্যের অন্তর্হিত হইবার প্রায় সমকালেই রচিত হইয়াছিল।

জীবগোস্বামীর করচার পরই বোধহয় বৃন্দাবনদাসবিরচিত চৈতন্য-ভাগবত বা চৈতন্যমঙ্গল লিখিত হয়। ইহা ভিন্নও বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেকগুলি গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, সে সমুদয়ের সমালোচনা করা তত আবশ্যক বোধহয় না। আমরা প্রধানতঃ কেবল চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতেরই সমালোচনা করিয়া নিবৃত্ত হইব।

চৈতন্যভাগবত বা চৈতন্যমঙ্গল।

এই গ্রন্থ পরমভাগবত বৃন্দাবনদাসকর্ত্তৃক বিরচিত। বৃন্দাবন নবদ্বীপ-বাসী ছিলেন। তিনি গ্রন্থমধ্যে সামান্যাকারে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন—যথা

সর্ব্বশেষ ভৃত্য তান বৃন্দাবন দাস। অবশেষপাত্র নারায়ণীগর্ভজাত॥ ১ম খ, ৫অ

চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাসকবিরাজ বৃন্দাবন-রচিত চৈতন্যমঙ্গলের বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং উহাকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া

তাঁহার চরিতামৃত লিখিত হইয়াছে, ইহা অনেকস্থলে স্বীকার করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তিনি বৃন্দাবনদাসের পরিচয় প্রদানে যাহা লিখিয়াছেন, তদ্দ্বারা এই জানাযায় যে, চৈতন্যের সহচর ও শিষ্য কুমারহট্টবাসী শ্রীনিবাসপণ্ডিতের নারায়ণীনাম্নী এক কন্যা ছিলেন। পণ্ডিত, বোধহয় কোনকার্য্যবশতঃ নবদ্বীপেই অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার গৃহে চৈতন্যদেবের কীর্ত্তন এবং ভোজন হইলে পর, নারায়ণী তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজনকরিয়া চতুর্ব্বর্ষ বয়ঃক্রম কালেও কৃষ্ণপ্রেমে মগ্না হইতেন; এজন্য চৈতন্যের বড় স্নেহাস্পদ হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস ঐ নারায়ণীর গর্ভজাত। এই বিবরণ দ্বারা ইহা এক প্রকার স্থির হইতেছে যে, বৃন্দাবনদাস চৈতন্যের জীবনকালে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু চৈতন্যের তিরোধানের পর গ্রন্থাদি রচনাকরিয়াছেন। কারণ চৈতন্যের সন্ন্যাসাবলম্বনের সময়ে অর্থাৎ যখন্ তাঁহার বয়স্ ২৪ | ২৫ বৎসর, তখন্ নারায়ণী ৪ বৎসরের ছিলেন—তৎপরে ১২ বৎসরের মধ্যে তাঁহার সন্তান হওয়া এবং বৃন্দাবনকেই প্রথম পুত্র বলিয়া, ধরিয়ালইলেও চৈতন্যের অন্তর্ধানসময়ে বৃন্দাবনের বয়ঃক্রম ১২ বৎসরের অধিক হয়না। তৎকালে গ্রন্থরচনা সম্ভব নহে। অতএব চৈতন্যতিরোধানের ১৫ | ১৬ বৎসর পরে অর্থাৎ অনুমান ১৪৭০ শকে (খৃঃ ১৫৪৮ অব্দে) বৃন্দাবনের গ্রন্থ চৈতন্যমঙ্গল রচিত হইয়া থাকিবে।

চরিতামৃতকার বৃন্দাবনরচিত চৈতন্যমঙ্গলের ভূরি ভূরি প্রশংসা ও ভূয়োভূয়ঃ নামোল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু চৈতন্যভাগবতের বিষয়ে কোন স্থলে কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই—কিন্তু আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, বৃন্দাবনদাসবিরচিত চৈতন্যমঙ্গলনামে কোন গ্রন্থ বিদ্যমান নাই—লোচনদাসবিরচিত এক চৈতন্যমঙ্গল আছে। বৃন্দাবনের চৈতন্যভাগবতভিন্ন আর কোন গ্রন্থ নাই এবং চরিতামৃতকার যে যে বিষয়ের সবিস্তার বর্ণন জানিবার জন্য চৈতন্যমঙ্গলের উপর বরাত দিয়াছেন, তাহা চৈতন্যভাগবতেই বর্ণিত আছে—

অতএব আমাদের বোধহয় চরিতামৃতকারের উল্লিখিত চৈতন্যমঙ্গল চৈতন্যভাগবত ভিন্ন আর কিছুই নহে।

চৈতন্যভাগবত কিছু বৃহৎ পুস্তক। ইহা আদি, মধ্য ও অন্ত্য এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। আদিখণ্ডে চৈতন্যের উৎপত্তি, বাল্যলীলা, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, বিবাহ ও গয়াভূমিতে গমন পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে—মধ্যখণ্ডে চিত্তের ভাবান্তর, অলৌকিক কৃষ্ণপ্রেমাবেশ, নিত্যানন্দ অদ্বৈত শ্রীনিবাস হরিদাস প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত সম্মিলন, সঙ্কীর্ত্তন, ভক্তদিগের নিকট ঐশ্বর্য্য প্রকাশ, পাতকীদিগের উদ্ধার করণ প্রভৃতি বহুবিধ লোকাতিগ কার্য্যের সবিস্তার বর্ণনা আছে। অন্ত্য বা শেষ খণ্ডে সংসারে বীতরাগ হইয়া কাঁটোয়া-(কণ্টক নগর) স্থিত কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বন, শিরোমুণ্ডন, 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামগ্রহণ, নীলাচলে গমন, গৌড়দেশে পুনরাগমন, সর্ব্বত্র সঙ্কীর্ত্তনপ্রচার, শিষ্যসঙ্খ্যাবৃদ্ধি ও পরিশেষে নীলাচলে গিয়া পুনরবস্থান প্রভৃতি অনেক বিষয় লিখিত আছে। কিন্তু কোন স্থানে চৈতন্যের মৃত্যু বর্ণিত হয়নাই—বোধ হয় ভাগবতেরা তাহা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করেন না বলিয়া সে অংশ ত্যাগকরা হইয়াছে।

গ্রন্থকার সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। পুরাণাদি অনেক গ্রন্থ হইতে অনেক বচন মধ্যে মধ্যে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। তিনি বড় গোঁড়া বৈরাগী ছিলেন। নবদ্বীপের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা চৈতন্যকে অবতার বলিয়া মানিতেন না, এজন্য তিনি যেখানে সুযোগ পাইয়াছেন, সেইখানেই তাঁহাদিগের প্রতি কটূক্তি করিয়াছেন। সময়ে সময়ে তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া—

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। তবে নাথি মার তার শিরের উপরে॥

ইত্যাদিরূপে সাধুজনগর্হিত প্রণালী অবলম্বন করিয়াও গালি দিতে ত্রুটি করেন নাই। এমন কি বোধহয় তাঁহার হস্তে যদি কোন রাজশক্তি থাকিত, তাহাহইলে তিনি এক দিনেই চৈতন্যোপাসক ভিন্ন সকল লোকেরই প্রাণসংহার করিতেন। তিনি নিজে যেরূপ উদ্ধত ছিলেন, বর্ণিত

নায়ককেও সময়ে সময়ে সেইরূপ উদ্ধত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি যখন্ গৌরাঙ্গকে সঙ্কীর্ত্তনের প্রতিষেধকারী নবদ্বীপস্থ কাজীর ভবনে উপস্থিত করিয়াছেন, তখন্ গৌরাঙ্গ শিষ্যসমভিব্যাহারে কাজীর বাগান-বাগিচা নষ্ট করিয়া ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়াছেন! পরিশেষে লঙ্কাকাণ্ডের ন্যায় কাজীর গৃহে অগ্নি দিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন! কিন্তু আমরা চৈতন্যকে ওরূপ উদ্ধত বলিয়া জানিতাম না। ধর্ম্মসংস্থাপক দরিদ্র-ব্রাহ্মণের পক্ষে ওরূপ হওয়াও উচিত বোধহয়না। চৈতন্যচরিতামৃতকার অমন স্থলেও গৌরাঙ্গকে তত উদ্ধত বর্ণন করেন নাই।

যাহাহউক, বৃন্দাবনদাসের পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব মন্দ ছিল না। তিনি হাস্য করুণ প্রভৃতি রসের বিলক্ষণ উদ্দীপন করিয়াছেন। কাজীর অনুচরেরা কীর্ত্তন, মূর্চ্ছা ও ক্রন্দনের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যেরূপ কথোপকথন করিয়াছে, তাহাতে বিলক্ষণ পরিহাস-রসিকতা আছে এবং গৃহহইতে বহির্গমনকালে শচীসমীপে গৌরাঙ্গের বিদায়গ্রহণ-সময়ে করুণ-রসের সুন্দর উদ্দীপ্তি হইয়াছে। পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ উহার কিয়দংশ নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম।——

কাজির আদেশে তার অনুচর ধায়। সমৃদ্ধি দেখি আপনার শাস্ত্র গায়॥
রড় দিয়া কাজীরে কহিল ঝাট্ গিয়া। কি কর চলহ ঝাট্ যাই পলাইয়া॥
যে সকল নাগরিয়া মারিল আমরা। আজি কাজি মার বলি আইসে তাহারা॥
এক যে হুঙ্কার করে নিমাই আচার্য্য। সেই সে হিন্দুর ভূত তাহারই সে কার্য্য॥
কেহ বলে বামনা এতেক কান্দে কেন। বামনার দুই চক্ষে নদী বহে যেন॥
কেহ বলে বামনা আছাড় যত খায়। সেই দুঃখে কান্দে হেন সমুঝি সদায়॥
কেহ বলে বামনা দেখিলে লাগে ভয়। গিলিতে আইসে যেন দেখি কম্প হয়॥
১ম খ, ২৩ অ,।

প্রভুর সন্ন্যাস শুনি শচী জগন্মাতা। হেন দুঃখ জন্মিল না জানে আছে কোথা॥
মূর্চ্ছিত হইয়া ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে। নিরবধি ধারা পড়ে না পারে রাখিতে॥
বসিয়াছে মহাপ্রভু কমললোচন। কহিতে লাগিল শচী করিয়া ক্রন্দন॥
না যাইহ আরে বাপ মায়েরে ছাড়িয়া। পাপিনী আছে যে সবে তোর মুখ দেখিয়া॥
কমল নয়ন তোমার শ্রীচন্দ্র বদন। অধর সুরঙ্গ কুন্দ মুকুতা দশন॥

অমিয়া বরিষে যেন সুন্দর বচন। কেমনে বাঁচিব না দেখি গজেন্দ্র গমন॥
অদ্বৈত শ্রীবাসাদি তোমার অনুচর। নিত্যানন্দ আছে তোর প্রাণের দোসর॥
পরম বান্ধব গদাধর আদি সঙ্গে। গৃহে রহি সঙ্কীর্ত্তন কর তুমি রঙ্গে॥
ধর্ম্ম বুঝাইতে বাপ তোর অবতার। জননী ছাড়িবা কোন্ ধর্ম্ম বা বিচার॥
তুমি ধর্ম্মময় যদি জননী ছাড়িবা। কেমতে জগতে তুমি ধর্ম্ম বুঝাইবা॥
প্রেম শোকে কহে শচী শুনে বিশ্বম্ভর। প্রেমেতে রোধিত কণ্ঠ না করে উত্তর॥
(ঐ শেষ অ,)

গ্রন্থকারের ভাবগ্রাহিতারও কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক, তন্নিমিত্ত নিম্নভাগটী উদ্ধৃত হইল—

পক্ষী যেমন আকাশের অন্ত নাহি পায়। যত শক্তি থাকে তত দূর উড়ি যায়॥
এই মত চৈতন্য কথার অন্ত নাই। যার যত শক্তি সবে তত তত গাই॥
(ঐ ঐ)

চৈতন্যভাগবতের ভাষা খুবমিষ্ট নাহউক, বিশদ বটে। গ্রন্থকারের অভিপ্রায় ভাষাদ্বারা সর্ব্বত্রই ব্যক্ত হইয়াছে। তবে প্রাচীনকালের ভাষা, এ জন্য ইহাতে কতক সংস্কৃত, কতক প্রাকৃত, এবং কতক নিতান্ত অপভ্রংশ শব্দও দেখিতেপাওয়াযায়। ক্রিয়াপদও স্থানে স্থানে প্রাচীনরূপ আছে। উদাহরণস্বরূপ ঐরূপ কয়েকটী শব্দ ও ক্রিয়ার উল্লেখ করাযাইতেছে, (সংস্কৃত) কথংকথমপি, বাকোবাক্য, সাঙ্গোপাঙ্গ, কাষায়, (প্রাকৃত) পহুঁ, চন্দ, তান, যহি; (অপভ্রংশ) তছু, মুঞি, যৈছে, কাথি; (ক্রিয়া) কদর্থিবে, বোলে, করিমু, লখিতে ইত্যাদি।

এই গ্রন্থ সমুদায়ই পয়ারে গ্রথিত, কেবল কয়েকটী গীতস্থলে ত্রিপদী আছে। ইহার সময়ে মিত্রাক্ষরতা ও মিতাক্ষরতার নিয়ম সম্যক্ অনুসৃত হয় নাই—নাম=স্থান; অবাক্য=অবাহ্য; প্রভাব=অনুরাগ; যোগ=লোভ; দুগ্ধ=মুদ্গ; বাস=জাত; নহে=লয়ে ইত্যাদি শব্দসকলও মিত্রাক্ষরস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু এই কবির পরবর্ত্তী কবিদিগেরও রচনায় মিতাক্ষরতার যেরূপ ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়, ইহাঁর কিছু নৈসর্গিকী-শক্তি ছিল বলিয়া, ইহাঁর রচনায় সেরূপ ব্যতিক্রম অধিক লক্ষিত হয়না। পূর্ব্বোদাহৃত সন্দর্ভ মধ্যেই ইহার প্রমাণ দৃষ্ট হইবে।

চৈতন্যভাগবত ভিন্ন বৃন্দাবনদাসের আর কোন গ্রন্থ ছিল কিনা, তাহা স্থির বলাযায়না, কিন্তু ঐ গ্রন্থাতিরিক্ত ও কতকগুলি গীত তাঁহার ছিল, তাহা ইতস্ততঃ দৃষ্টহইয়া থাকে। বৃন্দাবনের সময়ে মঙ্গলচণ্ডী ও বিষহরীর গীতের প্রচার ছিল—তিনি মধ্যে মধ্যে তাহার উল্লেখ করিয়া তদুপরি কটু কটাক্ষ করিয়াছেন।

চৈতন্যচরিতামৃত।

চৈতন্যভাগবতের রচনার কিছুকালপরেই কৃষ্ণদাসকবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতনামক গ্রন্থের রচনা করেন। জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী কাঁটোয়ার সন্নিহিত ঝামটপুর নামক গ্রামে কৃষ্ণদাসের বাস ছিল। কৃষ্ণদাস জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। তিনি স্বগ্রন্থের আদিখণ্ডান্তর্গত ৫ম অধ্যায়ে এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন যে, নিত্যানন্দরূপী বলরাম স্বপ্নযোগে তাঁহাকে দর্শনদিয়া বৃন্দাবন যাইতে আদেশ করেন। তদনুসারে তিনি বৃন্দাবন গমনকরিয়া রূপ, সনাতন ও রঘুনাথদাসের আশ্রয় ও শিষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করিতেথাকেন। চরিতামৃতগ্রন্থ বোধহয় ঐস্থানে বসিয়াই রচনাকরিয়া থাকিবেন। কারণ অনেক স্থানে "আইনু বৃন্দাবন" "এই বৃন্দাবন" এইরূপ কথা গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত আছে।

গ্রন্থকার কোন স্থানে নিজের সময়নির্দ্দেশ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার উপরিলিখিতরূপ পরিচয়দানদ্বারাই ইহা এক প্রকার প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তিনি ১৪৯৫ শকের (খৃঃ ১৫৭৩ অব্দের) পর ১০ | ১৫ বৎসরের মধ্যেই এইগ্রন্থ সঙ্কলন করেন। কারণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয়নামক সংস্কৃতনাটক ১৪৯৪ শকে লিখিত হয়। চরিতামৃতে ঐ নাটকের অনেক শ্লোক উদ্ধৃত আছে—সুতরাং ইহা তৎপূর্ব্বসময়ে রচিত হওয়া সম্ভব নহে। না হউক কিন্তু উহার অধিককাল পরে

রচিত, এ কথাও বলা যাইতে পারে না—কারণ তিনি যাঁহাদের শিষ্যতা-বলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই চৈতন্তের সমসাময়িক লোক—চৈতন্তের অন্তর্ধানের পর অধিককাল তাঁহাদের জীবিত থাকা অসম্ভব।

চরিতামৃতও চৈতন্তের সমস্তলীলাসংক্রান্ত পদ্যময় বৃহৎ গ্রন্থ। ইহাও আদি, মধ্য ও অন্ত্য এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। চৈতন্তভাগবতের খণ্ডত্রয়ে যেরূপ বিবরণ বর্ণিত আছে, ইহার খণ্ডত্রয়েও প্রায় সেইরূপ বিবরণ; তবে স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে এই মাত্র। ইনি অনেকবার বলিয়াছেন, বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে যে বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা নাই, তাহারই সবিস্তার বর্ণনা করিবেন। ফলতঃ তাহাই বটে; চরিতামৃতে চৈতন্যের যত দেশভ্রমণের কথা আছে, চৈতন্তভাগবতে তাহা নাই। অনেক ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্যেরও বৈপরীত্য লক্ষিত হয়।

কবি সংস্কৃতে একজন সুপণ্ডিত লোক ছিলেন। প্রতি অধ্যায়েব প্রথমেই কয়েকটী করিয়া স্বরচিত শ্লোক দিয়াছেন। প্রথম কয়েকটী শ্লোকের সংস্কৃতে টীকাও করিয়াছেন। সেই সকল শ্লোক পাঠকরিলে তাঁহার কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়াযায়। তদ্ভিন্ন শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীনগ্রন্থ এবং তাৎকালিক মহাত্মগণের রচিত বিদগ্ধমাধব, হরিভক্তিবিলাস, বিল্বমঙ্গল, লঘুভাগবতামৃত, কৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দানকেলিকৌমুদী, স্তবমালা, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থ হইতে ভূরি ভূরি বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণস্থলে প্রয়োগ করিয়াছেন এবং অনেকস্থলে ঐ সকল শ্লোকের বাঙ্গালাপদ্যে অর্থ করিয়াদিয়াছেন। চৈতন্যের অবতারবিষয়ে কোন পুরাণে বর্ণনা নাই, এজন্য অনেকে চৈতন্যের প্রতি শ্রদ্ধা করেননা, এই দেখিয়া তিনি ভাগবতের কৃষ্ণবিষয়ক কতিপয় শ্লোককে পরম কৌশলসহকারে চৈতন্যবিষয়ক করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

চরিতামৃত বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মসংক্রান্ত গ্রন্থ; অতএব ইহার বৃত্তান্তগুলি যাহাতে সাধারণের বোধগম্য হয়—সত্যবোধে যাহাতে তাহার

প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে, গ্রন্থকার তজ্জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কবিত্ব-শক্তিপ্রকাশের জন্য সেরূপ চেষ্টা করেননাই। তাঁহার রচনা পদ্যময় এইমাত্র—বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারতাদির গ্রন্থকারেরা ধর্ম্মকথার সহিত যেরূপ চমৎকারজনক কবিত্ব প্রখ্যাপনকরিয়াছিলেন, ইনি তাহার কিছুই করেননাই। ইনি কথায় কথায় যদি অত অধিক সংস্কৃতবচন উদ্ধৃত না করিতেন, তাহাহইলে ইহাঁর গ্রন্থ বোধহয় অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হইত। অধিক বচন উদ্ধৃত করায়, পাঠমাত্র গ্রন্থের সমুদয় বৃত্তান্ত স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না। বোধহয় গ্রন্থের পারিপাট্যসম্পাদন করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিলনা—প্রমাণ প্রয়োগদ্বারা চৈতন্যমতকে প্রামাণিক ও তাঁহার নিজগ্রন্থকে শ্রদ্ধাস্পদ করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। যাহাহউক তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। ভাগবতেরা এই গ্রন্থের প্রতি বিলক্ষণ শ্রদ্ধা করেন। অনেকে প্রতিদিন গন্ধপুষ্পদ্বারা ঐ পুস্তক পূজা না করিয়া জলগ্রহণ করেন না।

চরিতামৃতের ভাষা বিশেষ সুশ্রব্য বা সুন্দর নহে। চৈতন্যভাগবতের রচনাতে যেমন কতক শুদ্ধ সংস্কৃত, কতক প্রাকৃত, কতক নিতান্তঅপভ্রংশ শব্দ ও কতক পুরাতন ক্রিয়ার মিশ্রণ লক্ষিত হয়, ইহাতেও তাহাই আছে। অস্র, আরত্রিক, অর্থবাদ, মৃদ্‌ভাজন; বোল, তান, মহান্ত, দোহে; তিহোঁ, ঐছে, মুঞি, কথি; দঢ়াইল, পুছিল, জুয়ায়, করিমু ইত্যাদি উহার প্রমাণ। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসপ্রভৃতির সময়ে সংযুক্তশব্দের বিপ্রকর্ষণ ক্রিয়ার যেরূপ প্রাচুর্য্য ছিল, চরিতামৃতের সময়ে তাহার অনেক হ্রাস হইয়াছিল।

চরিতামৃত প্রায় সমস্তই পয়ারে নিবদ্ধ, কেবল কয়েক স্থানে ত্রিপদী আছে। ছন্দে অক্ষরসাম্যের নিয়মের যতদূর ব্যতিক্রম হইয়াছে, মিত্রাক্ষরতার ততদূর ব্যতিক্রম হয় নাই। পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ নিম্নভাগে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়াগেল—

এইরূপ কর্ণপুর লিখে স্থানে স্থানে। প্রভু কৃপা কৈল যৈছে রূপসনাতনে ॥
মহা প্রভুর যত বড় বড় ভক্ত মাত্র। রূপসনাতন সবার কৃপা গৌরব পাত্র ॥
কেহ যদি দেশ যায় দেখি বৃন্দাবন। তারে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ ॥
কহ তাঁহা কৈছে রহে রূপসনাতন। কৈছে করে বৈরাগ্য কৈছে ভোজন ॥
কৈছে অষ্ট প্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণ ভজন। তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ ॥
অনিকেতন দুহে রহে যত বৃক্ষগণ। একৈক বৃক্ষের তলে একৈক রাত্রিশয়ন ॥
করোয়া মাত্র হাতে কাঁথা ছিঁড়া বহির্বাস। কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম নর্ত্তন উল্লাস ॥

(ম, খ, ১৯ অ,)

চরিতামৃতের আদ্যন্তই এইরূপ বাঁকাভাবায় লিখিত নহে—অনেকস্থলে বেশ সরলভাষা আছে। অতএব অনুমান হয় গ্রন্থকার, স্বাধিষ্ঠানবৃন্দাবনের অনেককথাও গ্রন্থমধ্যে নিবেশিত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসরচিত ‘অদ্বৈতসূত্র-করচা’ ‘স্বরূপবর্ণন’ প্রভৃতি নামে আরও কয়েকখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আমরা দেখিয়াছি, তাহাতেও চৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায়——

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।——কহে কৃষ্ণদাস ॥

এইরূপ ভণিতি আছে। সে সকলগ্রন্থও এইরূপ গৌরাঙ্গ-সংক্রান্ত, অতএব তাহাদের আর পৃথক্ সমালোচনার প্রয়োজন নাই।

কৃত্তিবাস—রামায়ণ।

বৈষ্ণবসাম্প্রদায়িক বাঙ্গালাগ্রন্থসকলের অব্যবহিত পর হইতেই ক্রমে ক্রমে কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, ক্ষেমানন্দ. কাশীরাম, রামেশ্বর, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিগণ রামায়ণ, চণ্ডী, মনসার ভাসান, মহাভারত, শিবসঙ্কীর্ত্তন, কবিরঞ্জন প্রভৃতি কাব্যসকলের প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণের কথাই অগ্রে বলিতে হইতেছে।

কৃত্তিবাস কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, বা কোন্ সময়ে

কাব্যরচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সপ্তকাণ্ড রামায়ণের মধ্যে কোন স্থানে তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। তাঁহার গ্রন্থ প্রসিদ্ধ প্রাচীনতম পুরাণের উপাখ্যান—সুতরাং গ্রন্থবর্ণিত বিষয়ের রীতি নীতি প্রভৃতি সন্দর্শনকরিয়া সময়ের অনুমান করিবারও উপায় নাই। গঙ্গাবতরণস্থলে তিনি মেড়তলা, নবদ্বীপ, সপ্তগ্রাম, আকনামাহেশ প্রভৃতি মূলরামায়ণে অনুল্লিখিত কয়েকটী গ্রামের নামোল্লেখ করিয়াছেন; তন্মধ্যে সপ্তদ্বীপের সারস্থান বলিয়া নবদ্বীপের প্রশংসা করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের উৎপত্তিস্থান এবং স্মার্ত্ত ও নৈয়ায়িকদিগের সমাজ স্থান বলিয়া উহার ঐরূপ প্রশংসা করা অসম্ভব বোধহয়না। ফলকথা কৃত্তিবাস চৈতন্য-দেবের পরসাময়িক বলিয়াই বিবেচিত।

গ্রন্থের ভাবাদৃষ্টে অনেকস্থলে সময় অনুমিত হইয়াথাকে, কিন্তু প্রকৃতবিষয়ে তাহা করিবারও কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হইয়াছে। কারণ এক্ষণে যে সকল মুদ্রিত রামায়ণ দেখিতে পাওয়াযায়, কেহ কেহ বলেন, তাহা কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পূর্ব্বতন সাহিত্যাধ্যাপক ৺ জয়গোপাল তর্কালঙ্কারমহাশয়কর্তৃক সংশোধিত; সুতরাং উহা কৃত্তিবাসের প্রকৃতরচনা হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। অতএব তদ্দৃষ্টে কোন সিদ্ধান্তকরা সঙ্গত হয়না। প্রাচীন হস্তলিখিত রামায়ণ অতীব দুষ্প্রাপ্য। আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের একখানি পুস্তক পাইয়াছি। উহা সন ১০৯৯ সালে লিখিত অর্থাৎ প্রায় ২০০ বৎসরের পুস্তক। উহার এবং মুদ্রিতরামায়ণের ভাষা, ছন্দ ও আনুপূর্ব্বী বিষয়ে অনেক বৈলক্ষণ্য দেখাযায়। নিম্নভাগে উভয় পুস্তকেরই কিয়-দংশ উদ্ধৃত হইল।

বালিবধে তারার উক্তি।

তারা বলে রাম তব জন্ম রঘুকুলে। আমার স্বামীকে কেন বিনাশিলে ছলে॥
সম্মুখে মারিতে যদি দেখিতে প্রতাপ। লুকাইয়া মারিলে পাইলাম বড় তাপ॥
শ্রীরাম তোমারে সবে বলে দয়াবান্। ভাল দেখাইলে আজি তাহার প্রমাণ॥

একবারে আমার করিতে সর্ব্বনাশ। সুগ্রীবের প্রতি দয়া করিলে প্রকাশ॥
বিচ্ছেদ যাতনা যত জানহ আপনি। তবে কেন আমারে হে দিলে রঘুমণি॥
প্রভু শাপ নাহি দিলেন সদয়হৃদয়। আমি শাপ দিব তাহা ফলিবে নিশ্চয়॥
সীতা উদ্ধারিবে রাম আপন বিক্রমে। সীতারে আনিবে বটে বহু পরিশ্রমে॥
কিন্তু সীতা না রহিবে সদা তব পাশ। কিছুদিন থাকিয়া করিবে স্বর্গবাস॥
কান্দাইলে যেমন এ কিষ্কিন্ধ্যা নগরী। কান্দাইয়া তোমারে যাইবে স্বর্গপুরী॥
আমি যদি সতী হই ভারতভিতরে। কান্দিবে সীতার হেতু কে খণ্ডিতে পারে॥

কলিকাতা মুদ্রিত রামায়ণ।

তারা বলে রাম তুমি জন্মিলা উত্তমকুলে। আমার পতি কাটিলে তুমি পাইয়া কোন্ ছলে॥
দেখাদেখি যুঝিতে যদি বুঝিতে প্রতাপ। আদেখা মারিলে প্রভু বড় পাইনু তাপ॥
প্রভু মোর শাপ না দিলেন করুণ হৃদয়। মুঞি শাপ দিব যেন হয় ত নিশ্চয়॥
সীতা উদ্ধারিবে তুমি আপন বিক্রমে। সীতা ঘরে আসিবেন অনেক পরিশ্রমে॥
সীতা লইয়া ঘর করিবে হেন মনে আশ। কতো দিন রহি সীতা ছাড়িবে তোমার পাশ॥
তুমি যেমন কাঁদাইলে বানরের নারী। তোমা কাঁদাইয়া সীতা যাবেন পাতালপুরী॥

প্রাচীন হস্তলিখিত রামায়ণ।

এই সকল সন্দর্শন করিয়া স্পষ্টই বুঝিতেপারাযায় যে, জয়গোপাল-তর্কলঙ্কারমহাশয়দ্বারাই হউক বা যাঁহাদ্বারাই হউক, মুদ্রিতরামায়ণ মূল কৃত্তিবাসীরামায়ণ হইতে অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। উপরিউদ্ধৃত অংশে দৃষ্টহইবে যে, কৃত্তিবাস ছন্দের অক্ষর-গণনার প্রতি তাদৃশ মনোযোগ করেননাই; তাঁহার গ্রন্থ সঙ্গীত হইবে, এই অভিপ্রায়ে গানের সুর মিলাইতে যেখানে যত অক্ষর দেওয়া আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন, তিনি তাহাই দিয়াছিলেন। মুদ্রিত রাময়ণ বিশুদ্ধ পয়ারের রীতিতে অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে কোন অংশ পরিত্যক্ত, কোন অংশ বা নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। ফলতঃ কেবল মুদ্রিত রাময়ণ দর্শনকরিয়া কৃত্তিবাসের রচনার সমালোচনকরা কোন মতেই সঙ্গত হয় না—কিন্তু পূর্ব্বেই বলাহইয়াছে যে, প্রাচীন হস্তলিখিত রামায়ণ সমগ্ররূপে পাওয়া যায় না, সুতরাং আমাদিগকেও অধিকাংশস্থলেই মুদ্রিতরামায়ণের উপরেই

নির্ভর করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ হানি নাই, যেহেতু উভয়ের মাংসযোজনাবিষয়ে বৈলক্ষণ্য থাকিলেও অস্থিভাগের কিছুমাত্র পরিবর্ত্ত হয় নাই। কবিত্ব সেই অস্থিগত।

মুদ্রিত রামায়ণের ভাষা ও ছন্দের অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধতাদর্শনে আমাদের এক প্রকার স্থির বোধহইয়াছিল যে, কৃত্তিবাস কবিকঙ্কণের পরসময়বর্ত্তী লোক। কিন্তু প্রায় ২০০ বৎসরের প্রাচীন পূর্ব্বোক্ত-পুস্তকখানি দেখিতে পাইয়া সে বোধ অপগত হইয়াছে এবং কৃত্তি-বাসকে অবশ্যই মুকুন্দরাম অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিতে ইচ্ছা জন্মিয়াছে। সকলে তাহাই বলিয়াও থাকেন। কিন্তু মুকুন্দরামের কত দিন পূর্ব্বে কৃত্তিবাস প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সে কথা কেহই স্থির বলিতে পারেন না। বলিবার কোন উপায়ও নাই। যাহাহউক অনেকে অনুমান করেন যে, চণ্ডীরচনার ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। যদি এ অনুমান স্থির হয়, তবে মোটামুটি এই বলাযাইতে পারে যে, ১৪৬০ শকে [১৫৩৮ খৃঃঅব্দে] রামায়ণের রচনা হয়। যেহেতু চণ্ডী-কাব্যের সময়নিরূপণকালে সপ্রমাণ করাযাইবে যে, উহা ১৪৯৯ শকে [১৫৭৭ খৃঃঅব্দে] রচিত হইতে আরব্ধ হইয়াছিল।

কৃত্তিবাসের সময়নিরূপণ করা যেরূপ দুষ্কর, তাঁহার জীবনবৃত্ত স্থির করাও সেইপ দুষ্কর। তাঁহার রচিত গ্রন্থমধ্যে এই কয়েকটী কবিতা আছে——

স্থানের প্রধান সেই ফুলিয়ায় নিবাস। রামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিলাষ॥ (অরণ্যকাণ্ড)
কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতী। যার কণ্ঠে সদা কেলি করেন ভারতী॥ (কিষ্কিন্ধ্যা)
কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিদিত সর্ব্বলোকে। পুরাণ শুনিয়া গীত গাইল কৌতুকে॥ (আরণ্য)
গীত রামায়ণ, করিল রচন, ভাষাকবি কৃত্তিবাস॥ (কিষ্কিন্ধ্যা)

এই গুলি পাঠ করিয়া জানিতে পারাযায় যে, কৃত্তিবাস নদিয়া জেলার অন্তর্গত ফুলিয়া নামক প্রসিদ্ধগ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহ বা মাতামহের নাম মুরারি ওঝা ছিল।

এক্ষণে বিষবৈদ্য ও ডাইন্ পিশাচাবিষ্টদিগের চিকিৎসকদিগকে ওঝা বলিয়াথাকে—কিন্তু মুরারি ওঝা বোধহয় সেরূপ ছিলেন না। কারণ পূর্ব্বে শাস্ত্রব্যবসায়ী অনেক ব্রাহ্মণের ওঝা উপাধি ছিল। ওঝাশব্দ সংস্কৃত উপাধ্যায়শব্দের অপভ্রংশে জন্মিয়াছে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে সাঁইওঝা দনাইওঝা প্রভৃতির বিবরণে ঐ কথাই সপ্রমাণ হইয়াথাকে। এক্ষণেও দিনাজপুর মুর্শীদাবাদ প্রভৃতি অনেকস্থানে ওঝা উপাধি-বিশিষ্ট অনেক ব্রাহ্মণ আছেন। ঘটকদিগের মিশ্রগ্রন্থে অনেক কুলীন সন্তানেরও 'ওঝা' উপাধি দৃষ্ট হয়।

কৃত্তিবাস স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, আমি পুরাণ শুনিয়া গ্রন্থ রচনা করিলাম এবং তিনি 'ভাষাকবি' বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন। এতাবতা অনেকে অনুমান করেন যে, কৃত্তিবাস সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন না। এ অনুমান অমূলক বলিয়া বোধহয়না। অসংস্কৃতজ্ঞ লোকেরাও যে, পাঁচজন ভাল লোকের নিকট জানিয়া শুনিয়া বিচিত্রশব্দবিন্যাসসমন্বিত গ্রন্থাদি রচনা করিতে পারেন, তাহা দাশরথিরায় ও ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি কবিগণ বিলক্ষণ সপ্রমাণ করিয়াছেন। ঐ দুই কবি সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন না, ইহা এক্ষণকার অনেকেই জানেন; কিন্তু উহাঁদের রচনা, দেখিয়া বিবেচনা করিতে গেলে কেহই উহাঁদিগকে অসংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া বোধ করিতে পারিবেন না। কৃত্তিবাসের স্বমুখে পরিচয়দানব্যতিরিক্ত তাঁহার অসংস্কৃতজ্ঞতাবিষয়ে এই এক প্রধান প্রমাণ পাওয়াযায় যে, তাঁহার গ্রন্থের সহিত বাল্মীকিরচিত মূলরামায়ণের অনেক অনৈক্য; অথচ তিনি যে, বাল্মীকিকে অবলম্ব না করিয়া অন্যকোন রামায়ণ অবলম্ব করিয়াছিলেন, তাহাও বোধহয়না; যেহেতু তিনি কথায় কথায় বাল্মীকিরই বন্দনা করিয়াছেন। কোন কোন কবি একটা কিছু মূল অবলম্বন করিয়া তাহাতে নিজনৈসর্গিক কবিত্বসম্ভূত নূতন অংশ সংযোজিত করিয়া উপাখ্যানভাগের বৈচিত্র্যসম্পাদন করেন সত্য বটে, কিন্তু প্রকৃতস্থলে তাহা হয় নাই। যেহেতু বাল্মীকির মত লিখিতে আরম্ভ

করিলাম, বলিয়া কবি যে স্থলে স্বয়ং প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সেই স্থলেই তিনি বাল্মীকির মত কিছুমাত্র না লিখিয়া অন্যরূপ লিখিয়াছেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার সংস্কৃতানভিজ্ঞতাবিষয়ে কোন সংশয়ই থাকে না। ভাষারামায়ণের ভূরি ভূরি স্থলে এই বিসম্বাদ দেখিতে পাওয়াযায়— বাহুল্যভয়ে তৎসমস্তের উল্লেখ না করিয়া উদাহরণস্বরূপ কয়েকটী মাত্র প্রদর্শিত হইতেছে।

১মতঃ—কৃত্তিবাস, বাল্মীকির মত বলিয়া ভূয়োভূয়ঃ লিখিয়াছেন——

" রাম না জন্মিতে ষাটি হাজার বৎসর। অনাগত বাল্মীকি রচিল কবিবর॥ ইত্যাদি।

বোধহয় তাঁহারই এইরূপ লেখাতে দেশমধ্যে "রাম না হতে রামায়ণ" এই কথার উৎপত্তি হইয়াথাকিবে। কিন্তু বাল্মীকি, স্বরচিতগ্রন্থের কোনস্থলে এমন কথা লেখেন নাই; বরং মূল রামায়ণে একপ্রকার স্পষ্টাক্ষরেই লেখা আছে যে, রামচন্দ্রের রাজ্যপ্রাপ্তির পর কবি এই গ্রন্থ রচনা করেন। এ বিষয়ে বিচার করিতে হইলে মূলরামায়ণের প্রতি একবার দৃষ্টিপাতকরা আবশ্যক। তাহার প্রারম্ভে এইরূপ আছে যথা—

তপঃস্বাধ্যায়নিরতং তপস্বী বাগ্বিদাম্বরং। নারদং পরিপপ্রচ্ছ বাল্মীকি র্মুনিপুঙ্গবং॥
কোঽন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্য্যবান্। ইত্যাদি

"তপস্বী বাল্মীকি, বেদাধ্যয়ননিরত বাগ্মী মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বর্ত্তমানকালে এই ভূমণ্ডলে কোন্ ব্যক্তি গুণবান্ বীর্য্যশালী (ইত্যাদি) আছেন" ইত্যাদি। নারদ এই প্রশ্ন শ্রবণকরিয়া কহিয়াছেন মুনে! এরূপ গুণসম্পন্ন লোক সংসারে অতি দুর্লভ; তথাপি সেরূপ যিনি আছেন, তাঁহার বিষয় শ্রবণ কর। এই বলিয়াই কহিয়াছেন—

ইক্ষাকুবংশপ্রভবো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ। ইত্যাদি
ত মেবংগুণসম্পন্নং (রামং) রাজা দশরথঃ সুতং। যৌবরাজ্যেন সংযোক্তুমৈচ্ছৎ প্রীত্যা মহীপতিঃ॥
তস্যাভিষেকসম্ভারান্ দৃষ্ট্বা ভার্য্যাঽথ কেকয়ী। পূর্ব্বং দত্তবরা দেবী বর মেন মযাচত॥

"ইক্ষাকুবংশসম্ভূত রাম নামে বিখ্যাত রাজা আছেন" অনন্তর নারদ

রামের ভূরি২ প্রশংসা করিয়া পরে কহিয়াছেন "এইরূপ গুণসম্পন্ন পুত্র রামকে রাজা দশরথ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে দত্তবরা তাঁহার ভার্য্যা কেকয়ী সেই অভিষেকসামগ্রী সন্দর্শন করিয়া রাজার নিকট পূর্ব্বদত্ত সেই বর প্রার্থনাকরিলেন" ইত্যাদিরূপে রাবণবধ ও রামের রাজ্যপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত রামায়ণের সমুদয় সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'ঐচ্ছৎ' 'অযাচত' এইরূপ অতীতকালের ক্রিয়াপদপ্রয়োগদ্বারাই বর্ণনাকরিয়াছেন; কেবল রামের রাজ্যপ্রাপ্তির উত্তরকালীন কার্য্যসকল যথা—

'ন পুত্রমরণং কেচিদ্‌দ্রক্ষ্যন্তি পুরুষাঃ কচিৎ। নার্য্য শ্চাবিধবা নিত্যং ভবিষ্যন্তি পতিব্রতাঃ॥"
'দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানিচ। রামো রাজ্য মুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রয়াস্যতি॥'

"রামরাজ্যকালে কেহ কখন পুত্রের মরণ দেখিবেনা—নারীগণ কখন বিধবা হইবে না—রাম ১১ হাজার বৎসর রাজ্য করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন"—ইত্যাদি 'দ্রক্ষ্যন্তি' 'ভবিষ্যন্তি' 'প্রয়াস্যতি এইরূপ ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়া প্রয়োগ দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল দর্শন করিয়া রামায়ণতিলক নামক টীকার রচয়িতা বালকাণ্ডের ১ম সর্গের ৯০ তম শ্লোকের টীকায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন —

অনেন রাবণবধানন্তরং রামে রাজ্যং প্রশাসতি বাল্মীকে র্নারদং প্রতি প্রশ্ন ইতি জ্ঞায়তে।

"ইহা দ্বারা রাবণবধের পর রামের রাজ্যকালে বাল্মীকি নারদের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ইহা জানা যাইতেছে"। যাহাহউক এবিষয়ের আর বাহুল্য না করিয়া এই এককথা বলিলেই হইবে যে, কৃত্তিবাস বাল্মীকির মত বলিয়া "রাম জন্মিবার ষাটি হাজার বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ" এই কথা যে লিখিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক বাল্মীকির মত নহে। কবির মূল রামায়ণে দৃষ্টি থাকিলে এরূপ ভ্রম হইত না। ফলতঃ রামায়ণের এইরূপ ভবিষ্যত্তাকথন বাল্মীকীয়ে, অধ্যাত্মরামায়ণে বা অদ্ভুতরামায়ণে কোথাও নাই; কেবল পদ্মপুরাণান্তর্গত পাতাল খণ্ডের ৮৪ তম অধ্যায়ে শুকশারিকার উক্তিতে লিখিত আছে।

২ য়তঃ—লঙ্কাকাণ্ডে রাবণবধপ্রসঙ্গে কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—ব্রহ্মা রাবণকে অন্যান্য বর দিয়া শেষে কহিয়াছেন—

মর্ম্মে যবে ব্রহ্মঅস্ত্র পশিবে তোমার। তখনি রাবণ তুমি হইবে সংহার॥
অন্য অস্ত্র না হইবে প্রবিষ্ট শরীরে। তোমার যে মৃত্যু অস্ত্র রবে তব ঘরে॥
সৃজিত করেছি আমি সেই ব্রহ্ম বাণ। ধর ধর দশানন রাখ তব স্থান॥
বর পেয়ে অস্ত্র পেয়ে তুষ্ট দশানন। স্বস্থানে রাবণ গেল বাল্মীকেতে কন॥ ইত্যাদি।

ঐ প্রসঙ্গেই আবার—

পুরাণ অনেক মত কে পারে কহিতে। বিস্তারিয়া কহি শুন বাল্মীকের মতে॥
বিভীষণ কহিলেন রামের গোচরে। রাবণের মৃত্যুবাণ রাবণের ঘরে॥

ইত্যাদিউক্তির পর বিভীষণের উপদেশে ছলনাপূর্ব্বক মন্দোদরীর নিকট হইতে হনূমান্ কর্ত্তৃক মৃত্যুশর আনয়ন ও সেই শরদ্বারা রাবণবধ বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু মূল বাল্মীকি রামায়ণে একথার কিছু মাত্র উল্লেখ নাই। তাহাতে এইমাত্র লিখিত আছে যে, ইন্দ্রসারথি মাতলির উপদেশে রাম ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া রাবণের বধসম্পাদন করেন।

৩য়তঃ—হতাহত বানর সৈন্যের সজীবতাসম্পাদনার্থ হিমালয় পর্ব্বত হইতে হনূমান্ দ্বারা ঔষধ আনয়ন করাইবার প্রস্তাবে কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—

নাহিক এসব কথা বাল্মীকিরচনে। বিস্তারিত লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে॥

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, অদ্ভুতরামায়ণের কোনস্থলে এই ঔষধানয়নের বিন্দুবিসর্গের উল্লেখ নাই! এদিকে বাল্মীকিরামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের ৭৪৩ তম সর্গে ইহার সবিস্তরবর্ণন আছে।

এতদ্ভিন্ন ইন্দ্রজিৎবধের পর মহীরাবণ ও অহিরাবণবধবৃত্তান্ত, গন্ধমাদন পর্ব্বত আনয়নসময়ে হনূমানের সূর্য্যানয়ন, মৃত্যুশয্যায় শয়ান রাবণের রামসমীপে রাজনীতি উপদেশ, সমুদ্রের সেতুভঙ্গ, ভূমিলিখিত রাবণের প্রতিকৃতির উপর সীতার শয়ন, কুশের অগ্রজত্ব না হইয়া লবের

অগ্রজত্ব ইত্যাদি কৃত্তিবাসলিখিত ভূরিভূরি বিবরণ মূল বাল্মীকিরামায়ণের সহিত বিসম্বাদী। অতএব বোধহয়, কথকের মুখে রামায়ণ শ্রবণকরিয়া কবি এই গ্রন্থের রচনা করিয়া থাকিবেন। "পুরাণ শুনিয়া গীত রচিল কৌতুকে।" তাঁহার নিজের এই লেখাদ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন হয়। কথকেরা উপাখ্যানভাগের বৈচিত্র্যসম্পাদনার্থ নানাপুরাণের বিবরণ একত্র সম্বদ্ধ করিয়াথাকেন। ইহাঁর গ্রন্থের আদিকাণ্ডের প্রথমভাগে কালিদাসের রঘুবংশবর্ণিত অথবা পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডবর্ণিত উপাখ্যানের অধিকাংশই সংগৃহীত হইয়াছে। তদতিরিক্ত তাঁহার বর্ণিত উপাখ্যানগুলি যে, অমূলক অর্থাৎ কোন না কোন রামায়ণে নাই, একথা সাহস করিয়া বলিতেপারাযায়না। রামের চরিত্রটী এমনই মধুর যে, পুরাণকর্ত্তাদিগের মধ্যে প্রায় কেহই উহা ত্যাগ করিতে পারেন নাই—সকলেই কোন না কোন প্রসঙ্গে রামচরিতটী বর্ণনকরিয়াছেন এবং তত্তৎস্থলে কেহ কেহ উপাখ্যানাংশে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নূতনতাযোগ করিয়াছেন। ভবভূতি, জয়দেব, মুরারি প্রভৃতি সংস্কৃতনাটককারেরাও ঐরূপ করিতে ত্রুটি করেন নাই। যাহাহউক পুরাণ ও উপপুরাণের সঙ্খ্যা অনেক; তৎসমস্ত পাঠকরিয়া ভাষা রামায়ণের বাল্মীকিবিরুদ্ধ কোন্ কোন্ অংশের সহিত কোন্ কোন্ পুরাণের একতা আছে, তাহা প্রদর্শন করা কঠিন। এমন কি, সকলপুস্তকই সংগৃহীত হয় না। এই প্রসঙ্গে আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও বাল্মীকিরামায়ণ, ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণান্তর্গত অধ্যাত্ম রামায়ণ, অদ্ভুতরামায়ণ, ভারতান্তর্গত ও পদ্ম-পুরাণান্তর্গত রামোপাখ্যান এই কয়েকখানি ভিন্ন রামচরিতবিষয়ক আর কোন গ্রন্থই দেখিতে পাইনাই।

যাহাহউক এস্থলে আর একটী কৌতুককর কথা উপস্থিত হইতেছে। আমাদের একটী গল্প শুনা আছে যে, একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ সঙ্কল্প করিয়া আপন ভবনে রামায়ণ পাঠকরেন এবং পাঠান্তে নিতান্তক্ষুণ্ণমনে ঐ কার্য্য-করণজন্য পাতকের প্রতীকারার্থ রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত করেন! ইহাতে

লোকে বিস্মিত হইয়া কারণজিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহেন "আমি গঙ্গাজল ও তুলসী হস্তে লইয়া 'তপঃস্বাধ্যায়নিরতং' ইত্যাদি 'তদ্ব্রহ্মা-প্যন্বমন্যত' ইত্যন্ত মহর্ষিবাল্মীকিপ্রোক্ত সমস্তরামায়ণ পাঠকরিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম—কিন্তু পাঠক ও ধারকের সমুদয়ে তিন খানি পুস্তক ছিল—ঐ তিন পুস্তকের স্থানে স্থানে পাঠের যেরূপ ন্যূনাধিক্য ও বিপর্য্যয় তাহাতে বোধ হইয়াছে যে, যদি আরও ২।৩ খান পুস্তক সংগ্রহকরিতাম, তাহাদেরও পাঠের ঐ রূপ অনৈক্য হইত। ঐ সকল পাঠের মধ্যে কোন্ পাঠ প্রকৃত, তাহার কিছুই বুঝিবার যো নাই—হয় ত আমাদের সংগৃহীত তিন পুস্তকেই বাল্মীকিরচিত প্রকৃতপাঠের অনেক ন্যূনতা আছে—তাহা হইলে আমি যে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম তাহার ভঙ্গ হইয়াছে, সুতরাং তৎপ্রতীকারার্থ প্রায়শ্চিত্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য।" ফলতঃ রামায়ণের পাঠসকল বড়ই বিপর্য্যস্ত হইয়াছে—কিন্তু আমরা আশ্চর্য্য দেখিতেছি যে, "কারণগুণাঃ কার্য্যগুণ মারভন্তে" এই ন্যায়ে ভাষারামায়ণেও কি ঐ বিপর্য্যাস উপস্থিত হইবে! আমরা এই কার্য্যপ্রসঙ্গে কয়েকখানি ভাষারামায়ণ সংগ্রহকরিয়াছি, তাহার একখানি খৃঃ ১৮৩৩ অব্দে শ্রীরামপুরে দ্বিতীয়বারমুদ্রিত ও অপরগুলি ভিন্নভিন্ন সময়ে কলিকাতায় মুদ্রিত। এই সকল পুস্তকের পাঠও স্থানে স্থানে কিছুমাত্র মেলে না!—বিশেষতঃ লঙ্কাকাণ্ডে রাবণবধপ্রসঙ্গে ঐ সকল পুস্তকের পাঠ একবারে সম্পূর্ণরূপ বিভিন্ন। এমন কি শ্রীরামের ভগবতীপূজা ও রাবণের মৃত্যুবাণ আনয়ন প্রভৃতির প্রস্তাব শ্রীরামপুর-মুদ্রিত পুস্তকে কিছুমাত্র নাই। উত্তরকাণ্ডেও সীতাবনবাসকালে শ্রীরামপুরমুদ্রিত পুস্তক অপেক্ষা কলিকাতামুদ্রিত পুস্তকসকলে অনেক অধিক আছে। কলিকাতামুদ্রিত পুস্তক সকলের পাঠগুলি পরস্পর অধিক বিভিন্ন নহে। কিন্তু উহাদের সহিত শ্রীরামপুরমুদ্রিতের পাঠ-সকল অনেকস্থানেই যারপরনাই বিসম্বাদী।

ইহার কারণ কি? সংস্কৃতরামায়ণের ভাষা অতি সহজ, এজন্য

অনেকে স্বরচিত ২। ৪টী শ্লোক উহার মধ্যে মধ্যে প্রবেশিত করিয়া দিয়াছেন—সেই কারণেই রামায়ণের অনেকস্থলেই পাঠব্যতিক্রম হইয়াছে, এই কথা এক্ষণে অনেকে বলিয়াথাকেন। ভাষারামায়ণের পাঠব্যতিক্রমকারণেও কি ঐরূপ কথা বলিতেপারাযায়? আমাদের বোধে ভাষারামায়ণের পাঠব্যতিক্রমের কারণ উহা নহে। কেহ কেহ যে বলিয়াথাকেন ' এক্ষণকার মুদ্রিত রামায়ণসকল ৺ জয়গোপালতর্কালঙ্কার মহাশয়ের সংশোধিত '—তাহাতে আমাদের বোধহয় উহা কেবল তাঁহারই সংশোধিত নহে, ভিন্নভিন্ন সংস্করণ ভিন্নভিন্ন লোকের সংশোধিত। সংশোধকেরা আপনাদিগের ইচ্ছা ও ক্ষমতানুসারে সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়াছেন —এবং সেই জন্যই এই প্রকার নানারূপ পাঠভেদ হইয়াছে। ফলতঃ আমাদের বিবেচনায় মুদ্রিতরামায়ণ সমস্তই কাহারও না কাহারও সংশোধিত—উহার একখানিও কৃত্তিবাসের প্রকৃত নহে। কিন্তু দেখাযাইতেছে, কলিকাতামুদ্রিত পুস্তক সকলের পাঠ প্রায় একরূপই, কেবল শ্রীরামপুরমুদ্রিত পুস্তকের পাঠই অনেক বিভিন্ন। অতএব এই সিদ্ধান্ত করাযাইতেপারে যে, শ্রীরামপুরমুদ্রিত পুস্তকই পণ্ডিতপ্রবর তর্কালঙ্কারমহাশয়ের সংশোধিত। এই পুস্তকের পাঠে ছন্দোভঙ্গাদি দোষ তত নাই; রাবণবধস্থলে বাল্মীকির মতই অনুসৃত হইয়াছে; এবং কৃত্তিবাস যে যে স্থলে অন্যান্য রামায়ণের মত লিখিত হইল, বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, অথচ তত্তৎরামায়ণে সেরূপ প্রসঙ্গ নাই—সেই সেই স্থল সাবধানতাপূর্ব্বক পরিত্যক্ত বা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সকল বিবেচনাকরিয়া বিপরীতঅনুমানকরা সঙ্গত বোধহয়না। যাহাহউক একথা অবশ্য বলাযাইতেপারে যে, উক্তরূপ সংশোধনদ্বারা আসল নকল সমুদয় মিশিয়াগিয়াছে, উভয়কে পৃথক্ করা কঠিন দাঁড়াইয়াছে এবং কালক্রমে ঐ নকলই থাকিবে—আসল একবারে লুপ্ত হইবে। অতএব ঐ সংশোধনদ্বারা গ্রন্থের গৌরবের হ্রাস বৈ বৃদ্ধি হয় নাই।

যাহাই হউক—কৃত্তিবাস সংস্কৃত জানুন বা নাই জানুন—মূলরামায়ণের

সহিত তাঁহার রচনার ঐক্য থাকুক বা নাই থাকুক—তাঁহার রচিত সপ্তকাণ্ডরামায়ণ বহুলনীতিগর্ভ প্রস্তাবে পরিপূর্ণ ও অসাধারণ কবিত্বের প্রকাশক, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। তিনি লোকের মুখে পুরাণ শুনিয়াই যদি এতাবৎ বৃহদ্ব্যাপার সম্পাদন করিয়াথাকেন, তাহাতে তাঁহার গৌরবের বৃদ্ধি বৈ হ্রাস নাই। তিনি যৎকালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তৎকালে এরূপ ছন্দোবদ্ধ কাব্য অধিক ছিলনা। সুতরাং তিনি অন্যের অনুকৃতি অধিক করিতে পান নাই ;—তাঁহার রচনা নিজ-নৈসর্গিকশক্তিসম্ভূত। ভারতচন্দ্র ইদানীন্তনকালে মালিনীর বেসাতি পরিচয়দানস্থলে যেরূপ শব্দচাতুর্য্য প্রকাশকরিয়াছেন, কৃত্তিবাস তত প্রাচীনসময়েও মধ্যে মধ্যে সেরূপ করিয়া গিয়াছেন। ভরদ্বাজাশ্রমে বানরদিগের ভোজনসময়ে তিনি লিখিয়াছেন—

অন্নের কি কব কথা কোমল মধুর। খাইলে মনেতে হয় কি রস মধুর ॥
কি মনোরঞ্জন সে ব্যঞ্জন নানাবিধ। চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় ভক্ষ্য চতুর্বিধ ॥
যথেষ্ট মিষ্টান্ন সে প্রচুর মতিচুর। যাহা নিরখিবামাত্র হয় মতিচুর ॥
নিখুঁতি নিখুঁতি মণ্ডা আর রসকরা। দৃষ্টিমাত্র মনোহরা দিব্য মনোহরা ॥ ইত্যাদি

অঙ্গদরায়বারেও তিনি সামান্য পরিহাসরসিকতা প্রকাশকরেন নাই। অঙ্গদ রাবণসভায় উপস্থিত হইলে তাহাকে অপ্রতিভ করিবার জন্য রাক্ষসীমায়ায় সভাশুদ্ধ সমস্ত লোকই রাবণরূপ ধারণ করিল, কেবল ইন্দ্রজিৎ পিতৃরূপ ধারণকরা অনুচিত, বিবেচনাকরিয়া নিজরূপেই রহিলেন, ইহা দেখিয়া অঙ্গদ ক্রোধ ও পরিহাসসহকারে তাঁহাকেই সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

অঙ্গদ বলে সত্যকরে কওরে ইন্দ্রজিতা। এই যত বসে আছে সবাই কি তোর পিতা ॥
ধন্য রাণী মন্দোদরী ধন্য তোর মাকে। এক যুবতী এত পতি ভাব কেমনে রাখে ॥
কোন্ বাপ তোর চেড়ীর অন্ন খাইল পাতালে। কোন্ বাপ বাঁধাছিল অর্জ্জুনের অশ্বশালে ॥
কোন্ বাপ তোর ধনুক ভাঙ্গতে গেছিল মিথিলা।
কোন্ বাপ তোর কৈলাস তুলিতে গিয়াছিলা ॥

কোন্ বাপ অন্ধ হলো জামদগ্ন্যের তেজে। মোর বাপ তোর কোন্ বাপকে বেঁধেছিল লেজে॥
একে একে কহিলাম তোর সকল বাপের কথা।
ইহা সবাকে কাজ নাই তোর যোগী বাপটী কোথা॥

অনন্তর নানাবিধ কথোপকথন হইলে রাবণ কুপিত হইয়া কহিলেন, সমুদ্রের বাঁধ ভাঙ্গিয়াদিলে, বিভীষণ আসিয়া শরণাপন্ন হইলে,—হনুমানকে বাঁধিয়া এই স্থানে আনিয়াদিলে, এবং রামলক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণপরিত্যাগপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিলে, আমি কোনরূপে ক্ষান্ত হইতে পারি। ইহা শুনিয়া—

অঙ্গদ বলিছে রাবণ আমরা তাই চাই। কচ্ কচ্যে তে কাজ্কি মোরা দেশে চলে যাই॥
রামকে বলি গিয়া ইহা না করিলে নয়। সেতুবন্ধ ভেঙ্গে দিব দণ্ড চারি ছয়॥
বিভীষণে বান্ধিয়া আনিব তোর কাছে। বুঝিয়া করহ শান্তি মনে যত আছে॥
নির্ম্মাইয়া দিব লঙ্কা যত গেছে পোড়া। শূর্পনখার নাক কাণটী কেমনে দিব জোড়া॥

নিম্নলিখিত শ্লোকাবলীতে কবির সহৃদয়তারও বিলক্ষণ পরিচয় হইবে—

বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে। ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে॥
কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ। কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ॥
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী। লুকাইয়া আছেন লক্ষ্মণ দেখ দেখি॥
গোদাবরী নীরে আছে কমল কানন। তথাকি কমলমুখী করেন ভ্রমণ॥
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া। রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া॥
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস। চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস॥
রাজ্যচ্যুত আমাকে দেখিয়া চিন্তান্বিতা। হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা॥
রাজ্যহীন যদ্যপি হয়েছি আমি বটে। রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে॥
আমার সে রাজলক্ষ্মী নিল কোন জনে। কৈকয়ীর মনোঽভীষ্ট সিদ্ধ এত দিনে॥
সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে। লুকাইল তেমন জানকী বনান্তরে॥
কনক লতার প্রায় জনক দুহিতা। বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিতা॥
দিবাকর নিশাকর দীপ তারাগণ। দিবানিশি করিতেছে তমোনিবারণ॥
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার। এক সীতা বিহনে সকলই অন্ধকার॥
দশদিক্ শূন্য দেখি সীতার অভাবে। সীতাবিনা অন্য কিছু হৃদয়ে কে ভাবে॥
সীতাধ্যান সীতাজ্ঞান সীতা চিন্তামণি। সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণী॥

দেখরে লক্ষ্মণ ভাই কর অন্বেষণ। সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন॥
আমি জানি পঞ্চবটি তুমি পুণ্যস্থান। সেই সে এখানে করিলাম অবস্থান॥
তাহার উচিত ফল দিলেহে আমারে। শূন্য দেখি তপোবন সীতা নাই ঘরে॥
শুন পশু মৃগ পক্ষী শুন বৃক্ষ লতা। কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা॥ ইত্যাদি

কৃত্তিবাসের সময়ে অথবা তাহার পূর্ব্বেই বোধহয় দেশমধ্যে পাঁচালি (পঞ্চালী *) নামক গীতের সৃষ্টি হইয়াছিল। লোকে মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরী, সত্যনারায়ণ প্রভৃতির পাঁচালী বাদ্য ও স্বর সংযোগে গানকরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কৃত্তিবাস সেইরূপ পাঁচালীর অনুকরণেই ভাষারামায়ণের রচনা করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদাই আপনার রচনাকে গীত, পাঁচালী ও নাচাড়ী † বলিয়া উল্লেখকরিয়াছেন। বোধহয় গীতের অনুরোধেই তাঁহার রচিত শ্লোকগুলিতে অক্ষরগণনার ও যতির নিয়ম তত অনুসৃত হয়নাই। না হউক তিনি যে উদ্দেশে ঐ গ্রন্থের প্রণয়ন করেন, তাহা সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হইয়াছে। শত সহস্র লোকে চামরমন্দিরাসহযোগে রামায়ণগান করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। রামযাত্রার পালা সকলই ঐ রামায়ণকে অবলম্বন করিয়াই প্রণীত হইয়াছে। দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই যে, রামায়ণের উপাখ্যান কহিতেপারে, ভাষারামায়ণই তাহার মূল কারণ। যাহার কিছুমাত্র অক্ষরপরিচয় আছে সেই, রামায়ণ পাঠকরিতে প্রবৃত্ত হয়। সামান্য দোকানদারেরাও ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে মধ্যে অবকাশ পাইলেই তারস্বরে রামায়ণপাঠ করিয়াথাকে। এরূপ সৌভাগ্য সকল কবির ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

রামায়ণের ভাষা আদ্যোপান্ত সুমধুর ও ব্যাকরণানুসারে সর্ব্বতোভাবে পরিশুদ্ধ না হউক, সকলস্থলেই যে, কবির মনোগতভাবের প্রকা-

* পঞ্চালী = পঞ্চ + আলী = পঞ্চসখীর গীত?

† নাচাড়ী = নট্যালী = নটী + আলী = নৃত্যকারিণী সখীর গীত?—যাহা এক্ষণে ঝুমুর হইয়া পড়িয়াছে?

শক, তদ্বিষয়ে সংশয়নাই। ভাষার দুরূহতা বা জটিলতা দোষে ভাবগ্রহ করিতে পারাযায় না—সমস্ত রামায়ণের মধ্যে এরূপ স্থল অতি বিরল। ইহাঁর পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী অনেক কবির রচনায় এরূপগুণ লক্ষিতহয়না।

ভাষারামায়ণে পয়ার ও ত্রিপদী ভিন্ন অন্য ছন্দ প্রায় নাই। তবে কলিকাতামুদ্রিত একখানি পুস্তকে অকম্পনের যুদ্ধের পর, বজ্রদংষ্ট্রের যুদ্ধস্থলে 'নর্ত্তকছন্দ' নামে একটী নূতন ছন্দ দেখিতে পাওয়াযায়, কিন্তু কলিকাতামুদ্রিত অপরাপর পুস্তকে ও শ্রীরামপুরমুদ্রিত পুস্তকে ঐ প্রস্তাবটী একবারে নাই, এবং ছন্দটিও—

"তবে দেখি তাহারে, সেইত দ্বারে, প্লবঙ্গমগণ।
তারা তরুশিখরী, করেতে ধরি, রহে স্থৈীমন॥" ইত্যাদি

নিতান্ত আধুনিকত্বগন্ধী—অতএব বোধহয় ঐ প্রস্তাব কৃত্তিবাসের রচিত নহে—উহা কোন আধুনিক কবিকর্ত্তৃক রচিত হইয়া উহার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। যাহাহউক, রামায়ণে ত্রিপদী পয়ার ভিন্ন অন্য ছন্দ প্রায় নাই যথার্থ বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে ঐ দুই ছন্দ হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন দুই একটী অপররূপ ছন্দও দেখিতে পাওয়াযায় যথা—

শমনদমন রাবণ রাজা রাবণদমন রাম।
শমনভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম॥ ইত্যাদি

কৃত্তিবাসরচিত রামায়ণভিন্ন আরও দুইখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আমরা দেখিতে পাইয়াছি, তাহার একখানির নাম 'যোগাদ্যার বন্দনা' ও অপর খানির নাম 'শিবরামের যুদ্ধ'। দুই খানিতেই কৃত্তিবাসের ভণিতি আছে। রচনাদর্শনেও ঐ দুই পুস্তক তাঁহারই লেখনীনির্গত বলিয়া বোধহয়।

কবিকঙ্কণ—চণ্ডী।

জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী সেলিমাবাদ থানার অন্তর্গত দামুন্যা নামক গ্রামে চণ্ডীকাব্যের রচয়িতা মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর নিবাস ছিল।

তিনি রাঢ়ীয়ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পিতামহের নাম জগন্নাথমিশ্র, পিতার নাম হৃদয়মিশ্র এবং জ্যেষ্ঠসহোদরের নাম কবিচন্দ্র। চণ্ডীর ভণিতিতেই এই পরিচয় দেওয়াআছে যথা—

মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়মিশ্রের তাত, কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাঁহার অনুজভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই, বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কবির প্রকৃতনাম মুকুন্দরাম; মিশ্র ও চক্রবর্ত্তী তাঁহার বংশীয় উপাধি—অলৌকিক-কবিত্বশক্তি-সন্দর্শন জন্য তাৎকালিক জনগণের প্রদত্ত উপাধি—কবিকঙ্কণ। বোধহয় তাঁহার অগ্রজেরও কবিচন্দ্র প্রকৃত নাম নহে—উপাধিমাত্র। কবিচন্দ্রের কবিত্বপ্রদর্শক আর কোন গ্রন্থ দেখিতে পাওয়াযায়না। কেবল শিশুবোধকের মধ্যগত দাতাকর্ণে—

"দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ব্যাসের কৃপায়। ধনপুত্র হয় তার যেজন গাওয়ায়॥

এই ভণিতিদর্শনে এরূপ অনুমান করাযাইতেপারে যে, ঐ প্রবন্ধ কবিকঙ্কণের ভ্রাতা কবিচন্দ্রের রচিত। কোন কোন প্রাচীনপুস্তকে চণ্ডীর মধ্যেও কবিচন্দ্ররচিত একটী সূর্য্যবন্দনা দেখিতেপাওয়াযায়।

মুকুন্দরাম যৌবনে বা প্রৌঢ়াবস্থার প্রথমে দুরাত্মা যবনদিগের অসহনীয় উপদ্রবে উৎপীড়িত হইয়া পিতৃপৈতামহ বাসস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক পুত্রকলত্র সমভিব্যাহারে দেশান্তরযাত্রা করেন, এবং নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্ব্বর্ত্তী ব্রাহ্মণভূমি পরগণার মধ্যস্থিত আঁড়্রা নামক গ্রামের ব্রাহ্মণজাতীয় রাজা বাঁকুড়াদেব (বা বাঁকুড়ারায়) মহাশয়ের সমীপে উপস্থিত হন। বাঁকুড়াদেব তাঁহার কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সভাসদরূপে নিযুক্ত করেন, এবং আপন পুত্র রঘুনাথরায়ের শিক্ষকতাকার্য্যে ব্রতী করিয়া দেন। মুকুন্দরাম রাজদায় ও অন্নচিন্তার দায় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তথায় সুখে অবস্থান করত এই কাব্যগ্রন্থের প্রণয়ন করেন। গ্রন্থের প্রথমভাগেই ঐ বৃত্তান্তের বর্ণন আছে—যথা——

শুনরে সভার জন, কবিত্বের বিবরণ, এই গীত হইল যেমতে।
উরিয়া মায়ের বেশে, কবির শিয়র দেশে, চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে॥
সহর সেলিমাবাজ, তাহাতে সুজনরাজ, নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি, দামুন্যায় চাস চসি, নিবাস পুরুষ ছয় সাত॥
ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপাদাম্বুজে ভৃঙ্গ, গৌড়বঙ্গ উৎকলসমীপে।
অধর্ম্মী রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে, খিলাৎ পায় মহম্মদসরিফে॥
উজীর হলো রায়জাদা, ব্যাপারীরা ভাবে সদা, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হলো অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া, পোনর কাঠায় কুড়া, নাহিমানে প্রজার গোহারি॥
সরকার হৈল কাল, খিলভূমি লেখে লাল, বিনা উপকারে খায় ধুতি।
পোদ্দার হইল যম, টাকা আড়াই আনা কম, পাই লভ্য লয় দিন প্রতি॥
ডিহিদার আরোজখোজ, টাকা দিলে নাহি রোজ, ধান্য গোরু কেহ নাহি কেনে।
প্রভু গোপীনাথ নন্দী, বিপাকে হইল বন্দী, হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে॥
কোতালিয়া বড় পাপ, সজ্জনের কাল সাপ, কড়ির কারণে বহু মারে।
আথালি পাথালি কড়ি, লেখা জোখা নাহি দেড়ি, যত দিয়া যেবা নিতে পারে॥
জমাদার বসায় নাছে, প্রজারা পলায় পাছে, দুয়ার জুড়িয়া দেয় থানা।
প্রজার ব্যাকুল চিত্ত, বেচে ধান্য গোরু নিত্য, টাকার দ্রব্য হয় দশ আনা॥
সহায় শ্রীমন্ত খাঁ, চণ্ডীগড় যাঁর গাঁ, যুক্তি করি গম্ভীর খাঁর সনে।
দামুন্যা ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রামানন্দ ভাই, পথে দেখা হৈল তার সনে॥
তেলিগাঁয়ে উপনীত, রূপরায় কৈল হিত, যদুকুণ্ডু তেলি কৈল রক্ষা।
দিয়া আপনার ঘর, নিবারণ কৈল ডর, তিন দিবসের দিল ভিক্ষা॥
বাহিল গোড়াই নদী, সর্ব্বদা স্মরিয়া বিধি, তেউটায় হৈনু উপনীত।
দারুকেশ্বর তরি, পাইনু মাতুলপুরী, গঙ্গাদাস বহু কৈল হিত॥
নারায়ণ পরাশর, ছাড়িলাম আমোদর, উপনীত গোথড়া নগরে।
তৈল বিনা করি স্নান, উদক করিনু পান, শিশু কান্দে ওদনের তরে॥
আশ্রয়ি পুখর আড়া, নৈবেদ্য শালুক নাড়া, পূজা কৈনু কুমুদ প্রসূনে।
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে, নিদ্রা গেনু সেই ধামে, চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥
করিয়া পরম দয়া, দিয়া চরণের ছায়া, আজ্ঞা দিলা রচিতে সঙ্গীত।
গোথড়া ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রামানন্দ ভাই, আঁড়রায় গিয়া উপনীত॥
আঁড়রা ব্রাহ্মণভূমি, ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী, নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ববাণী, সম্ভাষিনু নৃপমণি, রাজা দিলা দশ আড়া ধান॥

বীর মাধবের সুত, বাঁকুড়াদেব গুণযুত, শিশুপাঠে কৈল নিয়োজিত।
তাঁর সুত রঘুনাথ, রূপে গুণে অবদাত, গুরু করি করিল পূজিত॥
যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা, সেই মন্ত্র করি শিক্ষা, মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য।
হাতে করি পত্রমসী, আপনি কলমে বসি, নানা ছাঁদে লেখান কবিত্ব॥
সঙ্গে ভাই রামানন্দী, যে জানে স্বপ্নের সন্ধি, অনুদিন করিত যতন।
নিত্য দেন অনুমতি, রঘুনাথ নরপতি, গায়নেরে দিলেন ভূষণ॥
ধন্য রাজা রঘুনাথ, কুলে শীলে অবদাত, প্রকাশিল নূতন মঙ্গল।
তাঁহার আদেশ পান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান, মম ভাষা করিও কুশল॥

উপরিলিখিত সন্দর্ভটী মুদ্রিত কবিকঙ্কণচণ্ডীহইতে অবিকল উদ্ধৃত নহে। কবিকঙ্কণ, আঁড়রাগ্রামের যে ব্রাহ্মণজাতীয় রাজা রঘুনাথদেবের রাজসভায় চণ্ডীগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সেই রাজাদিগের বংশীয়েরা উক্ত আঁড়রা গ্রাম হইতে ২ ক্রোশদূরবর্ত্তী 'সেনাপতে' নামক গ্রামে অদ্যাপি বাস করেন। তাঁহারা কহেন যে, তাঁহাদের বাটীতে যে চণ্ডী-পুস্তক বর্ত্তমান আছে, তাহা কবিকঙ্কণের স্বহস্তলিখিত। এ কথা সত্য কি না বলিতে পারি না, কিন্তু আমাদের এক আত্মীয় * অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই পুস্তক হইতে উপরিউক্ত সন্দর্ভটী সমুদায় লেখাইয়া আনিয়া-দিয়াছেন। আমরা উপরিভাগে যাহা প্রকাশ করিলাম, তাহা উক্ত সেনাপতেগ্রামের দ্বিজরাজভবনস্থ পুস্তকের পাঠানুসারে অনেকাংশে বিশোধিত।

ঐ পুস্তকের পাঠসকল দেখিতে পাইয়া আমাদের অনেকগুলি সংশয় অপনীত হইয়াছে। প্রথমতঃ মুদ্রিত পুস্তকস্থ "উপনীত কুচুট নগরে" এই লিখনদ্বারা মুকুন্দরামের দামুন্যাহইতে আঁড়রা গমনসময়ে পথিমধ্যে কুচুটগ্রামপ্রাপ্তি বর্ণিত আছে—কিন্তু তাহা কোনমতে সঙ্গত হয়না—কারণ কুচুট্ (কালেশ্বর) দামুন্যাহইতে অনেক উত্তরদিকে অবস্থিত—

* শ্রীযুত বাবু নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।

আঁড়রা সে দিকে নহে—দক্ষিণ দিকে। সুতরাং দ্বিজরাজভবনস্থ পুস্তকে যে, কুচুটের পরিবর্ত্তে গোথড়াগ্রাম লিখিত আছে, তাহাই সঙ্গত বোধহয়।

২য়তঃ—মুদ্রিতপুস্তকে 'সুধন্য বাঁকুড়ারায়' এইরূপ একটী চরণ আছে—তৎপাঠে অনেকের ভ্রম হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণভূমি পরগণা ও তদন্তর্গত আঁড়রা গ্রাম, বাঁকুড়া জেলার মধ্যে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, উহা মেদিনীপুর জেলার মধ্যগত এবং বাঁকুড়াদেব বা বাঁকুড়ারায় রঘুনাথ-দেবের পিতার নাম। উপরিউল্লিখিত পুস্তকের এবং আরও কয়েকখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকের পাঠে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত আছে।

এক্ষণে চণ্ডীকাব্য কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহার নির্ণয়করা আবশ্যক। পূর্ব্বোল্লিখিত দ্বিজরাজভবনস্থ পুস্তকের শেষ অংশটী পাওয়া যায় নাই—সুতরাং তাহাতে সময়নির্দ্দেশক কোন কথা ছিল কি না, জানিবার যো নাই। আমরা আরও ৫।৬ খানি হস্তলিখিত প্রাচীনপুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলাম; সে সকল পুস্তকের কুত্রাপি সময়সূচক শ্লোক নাই। কিন্তু এক্ষণকার মুদ্রিতপুস্তকের শেষভাগে একটী শ্লোক দেখিতে পাওয়াযায়—যথা

শকে রস রস বেদ শশাঙ্কগণিতা। কতদিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥

এই শ্লোকের অর্থ লোকে সচরাচর ১৪৬৬ শক [১৫৪৪ খৃঃঅব্দ] করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে কবির নিজলিখিত মানসিংহের রাজত্ব-কালবর্ণন সঙ্গত হয় না। কারণ মানসিংহ ১৫১১ শকে [১৫৮৯খৃঃঅব্দে] এদেশের নবাবীপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং ১৪৬৬ শকের ৪৫ বৎ-সরপরে যে মানসিংহ রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহার বর্ণন ১৪৬৬ শকে হওয়া সর্ব্বতোভাবেই অসঙ্গত। এই অসঙ্গতিনিবারণার্থ কেহ কেহ "শকে রস রস বেদ" এই পাঠকে ভ্রান্ত বলিয়া "শকে রস রস বাণ" এইরূপ পাঠান্তর কল্পনা করিয়াছেন—কিন্তু তাহাও সঙ্গত হয়না। যেহেতু ১৫৬৬ শকেও [১৬৪৪ খৃঃঅব্দে] মানসিংহ এদেশের অধিপতি ছিলেন

না। তিনি ১৫২৬ শকেই [১৬০৪ খৃঃঅব্দে] আপনার আধিপত্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। যাহাহউক আমাদের বোধহয় "শকে রস রস" ইত্যাদি শ্লোক কবিকঙ্কণের স্বরচিত নহে—উহা প্রক্ষিপ্ত শ্লোক হইবে। তাহা না হইলে আমরা যে কয়েকখানি হস্তলিখিত পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার কোন না কোন পুস্তকে উহা দেখাযাইত। যখন্ তাহা দেখা-যাইতেছে না এবং যখন্ উহাদ্বারা প্রকৃতসময়ের নির্ণয় হইতেছে না, তখন্ উহাকে কল্পিতপাঠ বৈ আর কি বলাযাইতে পারে? যাহাহউক, আমরা চণ্ডীকাব্যের সময়নির্ণয়ের একটী উৎকৃষ্ট উপায় পাইয়াছি। আমাদের এক পরম সুহৃৎ * কবিকঙ্কণের উপজীব্য রাজা রঘুনাথরায়ের রাজত্বকাল ও বংশাবলী প্রভৃতি পূর্ব্বোল্লিখিত রাজবাটী হইতে সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াপাঠাইয়াছেন। তদ্দ্বারা জানাযাইতেছে যে, রাজা রঘুনাথরায় ১৪৯৫ শক [১৫৭৩ খৃঃ অঃ] হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫২৫ শক [১৬০৩ খৃঃ অঃ] পর্য্যন্ত ৩০ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। কবিকঙ্কণ, রাজারঘুনাথের রাজত্বকালে ও তাঁহারই উৎসাহে যে, কাব্যরচনা করিয়া-ছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ গ্রন্থমধ্যেই আছে। অতএব ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ১৪৯৫ শকের পর ১৫২৫ শকের মধ্যে কোন সময়ে কবিকঙ্কণ চণ্ডীকাব্যের রচনা করিয়াছিলেন। উপরিভাগে যেরূপ উল্লিখিত হইল, তদ্দ্বারা দৃষ্ট হইবে যে, রাজা মানসিংহের রাজত্বও ঐ সময়মধ্যেই হইয়াছিল।

এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, যদি কেহ "শকে রস রস বেদ শশাঙ্ক" ইত্যাদি শ্লোককে সমূলক বলিতে নিতান্তই ইচ্ছা করেন, তাহাহইলে আমরা ঐ শ্লোকের এইরূপ অর্থ করিব—যথা, 'রস' শব্দে যেরূপ ৬ বুঝায়, সেইরূপ ৯ও বুঝাইতে পারে, অতএব 'শকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা' ইহার অর্থ ১৪৬৬ শক না হইয়া ১৪৯৯ শক হইবে। ১৪৯৯ শকে রঘুনাথরায় রাজা ছিলেন—তৎকালে ঐ গ্রন্থ রচিত হওয়া

* শ্রীযুত বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়।

অসম্ভব নহে। যদি বল ১৪৯৯ শকেও মানসিংহের অধিকার হয় নাই—তাহার ১২ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫১১ শকে হইয়াছিল, সুতরাং ১৪৯৯ শকে লিখিত গ্রন্থের সূচনায় মানসিংহের রাজত্ববর্ণন কিরূপে সঙ্গত হয়? এ কথার উত্তরে আমরা এই বলি যে, ঐ ১৪৯৯, গ্রন্থের আরম্ভকালের শক—সমাপ্তিকালের শক নহে। ঐ শকে তিনি আঁড়রানগরে অবস্থানপূর্ব্বক চণ্ডীরচনার আরম্ভ করিয়া ১২। ১৪ বৎসর পরে অর্থাৎ যখন্ মানসিংহের আধিপত্য দেশমধ্যে সুবিদিত হইয়াছিল, তৎকালে রচনার শেষ করিয়াথাকিবেন এবং এক্ষণকার গ্রন্থকারেরা যেরূপ রচনা সমাপ্তি করিয়া শেষে বিজ্ঞাপন লিখিয়াথাকেন, বোধহয় তিনিও সেইরূপ গ্রন্থরচনা সমাপনের পর পরিশেষে গ্রন্থোৎপত্তির সূচনাভাগটী লিখিয়া গ্রন্থের প্রথমভাগে যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন। যাহাহউক যখন্ ১৪৯৫ শকের পর ১৫২৫ শকের পূর্ব্বে ৩০ বৎসরের মধ্যে কোনসময়ে কবিকঙ্কণ চণ্ডীকাব্যরচনা করিয়াছিলেন, এরূপ স্থিরতর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তখন্ এ বিষয়ের জন্য আর তর্ক বিতর্ক করার কোন প্রয়োজন নাই।

কবিকঙ্কণের দুই পুত্র ও দুই কন্যা ছিলেন। পুত্রদ্বয়ের নাম শিবরাম ও মহেশ এবং কন্যা দুইটীর নাম চিত্ররেখা ও যশোদা। কবিকঙ্কণের বংশীয়েরা দামুন্যা গ্রামে কেহ নাই; তাহার নিকটবর্ত্তী 'বৈনান' গ্রামে বাস করেন। তাঁহাদের অনেকে অদ্যাপি সংস্কৃতশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ব্যবসায় করিয়াথাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারা কবিকঙ্কণ হইতে কয় পুরুষ অন্তর? তাহা প্রায় কেহই বলিতে পারেন না। ইহাঁদের বাটীতেও আল্‌তায় লিখিত একখানি চণ্ডীকাব্য আছে—সে খানির পূজা হয়। ইহাঁরা বলেন সে খানি কবিকঙ্কণের স্বহস্তলিখিত।

কবিকঙ্কণের উপজীব্য রাজা রঘুনাথ রায়ের বংশীয়েরাও পূর্ব্বোল্লিখিত সেনাপতে গ্রামে অদ্যাপি বাস করিতেছেন। এক্ষণে তাঁহাদের

রাজ্য নাই—বর্দ্ধমানেশ্বর সমুদায় কাড়িয়া লইয়াছেন। রঘুনাথরায় হইতে ১০ম পুরুষ (বর্ত্তমান) শ্রীযুক্তরামহরিদেব, সেনাপতেগ্রামের কালেক্টরীর খাজনাবাদ যৎকিঞ্চিৎ যাহা উপস্বত্ব থাকে, তদ্দ্বারাই কথঞ্চিৎ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন।

মুকুন্দরাম চণ্ডীকাব্যের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণস্বরূপ গণেশ লক্ষ্মী চৈতন্য রাম প্রভৃতির বন্দনাকরিয়া সংস্কৃতপুরাণরচনার অবলম্বিত রীতি অনুসারে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, দক্ষযজ্ঞ, হৈমবতীর বিবাহ, গণপতি ও কার্ত্তিকেয়ের জন্মপ্রভৃতি বর্ণনপূর্ব্বক ভগবতীর পৃথিবীতে পূজাপ্রচারোদ্দেশে কালকেতুব্যাধের ও শ্রীমন্তসওদাগরের দুইটী বৃহৎ উপাখ্যান সবিস্তর বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল বর্ণনা পাঠকরিলে তিনি যে, সংস্কৃতশাস্ত্রে একজন বিশেষ ব্যুৎপন্ন ও বহুদর্শী লোক ছিলেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় থাকে না। গৌরীর রূপবর্ণন, নারদকৃত সম্বন্ধ, তারকাসুরপীড়িত দেবগণের ব্রহ্মসমীপে গমন, শিবতপস্যা, মদনদহন, রতিবিলাপ, পার্ব্বতীতপস্যা, হরানুগ্রহ ও হরগৌরীবিবাহপ্রভৃতি, কালিদাসরচিত কুমারসম্ভবের অনুকৃতিস্বরূপ হইলেও উহাতেও তাঁহার বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। শিবের ভিক্ষা ও হরগৌরীর কন্দল প্রভৃতি তাঁহার নূতন রচনা। এই গ্রন্থস্থ কালকেতুব্যাধ ও ধনপতি সওদাগর প্রভৃতির উপাখ্যান কবির স্বকপোলকল্পিত? কি ইহার কোন না কোনরূপ পৌরাণিক মূল আছে? তাহা স্থির বলিতে পারাযায়না। কিন্তু কবির লেখার ভঙ্গীতে বোধহয় যে, কোন পুরাণ বা উপপুরাণে ইহার কিছু না কিছু মূল থাকিবে। যেহেতু তিনি মধ্যে মধ্যে "বিচারিয়া অনেক পুরাণ" এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছিলাম পদ্মপুরাণে কালকেতুর উপাখ্যান এবং কল্কীপুরাণে শ্রীপতিসওদাগরের উপাখ্যান বর্ণিত আছে, কিন্তু আমরা ঐ দুই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম, কোথাও তাহা দেখিতেপাইলাম না। যাহাহউক চণ্ডীকাব্য এক্ষণে প্রায় রামায়ণ মহাভারতাদির ন্যায় ধর্ম্মগ্রন্থমধ্যে গণ্য

হইয়াছে; অনেক শাক্তে নিয়মিতরূপে এই গ্রন্থের পূজা করেন; ইহার উপাখ্যান ভাগ লইয়া কত কত যাত্রার পালা প্রস্তুত হইয়াছে; কত কত গায়কে চামরমন্দিরাসহযোগে চণ্ডীগান করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়াছে ও করিতেছে এবং কত লোকে ধর্ম্মবোধে সংকল্প করিয়া ঐ গীত বাটীতে গাওয়াইতেছে। সুতরাং কাল্পনিক উপন্যাস হইলে লোকের ইহাতে এত শ্রদ্ধাহওয়া তাদৃশ সঙ্গত হয় না। যাহাহউক সচরাচরপ্রচলিত পুরাণ ও উপপুরাণে ইহার কোনরূপ উল্লেখ দেখিতে না পাওয়ায়, অনেকে ইহাকে স্বকপোলকল্পিত বলিয়াই বোধকরেন। আমরা বাল্যকালে পিতামহীদিগের মুখে মনসার কথা, ইতুর কথা, ষষ্ঠীর কথা, সুবচনীর কথা, লক্ষ্মীর কথা, মঙ্গলচণ্ডীর কথা প্রভৃতি অনেককথা শুনিয়াছি; সেই কথায় এইরূপ অনেক উপাখ্যান আছে। অতএব আমাদের বোধহয়, কবি স্বদেশপ্রচলিত তাদৃশ কোন উপাখ্যানকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া তদুপরি এই সুরম্যহর্ম্ম্যের নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন।

কবিকঙ্কণ বাঙ্গালাভাষার সর্ব্বপ্রধান কবি। ইতিপূর্ব্বে আমরা যে যে কবির নামোল্লেখ করিয়াছি—কবিত্ব, পাণ্ডিত্য ও কল্পনাগুণে তাঁহাদের কেহই কবিকঙ্কণের তুল্যকক্ষ নহেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, কবিত্ববিষয়ে ভারতচন্দ্রের যে, এত গৌরব এবং আমাদেরও ভারতচন্দ্রের প্রতি যে, এত শ্রদ্ধা আছে—কিন্তু চণ্ডীপাঠের পর অন্নদা-মঙ্গল পাঠ করিলে, সে গৌরব ও সে শ্রদ্ধার অনেক হ্রাস হইয়াযায়। সংস্কৃতে যেমন মাঘকবি ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয়কে আদর্শ করিয়া শিশুপালবধের রচনা করিয়াছিলেন, ভারতচন্দ্রও সেইরূপ কবিকঙ্কণের চণ্ডীকে আদর্শ করিয়া অন্নদামঙ্গলের রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে উভয়েরই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, দক্ষযজ্ঞ, পার্ব্বতীর জন্ম-তপস্যা—বিবাহ, হর-গৌরীর কন্দল প্রভৃতি প্রায় একরূপ ধরণেই লিখিত। তদ্ভিন্ন শাপ-ভ্রষ্ট নায়কনায়িকার জন্মপরিগ্রহ, ভগবতীর বৃদ্ধাবেশধারণ, মশানে পিশাচসেনার সহিত রাজসেনার যুদ্ধ, চৌত্রিশ অক্ষরে স্তব, ঝড়বৃষ্টিদ্বারা

দেশবিপ্লাবন, শব্দশ্লেষসহকারে ভগবতীর আত্মপরিচয়দান, দেশগমনোৎসুক পতির নিকট পত্নীর বারমাসবর্ণন, সুপুরুষদর্শনে কামিনীদিগের নিজ নিজ পতিনিন্দা, দাসীর হাটকরার পরিচয় দেওয়া, ইত্যাদি ভূরি ভূরি বিষয় এবং ভঙ্গপয়ার, ঝাঁপতাল, একাবলী প্রভৃতি ছন্দসকল ভারতচন্দ্র যে, চণ্ডী হইতেই সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ঐ দুই গ্রন্থের পাঠমাত্রেই বুঝিতে পারাযায়। তদ্ভিন্ন ভারতচন্দ্র মধ্যে মধ্যে আদিরসের যেরূপ নিরবগুণ্ঠন বর্ণনা করিয়াছেন, কবিকঙ্কণ সেরূপ করেন নাই। তিনি অসাধারণ পরিহাসরসিক হইয়াও তত্তৎস্থলে বিশেষ বিজ্ঞতার সহিত লেখনীচালনা করিয়াছেন। বর্দ্ধমানে সুন্দরকে দেখিয়া নাগরিক কামিনীরা নিজ নিজ পতির নিন্দাকরণাবসরে কি জঘন্য মনোবৃত্তিরই প্রকাশ করিয়াছিল! কিন্তু মনোহরবেশধারী শিবকে সন্দর্শনকরিয়া ওষধিপ্রস্থবিলাসিনীরাও দুঃসহদুঃখাবেগে স্ব স্ব পতির নিন্দা করিয়াছিল সত্য, কিন্তু সেরূপ কুৎসিত আশয়ের কিছুমাত্র প্রখ্যাপন করেনাই—বরং অদৃষ্টের দোষ দিয়া পাতিব্রত্যপক্ষই সমর্থন করিয়াছিল। ইহা কবির সামান্য বিমলরুচিতার কার্য্য নহে।

কবিকঙ্কণ, চণ্ডী লিখিতে প্রবৃত্তহইয়া প্রসঙ্গক্রমে রামায়ণ মহাভারত হরিবংশ প্রভৃতির ভূরি ভূরি উপাখ্যান, সুরলোক ও সুরগণের বিবরণ ভারতবর্ষস্থ নানাদেশের নদ নদী গ্রাম নগর অরণ্য প্রভৃতির কতই বর্ণন করিয়াছেন! এবং পশু পক্ষী ও নানাপ্রকৃতিক নানাধর্ম্মী নানাজাতীয় লোকের বিভিন্নপ্রকার স্বভাবগুলি কি সুন্দররূপেই পৃথক্‌ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন! ঐ সকল চিত্রে একের রঙ্‌ অপরের গাত্রে প্রায় কোথাও সংলগ্ন হয়নাই—সকলগুলিই পৃথক্ পৃথক্ রঙ্‌বিশিষ্ট। কালকেতু, ভাঁড়ুদত্ত, ধনপতি, শ্রীমন্ত, ফুল্লরা, লহনা, খুল্লনা, দুর্ব্বলা প্রভৃতি সমুদয় চরিত্রগুলিই পৃথক্‌স্বভাব। ফলতঃ বাঙ্গালাকবিদিগের মধ্যে স্বভাববর্ণনে কবিকঙ্কণের ন্যায় নিপুণ আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায়না। তিনি নিজে দরিদ্র ছিলেন, এজন্য ফুল্লরার দারিদ্র্য-

বর্ণনসময়ে তদ্বিষয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনকরিয়াছেন। ভাঁড়ুদত্ত ও মুরারিশীলবণিকের বঞ্চকতাবর্ণনে তিনি সাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করেন নাই। বাঙ্গালদিগের বিলাপে প্রচুর পরিহাসরসিকতা প্রকাশকরিয়াছেন। বিশ্বকর্ম্মাকর্তৃক জগজ্জননী ভগবতীর কঞ্চুলিকামধ্যে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড চিত্রিত হওয়ায় কবির কি অলৌকিক প্রগাঢ় ভাবুকতাই প্রকটিত হইয়াছে! তদ্ভিন্ন অন্তঃসত্ত্বার মানসিক অবস্থা, বৈবাহিক আচারপদ্ধতি, পতিবশ করিবার উদ্দেশে স্ত্রীর ঔষধকরণ, সপত্নীকলহ, রন্ধন, পাশক্রীড়া, এবং অগ্রে সম্মান পাইবার জন্য বণিক্‌দিগের বাগ্বিতণ্ডাপ্রভৃতির বর্ণনস্থলে কবির লোকব্যবহারাভিজ্ঞতার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

কবি যে দুইটী উপাখ্যান বর্ণনাকরিয়াছেন, তাহার একটীর অধিষ্ঠানভূমি কলিঙ্গদেশ এবং দ্বিতীয়টীর বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী মঙ্গলকোটের সন্নিহিত অজয়নদের তীরস্থ উজ্জয়িনীনগরী। তন্মধ্যে কলিঙ্গদেশ কবির বাসভূমি হইতে বহুদূরবর্ত্তী; তথায় বোধ হয় তিনি স্বয়ং কখনই গমন করেন নাই এবং তথায় গমন করিয়াছে, এরূপ কোন লোকের সহিতও বোধহয় তাঁহার সাক্ষাৎ হয়নাই। সুতরাং ঐ স্থানের ভৌগোলিক বিবরণে তাঁহার অনেক ভ্রম হইয়াছে। তিনি গুজরাটনগরকে কলিঙ্গের অতিনিকটবর্ত্তী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন—কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। গুজরাট বোম্বে প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ও ভারতবর্ষের পশ্চিম-উপকূলে অবস্থিত; কিন্তু কলিঙ্গ, মাদ্রাজপ্রেসিডেন্সির মধ্যস্থ এবং পূর্ব্বোপকূলে স্থিত—উভয়দেশের অন্তর ৩ শত ক্রোশের ন্যূন নহে। যাহাহউক দ্বিতীয় অধিষ্ঠানভূমির ভৌগোলিকবিবরণ অনেকদূর পর্য্যন্ত ঠিক হইয়াছে। মঙ্গলকোটের নিকটে 'উজনী' (উজ্জয়িনী) নামে অদ্যাপি একটী স্থান দেখাযায়। উহা পতিত ভূখণ্ড মাত্র—গ্রাম বা নগর উহার উপর কিছুই নাই। উহার সমীপে 'ভ্রমরা' নামেও একটী খাল আছে; উহা অজয়নদের সহিত সংযুক্ত। ধনপতি ও শ্রীমন্তসওদাগরের অজয়

বহিয়া সিংহলযাত্রার সময়ে নদের উভয়কূলে হুসনপুর, গাঙ্গড়া, বাকুল্যা, চরকি, অঙ্গারপুর, নগাঁ, উদ্ধানপুর প্রভৃতি যে সকল গ্রামের নামোল্লেখ আছে, অদ্যাপি তাহার অনেক গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে নৌকা গঙ্গায় প্রবিষ্ট হইলে, সওদাগরেরা গঙ্গার উভয়কূলবর্ত্তী ইন্দ্রাণী-পরগণা, ললিতপুর (নলেপুর) ভাগুসিংহের (ভাওসিঙের) ঘাট, মেটেরি, বেলনপুর, নবদ্বীপ, মির্জাপুর, অম্বিকা (আম্বুয়া) শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া, উলা, হালিসহর, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, গরিফা, গোন্দলপাড়া, জগদ্দল, নিমাইতীর্থের ঘাট, মাহেশ, খড়দহ, কোণনগর, কোতরঙ্গ, চিৎপুর, শালিকা, কলিকাতা, বেলেঘাটা, কালীঘাট, মাইনগর, বারাশত (দক্ষিণ) খলিনা, ছত্রভোগ, হেতেগড়, মগরা প্রভৃতি যে সকল স্থান দর্শন করিয়াছিলেন, সে সকলও অদ্যাপি প্রত্যক্ষ হইতেছে। বোধহয় কালসহকারে কোন কোন গ্রাম স্থানান্তরিত হইয়াছে—উলা বেলেঘাটা প্রভৃতি গ্রাম সকল এক্ষণে কবির বর্ণিতস্থানে দেখিতে পাওয়াযায়না। এস্থলে ইহাও বোধহইতেছে যে, চুঁচুড়া, ফরাসডাঙ্গা, শ্রীরামপুর প্রভৃতি নগর সকল তৎকালে সমৃদ্ধ ছিলনা। কলিকাতা নগরীকেও লোকে যেরূপ আধুনিক মনে করে এবং ঐ আধুনিকত্বের প্রমাণস্বরূপ 'কালি-কাটা' বৃক্ষের যে গল্প রচনা করে, তাহা বাস্তবিক বলিয়া বোধহয় না; কারণ এক্ষণকার প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে কবিকঙ্কণের সময়েও কলিকাতা বর্ত্তমান ছিল এবং সে সময়ে ইঙ্গরেজেরা বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে আইসেন নাই।

কবিকঙ্কণের সময়ে সপ্তগ্রামের নিম্নবর্ত্তিনী সরস্বতীর প্রবাহ মন্দ হইয়া হুগলীর সমীপবাহিনী গঙ্গার প্রবাহ প্রবল হইলেও সপ্তগ্রামের সম্যক্ ধ্বংস ও হুগলীর তাদৃশ উন্নতি হয় নাই—হইলে কবি সপ্তগ্রামের অত সমৃদ্ধি বর্ণন করিতেন না এবং হুগলীর কথাও কিছু না কিছু উল্লেখ করিতেন। কলিকাতার দক্ষিণ খিদিরপুর ও কালীঘাটের নিকট দিয়া গঙ্গার যে প্রবাহ গিয়াছে—লোকে যাহাকে এক্ষণে আদিগঙ্গা কহে—

তৎকালে উহাই প্রবল ছিল। কারণ কবি, মুচিখোলার নিম্নস্থ কাটি-গঙ্গাকে 'হিজলির পথ' বলিয়া পরিত্যাগ করত কালীঘাটের নিম্নস্থ গঙ্গাদিয়াই সওদাগরদিগের নৌকাগুলি চালাইয়াছিলেন। তৎপরে মগরা হইতে সিংহল পর্য্যন্ত পথের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং ঐ পথিমধ্যস্থ যে সকল স্থান ও হ্রদাদির বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহার সমুদয় বাস্তবিক বলিয়া বোধহয় না। বোধ হয় কবি—

ফিরিঙ্গীর দেশখান বাহে কর্ণধারে। রাত্রিদিন বহেযায় হারামদের ডরে॥

এই উক্তিদ্বারা পূর্ব্বদক্ষিণাঞ্চলস্থিত পোর্ত্তুগীজদিগকে ফিরিঙ্গীশব্দ দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এবং তাহারা তৎকালে অত্যন্ত উপদ্রব করিত বলিয়া তাহাদিগকে 'হারাম' অর্থাৎ (পারসিভাগায়) দুষ্ট লোক বলিয়াছিলেন।

ফিরিঙ্গী দেশ হইতে দক্ষিণাভিমুখে সমুদ্রে গমন সময়ে পথিমধ্যে পুরী অর্থাৎ ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার কীর্ত্তিস্থান পাওয়া, কালিয়াদহ নামক হ্রদে উপস্থিত হওয়া ও তথায় কমলে কামিনী সন্দর্শন করা প্রভৃতি অনেক রমণীয় বিষয় বর্ণিত আছে। ঐ বর্ণনে ইহা প্রকাশ পাইতেছে যে, আমরা এক্ষণে একই দ্বীপকে সিংহল বা লঙ্কা বলিয়াথাকি, কিন্তু কবির সেরূপ বোধ ছিলনা—তিনি উহাদিগকে পৃথক্ দ্বীপ বোধ করিতেন। যাহাহউক তত প্রাচীন সময়ে অত দূরবর্ত্তী দেশের ভৌগোলিকবিবরণ-বর্ণনে ভ্রম হইলেও কবির কবিত্বের হানি হয়না। প্রাচীনকালের অনেক কবিরই ওরূপ ভ্রম হইয়াছে। বানরদিগকে সীতার অন্বেষণার্থ দিগ্‌দিগন্তে প্রেরণ করিবার সময় মহর্ষি বাল্মীকিও সেরূপ ভ্রমের হস্তহইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীপাঠ করিলে ৩০০ বৎসরের পূর্ব্বে আমাদের সামাজিক রীতিনীতি যাহাছিল, তাহারও অনেক বিবরণ জানিতে পারাযায়। এক্ষণে রাঢ়ীয় কুলীনসন্তানদিগের যেরূপ বহুবিবাহ আছে; এবং পুরাণের যেরূপ কথকতা করা আছে, কবিকঙ্কণের সময়েও এসকলই প্রায়

এইরূপই ছিল, অধিকন্তু পাঁশক্রীড়াটী সেসময়ে বোধ হয় কিছু অধিক ছিল। কবি অনেকস্থলেই, এমনকি, স্ত্রীজাতির মধ্যেও ঐ ক্রীড়ার অনেকবার বর্ণন করিয়াছেন। বোধহয় ঐ সময়ে কামিনীদিগের শাটী পরিধানকরা, অথবা অধোংশুকও উত্তরীয় ব্যবহারকরা দুই রীতিই কিছু কিছু ছিল। যেহেতু কবি ঐ দুই রীতিরই বর্ণন করিয়াছেন। কাঁচুলি ব্যবহার তৎকালে অনেকেই করিত।

এই গ্রন্থে ধর্ম্মকেতু, নীলাম্বর, কালকেতু, মুরারিশীল, ভাঁড়ুদত্ত, বিক্রমকেশরী, লক্ষপতি, ধনপতি, মালাধর, শ্রীমন্ত, শালবাণ, অগ্নিশর্ম্মা; নিদয়া, ছায়াবতী, রম্ভাবতী, দুর্ব্বলা, লীলাবতী, সুশীলা, জায়াবতী, প্রভৃতি পুরুষ ও স্ত্রীগণের যে সকল কল্পিত নামধেয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা তাহাদের জাতি ধর্ম্ম ও ব্যবসায়ের অনুরূপই হইয়াছে। ফুল্লরা, খুল্লনা, লহনা, এ সকলনামও যদৃচ্ছাপ্রযুক্ত বোধহয়না। ইহাদেরও অনুরূপ অর্থ আছে—ফুল্লরা—ফুল্ল (=প্রফুল্ল=স্পষ্ট) রা (=রব) যাহার—মাংসবিক্রয়ার্থ পাড়ায় পাড়ায় দীর্ঘস্বরে চীৎকার করিবার জন্য ব্যাধকামিনীর উচ্চস্বর থাকা গুণাবহ ভিন্ন সদোষ বোধহয়না, সুতরাং ফুল্লরানাম নিরর্থক নহে। খুল্ল শব্দ নখীনামক এক উৎকৃষ্টগন্ধদ্রব্যবাচক; তদ্বিশিষ্টা স্ত্রী—খুল্লনা;—গন্ধবণিক্‌জাতীয় বালিকার গন্ধদ্রব্যসম্বলিত নামহওয়া অসঙ্গত নহে। লহনা শব্দে পারস্যভাষায় বিপদ্=দায়=ঝঞ্ঝাট্;—ঐ স্ত্রীর যেরূপ স্বাভাবাদি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে ধনপতি উহাকে লইয়া বিলক্ষণ দায়ে পড়িয়াছিলেন, বলিতে হইবে। সুতরাং উহার 'লহনা' নাম সার্থক হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে যে সকল কাব্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে পয়ার ও ত্রিপদী ভিন্ন আর কোন ছন্দ, নাই বলিলেই হয়। কিন্তু চণ্ডীকাব্যে ঐ দুই ছন্দ ব্যতিরিক্ত ঝাঁপতাল, ভঙ্গপয়ার, ভঙ্গত্রিপদী একাবলী এবং আরও ২ | ১টী নূতন ছন্দ আছে। তদ্ভিন্ন জয়দেবের ন্যায়—

"দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু" ॥ "দিদি গো এবে বড় সঙ্কট পরাণ" ॥

"কোটাল! খানিক জীবন রাখ"

ইত্যাদিরূপ ধুয়া এবং ধান্‌শী, কামোদ, পঠমঞ্জরী প্রভৃতি অনেক রাগ-রাগিণীরও উল্লেখ মধ্যে মধ্যে আছে। পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী ছন্দই পয়ার বা ত্রিপদীর রূপান্তর মাত্র—কোনটীই উহাহইতে ভিন্নপ্রকৃতিক নহে। অতএব বোধহয় কবি, পয়ার ও ত্রিপদী লিখিতে লিখিতেই, যদৃচ্ছাক্রমে অক্ষর বাড়াইয়া বা কমাইয়াও কর্ণে মিষ্ট লাগাতে, ঐ সকল নূতন ছন্দের সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহাহউক, ইহার পূর্ব্বোল্লিখিত কাব্যসকলের ছন্দে যতিভঙ্গ ও অক্ষরগণনার বৈষম্য প্রভৃতি যে সকল দোষ দৃষ্টহয়, চণ্ডীকাব্যের ছন্দেও সেসকল দোষ নাই এমত নহে, তবে অপেক্ষাকৃত বিরল।

কবিকঙ্কণ, বর্ণিত নায়কনায়িকা প্রভৃতির চরিত্রগুলি প্রায় সকলস্থলেই যথাযথরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, সত্য বটে; কিন্তু কয়েকটী স্থলে তাহাদের কার্য্য ও আচার ব্যবহার অত্যুক্তিদূষিত ও অনৈসর্গিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কালকেতুব্যাধের ভোজন, পুরাণবর্ণিত রাক্ষসের ভোজনের ন্যায়—সুতরাং অসঙ্গত। খুল্লনা, অতবড় ধনবান্ লোকের পত্নী হইয়াও যে, গুণ চট পরিয়া একাকিনী বনে বনে ছাগল চরাইয়া বেড়াইল,—জ্ঞাতিবন্ধু কেহ আসিয়া নিবারণ করিল না, তাহার মাতা রম্ভাবতী কন্যার দুরবস্থার সংবাদ পাইয়াও তত্ত্ব লইল না!—ইহা বড় বিসদৃশ কার্য্য। যখন্ খুল্লনার বয়স ১২। ১৩ বৎসর বৈ নহে, যখন্ সে পতিসহবাস করেই নাই, তখনও তাহার বিদেশ প্রত্যাগত-পতির শয়নগৃহে যাইবার জন্য দিবাভাগহইতে ব্যগ্রতাপ্রকাশকরা—যাইবার সময়ে সপত্নীর সহিত নির্লজ্জতাসহকারে বাগ্বিতণ্ডা করা, নিদ্রিত পতিকে মৃতবোধ করিয়া ক্রন্দন করিতে বসা, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পতির সহিত পাশক্রীড়া করিতে চাহা—এ সকলগুলিই অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। তদ্ভিন্ন দ্বাদশবর্ষমাত্রবয়স্ক শ্রীমন্তের সিংহলে গমন এবং তথায় বিবাহের পর শালী শালাজ প্রভৃতির সহিত সেই সেই রূপ পরিহাসবাক্য সঙ্গত হয়না।

কবিকঙ্কণের রচনা প্রগাঢ় রসাবির্ভাবক, ভাবপূর্ণ ও সুমধুর হইলেও

কৃত্তিবাসের রচনার ন্যায় আদ্যোপান্ত প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য নহে। ইহার স্থানে স্থানে অনেক দুরূহ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ আছে। তদ্ভিন্ন কবির স্বপ্রদেশপ্রচলিত ভূরি ভূরি এত অপভ্রংশশব্দের ব্যবহার আছে, যাহাদের অর্থ—এবং যাহাদের সংযোগ থাকাতে, সেই সেই বাক্যের অর্থ—সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারাযায়না, সুতরাং তত্তৎস্থলে রসভঙ্গ হইয়া পড়ে। আমরা খুব রাঢ় অঞ্চলের লোকদিগকেও জিজ্ঞাসা করিয়া বাকুড়ি, পাইকালা, কলন্তর, বুহিতাল, ইত্যাদি শব্দের কোনরূপ অর্থ বাহির করিতে পারি নাই। কিন্তু এস্থলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এসকল দোষ—অতি সামান্য এবং অবশ্যই উপেক্ষিত হওয়া উচিত।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীকাব্যভিন্ন আর কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কিনা, তাহা জানিবার উপায় নাই; কিন্তু শিশুবোধকের গঙ্গাবন্দনায় কবিকঙ্কণের ভণিতি আছে; উহা চণ্ডীকাব্যস্থ গঙ্গাবর্ণন হইতে বিভিন্নরূপ। কবিকঙ্কণ ঐ প্রবন্ধটী পৃথক্ লিখিয়াছিলেন; কি উহা অন্য কোন গ্রন্থের অভ্যন্তরে ছিল, তাহা নিরূপিত হইবার যো নাই। যাহাহউক, আমরা এ বিষয়ের আর বাহুল্য না করিয়া এক্ষণে পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ চণ্ডীকাব্যের কয়েকটী অংশ নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

অঙ্গুরীয় ভাঙ্গাইবার জন্য বণিকের নিকট কালকেতুর গমন।

বেণে বড় দুষ্টশীল, নামেতে মুরারি শীল, লেখা জোখা করে টাকা কড়ি।
পাইয়া বীরের সাড়া, প্রবেশে ভিতর পাড়া, মাংসের ধারয়ে দেড় বুড়ি॥—
খুড়া খুড়া ডাকে কালকেতু।—
কোথাহে বণিক্‌রাজ, বিশেষ আছয়ে কাজ, আমি আইলাম সেইহেতু॥
বীরের বচন শুনি, আসিয়া বলে বেণ্যানী, আজি ঘরে নাহিক পোদ্দার।
প্রভাতে তোমার খুড়া, গিয়াছে খাতকপাড়া, কালি দিবে মাংসের উধার॥—
আজি কালকেতু যাহ ঘর।—
কাষ্ঠ আন এক ভার, হাল বাকী দিব ধার, মিষ্ট কিছু আনিহ বদর॥

শুন গো শুন গো খুড়ী, কিছু কার্য্য আছে দেড়ী, ভাঙ্গাইব একটী অঙ্গুরী।
আমার জোহার খুড়ী, কালি দেহ বাকী কড়ী, অন্ত বণিকের যাই বাড়ী॥—
বাপা এক দণ্ড কর বিলম্বন।
সহাস্য বদনে বাণী, বলে বেণে নিতম্বিনী, দেখি বাপা অঙ্গুরী কেমন॥
ধনের পাইয়া আশ, আসিতে বীরের পাশ, ধায় বেণে খিড়কীর পথে।
মনে বড় কুতুহলী, কান্ধেতে কড়ীর থলী, হড়পী তরাজু করি হাতে॥—
করে বীর বেণেরে জোহার।
বেণে বলে ভাইপো, এবে নাহি দেখি তো, এতোর কেমন ব্যবহার॥
খুড়া! উঠিয়া প্রভাত কালে, কাননে এড়িয়া জালে, হাতে শর চারি প্রহর ভ্রমি।
ফুল্লরা পসরা করে, সন্ধ্যাকালে যাই ঘরে, এই হেতু নাহি দেখ তুমি॥—
খুড়া ভাঙ্গাইব একটী অঙ্গুরী—
হয়ে মোরে অনুকূল, উচিত করিও মূল, তবে সে বিপদে আমি তরি॥
বীর দেয় অঙ্গুরী, বাণিয়া প্রণাম করি, জোঁখে রত্ন চড়ায়্যে পড়্যান।
কুঁচ দিয়া করে মান, ষোল রতি দুই ধান, শ্রীকবি কঙ্কণ রস গান॥

সোণা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল। ঘষিয়া মাজিয়া বাপা করেছ উজ্জ্বল॥
রতি প্রতি হইল বীর দশগণ্ডা দর। দু ধানের কড়ি আর পাঁচগণ্ডা ধর॥
অষ্টপণ পঞ্চগণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি। মাংসের পিছিলা বাকী ধারি দেড় বুড়ি॥
একুনে হইল অষ্টপণ আড়াই বুড়ি। কিছু চালু চালুখুদ কিছু লহ কড়ি॥
কালকেতু বলে খুড়া মূল্য নাহি পাই। যে জন অঙ্গুরী দিল দিব তাঁর ঠাঁই॥
বেণে বলে দরে বাড়াইলাম পঞ্চবট। আমা সঙ্গে সওদা কর না পাবে কপট॥
ধর্ম্মকেতু ভায়া সঙ্গে ছিল নেনা দেনা। তাহা হইতে দেখি বাপা বড়ই সেয়ানা॥
কালকেতু বলে খুড়া না কর ঝগড়া। অঙ্গুরী লইয়া আমি যাই অন্য পাড়া॥
বেণে বলে দরে বাড়াইলাম আড়াই বুড়ি। চালু খুদ না লইও গণে লও কড়ি॥
হাত বদল করিতে বেণের হলো মনে। পদ্মাবতী সঙ্গে চণ্ডী হাসেন গগনে॥

ফুল্লরার বারমাস বর্ণন।

বসিয়া চণ্ডীর পাশে কহে দুঃখ বাণী। ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর তালপাতের ছাউনি॥
ভেরেণ্ডার খুঁটী তার আছে মধ্য ঘরে। প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে॥

বৈশাখে বসন্ত ঋতু খরতর খরা। তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা॥
পদ পোড়ে খরতর রবির কিরণ। শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঞ্চার বসন॥
বৈশাখ হইল বিষ—বৈশাখ হইল বিষ। মাংস নাহি খায় লোকে করে নিরামিষ॥
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস প্রচণ্ড তপন। রবিকরে করে সর্ব্বশরীর দাহন॥
পসরা এড়িয়ে জল খাইতে না পারি। দেখিতে দেখিতে চিলে করে আধাসারি॥
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস—পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস। বঁইচির ফল খেয়ে করি উপবাস॥
আষাঢ়ে পূরয়ে মহী নবমেঘজল। বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল॥
মাংসের পসরা লয়ে ভ্রমি ঘরে ঘরে। কিছু খুদ কুঁড়া মিলে উদর না পূরে॥
বড় অভাগ্য মনে গণি—বড় অভাগ্য মনে গণি। কত শত খায় জোঁক নাহি খায় ফণী॥
শ্রাবণে বরিষে মেঘ দিবস রজনী। সিতাসিত দুই পক্ষ কিছুই না জানি॥
মাংসের পসরা লয়ে ফিরি ঘরে ঘরে। আচ্ছাদন নাহি গাত্রে স্নান বৃষ্টিনীরে॥
দুঃখে কর অবধান—দুঃখে কর অবধান। লঘু বৃষ্টি হইলে কুঁড়ায় আইসে বান॥
ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল। নদ নদী একাকার আট দিকে জল॥
কত নিবেদিব দুখ—কত নিবেদিব দুখ। দরিদ্র হইল স্বামী বিধাতা বিমুখ॥
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজনে। ছাগল মহিষ মেষ দিয়া বলিদানে॥
উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা। অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা॥
কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে। দেবীর প্রসাদ মাংস সবাকার ঘরে॥
কার্ত্তিক মাসেতে হয় হিমের জনম। করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ॥
নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড়। অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়॥
দুঃখে কর অবধান—দুঃখে কর অবধান। জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ॥
মাস মধ্যে মার্গশীর্ষ নিজে ভগবান। হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান॥
উদর পূরিয়া অন্ন দৈবে দিল যদি। যম সম শীত তাহে নিরমিল বিধি॥
অভাগ্য মনে গণি—অভাগ্য মনে গণি। পুরাণ দোপাটা গায় দিতে টানাটানি॥
পৌষেতে প্রবল শীত সুখী সর্ব্বজন। তুলা তনূনপাৎ তৈল তাম্বূল তপন॥
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ। অভাগী ফুল্লরা মাত্র শীতের ভাজন॥
হরিণ বদলে পাই পুরাণ খোসলা। উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলা॥
বৃথা বনিতা জনম—বৃথা বনিতা জনম। ধূলি ভয়ে নাহি মেলি শয়নে নয়ন॥
নিদারুণ মাঘমাস সদাই কুজ্ঝটী। আন্ধারে লুকায় মৃগ না পায় আখেটী॥

ফুল্লরার আছে কত কর্ম্মের বিপাক। মাঘমাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক॥
নিদারুণ মাঘমাস—নিদারুণ মাঘমাস। সর্ব্বজন নিরামিষ কিম্বা উপবাস॥
সহজে শীতল ঋতু এ ফাল্গুন মাসে। পীড়িত তপস্বিগণ বসন্তবাতাসে॥
শুন মোর বাণী রামা—শুন মোর বাণী। কোন্ সুখে আমোদিতা হইবে ব্যাধিনী।
ফাল্গুনে দ্বিগুণ শীত খরতর খরা। ক্ষুদসেরে বান্ধা দিনু মাটিয়া পাথরা॥
কত বা ভুগিব আমি নিজ কর্ম্মফল। মাটিয়া পাথর বিনা না ছিল সম্বল॥
দুঃখে কর অবধান—দুঃখে কর অবধান। আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান॥
মধুমাসে মলয় মারুত মন্দমন্দ। মালতীর মধুকর পিয়ে মকরন্দ॥
বনিতা পুরুষ দোহে * *। ফুল্লরার অঙ্গ পোড়ে উদরদহনে॥
দারুণ দৈবদোষে—দারুণ দৈবদোষে। একত্র শয়নে স্বামী যেন ষোল কোশে॥

সিংহলে কোটালের নিকট শ্রীমন্তের স্তুতি।

কাঁকালে নাএর দড়া পিঠে মারে ঢেকা। দিবস দুপরে হৈল সাত নায়ে ডাকা॥
সবিনয়ে বলে সাধু কোটালের পদে। খানিক সদয় হও বিষম বিপদে॥
শ্রীমন্তের ছিল কিছু গুপ্তভাবে ধন। ঘুষ দিয়া কোটালের তুষিলেক মন॥
ধন পেয়ে কালুদণ্ড সরসবদন। শ্রীমন্ত তাহারে কিছু করে নিবেদন॥
স্নান দান করি যদি দেহ অনুমতি। হাসিয়া ইঙ্গিত তারে কৈল নিশাপতি॥
সরোবর বেড়ি রহে পাইকের ঘটা। স্নান করি করে গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা॥
যব তিল কুশ নিল করেতে তুলসী। তর্পণে সন্তোষ সাধু কৈল দেবঋষি॥
তর্পণের জল লহ পিতা ধনপতি। মসানে রহিল প্রাণ বিড়ম্বে পার্ব্বতী॥
তর্পণের জল লহ খুল্লনা জননি। এ জনমের মত ছিরা মাগিল মেলানি॥
তর্পণের জল লহ খেলাবার ভাই। উজানি নগরে দেখা আর হবে নাই॥
তর্পণের জল লহ দুর্ব্বলা পুষিনী। তব হস্তে সমর্পণ করিনু জননী॥
তর্পণের জল লহ জননীর মা। উজানি নগরে আমি আর যাবনা॥
তর্পণের জল লহ লহনা বিমাতা। তব আশীর্ব্বাদে মোর কাটা যায় মাতা॥
সবাকারে সমর্পণ করিনু জননী। এ জনমের মত ছিরা মাগিল মেলানী॥

প্রহেলিকা।

বিধাতানির্ম্মিত ঘর নাহিক দুয়ার। যোগীন্দ্র পুরুষ তাহে রহে নিরাহার॥
যখন্ পুরুষ সেই হয় বলবান্। বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে খান খান॥ ১॥ ডিম্ব।

বিষ্ণুপদ সেবা করে বৈষ্ণব সে নয়। গাছের পল্লব নয় অঙ্গে পত্র হয় ॥
পণ্ডিতে বুঝিতে পারে দুচারি দিবসে। মুর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে ॥২॥ পক্ষী।
তরু নয় বনে রয় নাহি ধরে ফুল। ডাল পল্লব তার অতি সে বিপুল ॥
পবনে করিয়া ভর করয়ে ভ্রমণ। বনেতে থাকিয়া করে বনের ধ্বংসন ॥ ৩ ॥ পানা।

মনসার ভাসান।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীরচনার কিছুকাল পরেই বোধহয় ক্ষেমানন্দ ও কেতকা দাস দুই জনে মিলিত হইয়া মনসার ভাসান রচনা করেন। ইহাঁরা দুইজনেই কায়স্থকুলোদ্ভব ছিলেন, কিন্তু কোথায় ইহাঁদের নিবাস ছিল, বা কোন্ সময়ে ইহাঁরা গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন, তাহার স্থির নিশ্চয় নাই। কিন্তু ইহাঁরা বেহুলাকে গাঙ্গুরের জলে ভাসাইয়া ত্রিবেণী পর্য্যন্ত পাঠাইবার সময়ে গোবিন্দপুর, বর্দ্ধমান, গঙ্গাপুর, হাসনহাটী, নারিকেলডাঙ্গা, বৈদ্যপুর, গহরপুর প্রভৃতি বর্দ্ধমান জিলাস্থ গ্রাম সকলের যেরূপ নামোল্লেখ করিয়াছেন, অন্য জিলাস্থ গ্রামের সেরূপ নাম করিতে পারেন নাই। ইহাতে বোধহয় বর্দ্ধমানজিলার মধ্যস্থ কোন গ্রামেই ইহাঁদের বাস ছিল। যাহাহউক ইহাঁদের দুইজনের কেহই গণনীয় কবি ছিলেননা। তবে ইহাঁদের গ্রন্থ পুরাতন ও বহুজনপ্রসিদ্ধ এবং সেই গ্রন্থ অবলম্বনকরিয়া মনসার গান রচিত হইয়াছে এবং গায়কেরা নায়কের বাটীতে চামর মন্দিরাসহযোগে তাহা গানকরিয়াথাকে, এই জন্যই ইহার বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক।

এই গ্রন্থের সঙ্ক্ষিপ্ত উপাখ্যান এই যে, চম্পাইনগরনিবাসী চাঁদসওদাগরনামক এক গন্ধবণিক্ মনসাদেবীর প্রতি অত্যন্ত দ্বেষ করিতেন, এই জন্য মনসার কোপে তাঁহার ছয় পুত্র নষ্ট হয় এবং তিনিও নিজে বাণিজ্যে গমন করিয়া সমুদয় পণ্যদ্রব্য হারাইয়া বহুবিধ ক্লেশ পান,

তথাপি মনসাদেবীকে গালিদিতে নিবৃত্ত হন না। পরিশেষে নখিন্দর নামে সওদাগরের এক পুত্র জন্মে এবং নিছনিনগরবাসী সায়বেণের কন্যা বেহুলার সহিত সেই পুত্রের বিবাহ হয়। মনসাদেবীর কোপে বিবাহ-রাত্রিতেই সর্পাঘাতে নখিন্দরের মৃত্যু হইবে, ইহা পূর্ব্বে জানিতেপারিয়া চাঁদসওদাগর সাতাই পর্ব্বতের উপরিভাগে তাহার নিমিত্ত লৌহময় বাসরঘর প্রস্তুতকরিয়া রাখেন। মনসার সহিত বাদ সহজ কথা নহে! বরকন্যা রাত্রিতে তথায় যাইয়া শয়ন করিলেও সর্পাঘাতে নখিন্দরের মৃত্যু হয়। বেহুলা কলার মান্দাসের উপর সেই মৃতপতি ক্রোড়ে লইয়া ভাসিতে ভাসিতে ছয়মাসে ত্রিবেণীপর্য্যন্ত গমন করেন এবং তথায় নেত ধোবানীর সাহায্যে সুরপুরে গমন করত নৃত্যদ্বারা দেবতাদিগকে প্রীত করিয়া পতির জীবনলাভ করান। চাঁদসওদাগর মনসার পূজা করিতেন না, তাঁহাকে 'চেঙ্গমুড়ী কাণী' বলিয়া গালি দিতেন, হেঁতালের লাঠী লইয়া প্রহার করিতে যাইতেন, এই জন্যই তাঁহার উপর মনসার রাগ। এক্ষণে সওদাগর আর তাঁহার দ্বেষ করিবেন না—পূজা করিবেন, বেহুলার নিকটে এইরূপ দৃঢ় আশ্বাস পাইয়া দেবী সওদাগরের পূর্ব্বনষ্ট ছয় পুত্রকেও বাঁচাইয়া দিয়া জলমগ্ন সমস্ত ধনও বহিত্রসমেত উদ্ধার করিয়া দেন। বেহুলা, বহিত্রসমেত সেই সমগ্র ধনসম্পত্তি, পুনর্জীবিত পতি ও ভাসুরদিগকে সঙ্গে লইয়া দেশে আগমন করিলে মনসাদেবীর পূজাপ্রচার হয়।

এই উপাখ্যানের প্রকৃত মূল কি? তাহা বলিতে পারাযায় না, কিন্তু দেখিতেপাওয়াযায়যে, অদ্যাপি ত্রিবেণীর বান্ধাঘাটের কিঞ্চিৎ উত্তরে "নেত ধোবানীর পুকুর" নামে একটী প্রাচীনপুষ্করিণী আছে—পূর্ব্বোক্ত বৈদ্যপুর হাসন্‌হাটী নারিকেলডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামগুলির নিম্নদিয়া যে সামান্য নদীটী আছে, তাহাকে লোকে "বেহুলা নদী" বলে এবং বর্দ্ধমানের প্রায় ১৬ ক্রোশ পশ্চিমে চম্পাইনগর নামক পর-

গণার মধ্যে চম্পাইনগরনামক একটী গ্রামও আছে। ঐ গ্রামে চাঁদসওদাগরের বাটী ছিল, একথা তত্রত্য লোকে বলিয়াথাকে। ঐ গ্রামের নিকটে তৃণগুল্মাচ্ছন্ন একটী উচ্চভূমি আছে; ঐ ভূমি নখিন্দরের লোহার বাসর বলিয়া প্রসিদ্ধ। অদ্যাপি তত্রত্য লোকদিগের মনে এরূপ বিশ্বাস আছে যে, তথায় কোন গন্ধবণিক্ পাক করিয়া খাইতে পারে না। পাকের জন্য চুল্লী খনন করিলেই সর্প বহির্গত হইয়া তাহাকে দংশন করে! ফল কথা, ঐ স্থানে একজাতীয় সর্পও প্রচুরপরিমাণে আছে। তাহাদের চক্র নাই—বোধহয় বিষও নাই। উনানের ভিতর, জলের কলসীর তলায়, বিছানার মধ্যে, পাদুকার অভ্যন্তরে সর্ব্বদাই তাহাদিগকে দেখিতেপাওয়াযায়। তাহারা পার্য্যমাণে কাহাকেও দংশন করে না,—করিলে দষ্টব্যক্তির হস্ত পদ বন্ধনকরিয়া সমীপস্থ মনসার বাটীতে কিয়ৎক্ষণ ফেলিয়া রাখিলেই সে আরোগ্যলাভ করে—নচেৎ মরিয়াযায়, ইহাই তত্রত্য লোকের বিশ্বাস।

বেহুলার উপাখ্যান কবিদিগের স্বকপোলকল্পিত বলিয়া বোধহয়না। বোধহয় প্রাচীনপরম্পরাগত কোন মূল ছিল, কবিরা তাহাই অবলম্বনকরিয়া কবিকঙ্কণের চণ্ডীর অনুকরণে এই গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—কিন্তু প্রকৃত কবিত্বশক্তি, সহৃদয়তা ও বহুজ্ঞতার অভাবে তাদৃশ কৃতকার্য্য হইতেপারেন নাই। বাণিজ্যার্থবহির্গত চাঁদসওদাগরের নৌকাতে ঝড় বৃষ্টি, বাঙ্গাল মাঝিদিগের খেদ, নখিন্দরবেহুলার বিবাহ, বিশ্বকর্ম্মাদ্বারা বাসরগৃহনির্ম্মাণ, কলার মান্দাসে বেহুলার ভাসিয়া যাইবার সময়ে নদীর উভয়তীরস্থ গ্রাম ও নগরের নামোল্লেখ, বেহুলার সুরপুরে নৃত্য ও জলমগ্ন ডিঙ্গার পুনরুদ্ধারপ্রভৃতি বর্ণনসকল অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠকরিলে এই গ্রন্থকে চণ্ডীর অনুকৃতি ভিন্ন আর কিছুই বোধহয়না। কিন্তু চণ্ডীতে ধনপতি ও শ্রীমন্তের বাণিজ্যযাত্রা সময়ে নদীর উভয়তীরস্থ গ্রামনগরাদির বর্ণনা যেরূপ মনোহর ও অনেক দূরপর্য্যন্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে—বিচার্য্যমাণ গ্রন্থের বর্ণনা

সেরূপ কিছুই হয়নাই—বিশেষতঃ গ্রামনগরাদির স্থানসন্নিবেশগুলি নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল বোধহয়। যাহাহউক চণ্ডীতে ধনপতি লক্ষপতি সাধুদত্ত শঙ্খদত্ত চাঁদসওদাগর প্রভৃতি যে সকল গন্ধবণিকের বিবরণ ও নামোল্লেখ আছে, মনসার ভাসানেও তাহাদেরই বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদ্বারা অনুমানকরা যাইতেপারে যে, চণ্ডীরচনার বড় অধিক পরে মনসার ভাসান রচিত হয়নাই।

এই উপাখ্যানবর্ণন সর্ব্বাঙ্গসঙ্গত ও সহৃদয়তার প্রকাশক না হউক, কিন্তু ইহাতে বেহুলার চরিত্র যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা পতির নিমিত্ত সতীর দুঃখভোগবর্ণনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। স্ফীত গলিত কীটাকুলিত পূতিগন্ধি মৃতপতিকে ক্রোড়ে লইয়া নির্ব্বিকারচিত্তে ও নির্ভয়মনে বেহুলার মান্দাসে যাত্রা ভাবিতেগেলে সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সতীগণের পতিনিমিত্তক সেই সেই ক্লেশভোগও সামান্য বলিয়া বোধহয়, এবং বেহুলাকে পতিব্রতার পতাকা বলিয়া গণ্য করিতে ইচ্ছা হয়।

মনসার ভাসানের ভাষা তত সুললিত বা সুশ্রব্য নহে। ইহাতে পয়ার লঘু ও দীর্ঘ ত্রিপদী এবং গজপতি এই কয়েকটীমাত্র ছন্দ আছে। ছন্দেরও বর্ণ বৈষম্য যতিভঙ্গ প্রভৃতি দোষ অনেকস্থলেই লক্ষিত হয়। স্থানে স্থানে রচনা বিলক্ষণ মধুরও বোধহয়। পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ গ্রন্থরচয়িতা দুই কবির দুইটী রচনা উদ্ধৃত হইল।

চাঁদসওদাগরের নৌকায় ঝড় বৃষ্টি।

দেবীর আজ্ঞায়, হনুমান ধায়, শীঘ্র লয়ে মেঘগণ।
পুষ্কর দুষ্কর, আইল সত্বর, করিতে ঝড় বর্ষণ॥
আসি কালীদয়ে, করিল উদয়ে, ডুবাতে সাধুর তরি।
বীর হনুমান, অতি বেগবান, করিবারে ঝড় বারি॥
অবনী আকাশে, প্রখরবাতাসে, হৈল মহা অন্ধকার।
গঠিয়া গাবর, নায়ের নফর, নাহিক দেখে নিস্তার॥

গজ শুণ্ডাকার, পড়ে জলধার, ঘন ঘোর তর্জ্জে গর্জ্জে।
মনে পাইয়া ডর, বলে সওদাগর, যাইতে নারিনু রাজ্যে॥
হুড় হুড় হুড়, পড়িছে, চিকুর, বেগে যেন ধায় গুলি।
বলে কর্ণধার, নাহিক নিস্তার, ভাঙ্গিল মাথার খুলি॥
দেখিতে অদ্ভুত, হইছে বিদ্যুৎ, ছাইল গগনের ভানু।
বিপদ গণিয়া, বলিছে বেণিয়া, কেন বা বাণিজ্যে আনু॥
তরী সাতখান, চাপি হনূমান, চক্রবৎ দেয় পাক।
ঘন ঘন ঝড়ে, ছৈ সব উড়ে, প্রলয় পবনের ডাক॥
কুম্ভীর, হাঙ্গর আইল বিস্তর, তরীর আশে পাশে ভাসে।
চলে ডিঙ্গা লয়ে, রাথে পাক দিয়ে, অহি ধায় গিলিবার আশে॥
ডিঙ্গার নফর, গ্রাসিল, হাঙ্গর, কাছি গিলিল মাছে।
চাপিয়া তরণী, হনূমান আপনি, হেলায়ে দোলায়ে নাচে॥
ডুবাইয়া নায়, চান্দ জল খায়, জগাতীর খলখল হাস।
জয় জয় মনসা, মা তুমি ভরসা, রচিল কেতকা দাস॥

পতিশোকে বেহুলার রোদন।

কালিনী খাইল পতি। প্রাণনাথ কোলে সতী॥
কি হইল কি হইল মোরে। প্রভু কেন হেন করে॥
কনক চাঁদের দুর্গতি। মলিন হইল ভাতি॥
বদনে নাহিক বাণী। অভাগিনী কিবা জানি॥
নরলোকে করে বা কি। বেহুলা বেণ্যের ঝি॥
কপালে কি মোর ছিল। বিভা রাত্রে পতি মৈল॥
মঙ্গল বিভার নিশী। মুখ যার পূর্ণ শশী॥
খাইনু আপন পতি। কে মোরে বলিবে সতী॥
বদনে বদন দিয়া। নয়নে নয়ন দিয়া॥
চরণ যুগল ধরি। ক্ষণে ক্ষণে কান্দে ঝুরি॥
কখন শ্রবণ মূলে। মোরে সঙ্গে লহ বলে॥
তুমি আমার গুণমণি। তোমা বিনা কিবা জানি॥
কাতর হইয়া রামা। কান্দিলেন নাহি ক্ষমা॥
করুণা করিয়া কান্দে। কেশপাশ নাহি বান্দে॥

আমি হইনু পতিসঙ্গী। বাসরে হইনু রাণ্ডী॥
ক্ষেমানন্দ কহে কবি। রাজীবে রাখিবে দেবি॥

কাশীরাম দাসের মহাভারত।

পূর্ব্ববর্ণিত কবিদিগের কয়েকখানি গ্রন্থ রচনার পরেই বোধহয় কাশীরামদাস প্রাদুর্ভূত হইয়া বাঙ্গালামহাভারত রচনাকরেন। কাশী-রাম "দেব" উপাধি বিশিষ্ট কায়স্থজাতীয় ছিলেন। নিজরচনার অনেক-স্থানে তিনি এই উপাধির উল্লেখ করিছেন—

মহাভারতের কথা অমৃত অর্ণবে। পয়ার প্রবন্ধে রচে কাশীরামদেবে॥ ইত্যাদি।

কিন্তু দ্বিজভক্ত প্রাচীন কায়স্থেরা আপনাদিগকে 'দাস' বলিয়াই পরিচয় দিতে অধিক ভাল বাসিতেন, তদনুসারে ইনিও আপনার নাম কাশীরামদাস বলিয়াই সর্ব্বদা উল্লেখ করিয়াছেন। কাশীরাম আদিপর্ব্ব ও স্বর্গপর্ব্বের শেষভাগে—

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপরস্থিতি। দ্বাদশতীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিঙ্গিগ্রাম। প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র সুধাকর নাম॥
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা। কৃষ্ণদাসানুজ গঙ্গাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥

এই কয়েকটী শ্লোকদ্বারা আপনার যৎকিঞ্চিৎ যাহা পরিচয় দিয়াছেন, তদ্ভিন্ন তাঁহার জীবনবৃত্ত জানিবার বড় অধিক উপায় নাই। ঐ শ্লোক-দ্বারা স্থির হইতেছে যে, বর্দ্ধমান জেলার উত্তরভাগে ইন্দ্রাণীনামে এক পরগণা আছে; কাঁটোয়া নগর ঐ পরগণার অন্তর্গত। ঐ পরগণার মধ্যে ব্রহ্মাণী নদীর তীরসন্নিহিত সিঙ্গিনামক প্রসিদ্ধগ্রাম কাশীরামের বাসস্থান ছিল। তাঁহার প্রপিতামহের নাম প্রিয়ঙ্কর, পিতামহের নাম সুধাকর ও পিতার নাম কমলাকান্ত ছিল। কমলাকান্তের কৃষ্ণদাসাদি তিন পুত্র, তন্মধ্যে কাশীরাম তৃতীয় ছিলেন

কেহ কেহ লিখিয়াছেন, হুগলী জেলার অন্তঃপাতী ইন্দ্রাণীনামক স্থানে কাশীরামের বাসস্থান ছিল। ইহার প্রামাণ্যার্থ তাঁহারা কবিকঙ্কণের চণ্ডীতেও যে, ইন্দ্রাণীর কথা আছে, তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন যথা—

"মণ্ডনহাট ডাহিনে আছে, থাকিব হাটের কাছে, আনন্দিত সাধুর নন্দন।
সম্মুখে ইন্দ্রাণী, ভুবনে দুর্লভ জানি, দেব আইসে যাহার সদন॥ (১)
"ডাহিনে ললিতপুর বাহিল ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রেশ্বর পূজা কৈল দিয়া ফুলপানি"॥ (২)
"লহনা খুল্লনা কাছে মাগিল মেলানি। বাহিয়া অজয় নদী পাইল ইন্দ্রাণী"॥ (৩)

ইহার প্রথম শ্লোকে 'মণ্ডনহাট' নামক স্থানের যে উল্লেখ আছে,—মুদ্রিতপুস্তকে ঐ শব্দ "মণ্ডলঘাট" করিয়া ফেলিয়াছে। মণ্ডলঘাট হুগলীজেলার মধ্যে, সুতরাং তৎসন্নিহিত ইন্দ্রাণী অবশ্যই হুগলীজেলার মধ্যগত হইবে—এই বোধেই কয়েকমহাশয়, কাশীরামের বাটী হুগলীজেলায় ছিল, ইহা লিখিয়াছেন। কিন্তু বস্তুগত্যা তাহা নহে—যেহেতু কবিকঙ্কণের লিখিত চণ্ডীর পাঠ 'মণ্ডলঘাট' নহে 'মণ্ডনহাট'। ঐ মণ্ডনহাট ইন্দ্রাণীপরগণার মধ্যেই কাঁটোয়ার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে দেখিতে পাওয়াযায়। ঐ স্থানের সন্নিধানে ঘোষহাট, একাইহাট, বিকিহাট, পেৎনীহাট, ডাঁইহাট প্রভৃতি হাটশব্দান্ত ১৩টী গ্রাম আছে। অতএব কবিকঙ্কণের কয়েকস্থানে উল্লিখিত 'ইন্দ্রাণী' বর্দ্ধমানজেলাস্থ ঐ ইন্দ্রাণীকেই লক্ষ্য করিয়া লিখিত, তাহাতে সংশয় নাই। কাশীরাম পরিচয়দানস্থলে "ইন্দ্রাণীনামেতে দেশ" বলিয়াছেন, ইন্দ্রাণী গ্রাম বলেন নাই; সুতরাং তদ্দ্বারা ইন্দ্রাণীপরগণাই বুঝাইতেছে। তদ্ভিন্ন ঐস্থানে বারদুয়ারির ঘাট, গণেশমহাত্তার ঘাট, পীরের ঘাট প্রভৃতি গঙ্গার ধারে ধারে বারটী বাঁধাঘাট এবং ইন্দ্রেশ্বরনামক শিবস্থানের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই বিষয়ে তত্রত্য লোকদিগের মধ্যে একটী কথাও আছে যথা—

তের হাট, বার ঘাট, তিন চণ্ডী, তিন ঘর। এই যে বলিতে পারে তার ইন্দ্রাণীতে ঘর॥

কবি এই বারঘাটকেই লক্ষ্যকরিয়া যে, "দ্বাদশতীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী" এই কথা লিখিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মুদ্রিতপুস্তকের দোষে কাশীরামের বাসগ্রামবিষয়েও লোকের ভ্রম জন্মিয়াগিয়াছে। ঐ সকল পুস্তকে 'সিদ্ধি' গ্রাম লিখিত আছে, কিন্তু ইন্দ্রাণীর মধ্যে সিদ্ধিগ্রাম কুত্রাপি নাই—সিঙ্গিগ্রাম আছে, এবং ঐ গ্রামেই কাশীরামের বাস ছিল। আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, তত্রত্য লোকে বলিয়াথাকেন, ঐ সিঙ্গিগ্রামের দক্ষিণাংশে কাশীরামের বাসভবন ছিল—এক্ষণে সেই ভিটায় এক গন্ধবণিক্ বাস করে। তদ্ভিন্ন ঐ গ্রামে 'কেশে পুকুর' নামে একটী প্রাচীন পুষ্করিণী আছে, তাহাও কাশীরামের নিখাত বলিয়া প্রাচীনপরম্পরায় প্রসিদ্ধ। অতএব ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জেলা বর্দ্ধমানের ইন্দ্রাণীপরগণার অন্তর্ব্বর্ত্তী সিঙ্গিগ্রামেই কাশীরামের নিবাস ছিল। কাশীরামসংক্রান্ত কয়েকটী অলৌকিক উপাখ্যান তত্রত্য প্রাচীনলোকে অদ্যাপি বলিয়াথাকেন, বাহুল্যভয়ে ও অনাবশ্যক বোধে তাহা আর লিখিত হইল না।

একটী প্রবাদ আছে—

"আদি সভা বন বিরাটের কত দূর। ইহা রচি কাশীরাম যান স্বর্গপুর॥

কাশীরামের পুত্র পৌত্র ছিলনা, একমাত্র কন্যা। মহাভারতের আদি সভা বন ও বিরাটপর্ব্বের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত রচনা করিয়াই কাশীরামের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি প্রারব্ধ গ্রন্থের পরিসমাপনের নিমিত্ত ঐ কন্যার স্বামী নিজ জামাতার উপর ভারদিয়াযান। জামাতাও শ্বশুরের আদেশানুসারে সমস্ত গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করেন, কিন্তু স্বকীয় কবিকীর্ত্তিলাভের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া গ্রন্থের সর্ব্বত্রই শ্বশুরের নামসমেতই ভণিতি দিয়া যান। সুতরাং সমগ্র মহাভারতই কাশীরামদাসবিরচিত বলিয়া সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ হয়"।—কিন্তু এই প্রবাদ কতদূর সত্য, তাহা স্থির বলা যায় না। ইহার বিশ্বাসযোগ্য কোন মূল নাই—

রচনাগত কিছু বৈলক্ষণ্য আছে বটে, কিন্তু এরূপ কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না—যদ্দ্বারা ইহাকে প্রামাণিক বলিয়া বিশ্বাসকরাযাইতে পারে। বিশেষতঃ সিঙ্গির নিকটবর্ত্তী কোন আত্মীয় অনুগ্রহপূর্ব্বক এ বিষয়ে আমাদিগকে অনেকগুলি সংবাদ আনিয়া দিয়াছেন। তিনি সিঙ্গিগ্রামের অনেকের মুখে শুনিয়াছেন যে, "কাশীরাম আদি সভা বন ও বিরাটের কিয়দ্দূর লিখিয়া ৺ কাশীধাম যাত্রা করেন, সেই জন্যই তিনি উক্ত স্থানের স্বর্গোপমতা প্রকাশার্থ 'ইহা রচি কাশীরাম যান স্বর্গপুর' এইরূপ লিখিয়াছেন। ঐ পর্য্যন্ত রচনা করিয়াই তাঁহার মৃত্যু হয়, ও কবিতার অর্থ এরূপ নহে।" যাহাহউক, আমরা কাশীরামদাসের কবিকীর্ত্তির অংশ অপরকে দিতে সম্মত নহি।

কাশীরামদাস কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ বা কোন্ সময়ে গ্রন্থরচনা করেন, তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণয়করিবার উপায় নাই। তিনি গ্রন্থমধ্যে কোন স্থানে সময়নির্দ্দেশক কোন কথা লেখেন নাই। তবে একমাত্র রচনাদর্শন করিয়া সময়ের অনুমান করিতে হইবে—তাহা করিয়া দেখাযাইতেছে যে, কাশীরামদাসের রচনা কীর্ত্তিবাস ও মুকুন্দরামের রচনা অপেক্ষা অবশ্যই আধুনিক হইবে। কারণ উক্ত কবিদ্বয়ের রচনায় অপ্রচলিত প্রাচীনশব্দের ব্যবহার, ভাষার অসুকুমারতা ও ছন্দোবিষয়ে বর্ণগত বৈলক্ষণ্য যত দেখিতে পাওয়াযায়, কাশীরামের রচনায় তত দেখিতে পাওয়া যায়না। তদ্ভিন্ন রামায়ণ ও চণ্ডীর হস্তলিখিত ও মুদ্রিতপুস্তকের পাঠসকল যেরূপ নিতান্ত বিভিন্ন, মহাভারতের উক্তবিধ পুস্তকদ্বয়ের পাঠ সেরূপ বিভিন্ন নহে। অতএব ইহাও মহাভারতকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বোধ করিবার এককারণ বটে—যেহেতু অত্যন্ত প্রাচীনপুস্তকে যত পাঠান্তর হইয়া পড়ে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুস্তকে তত পাঠান্তর হয়না। যাহাহউক, পূর্ব্বে আমরা একপ্রকার সপ্রমাণ করিয়াছি যে, কবিকঙ্কণের চণ্ডী ১৪৯৯ শকে অর্থাৎ এক্ষণকার প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত; কাশীরামদাসের মহাভারত

উহা অপেক্ষা আধুনিক হইলে অবশ্যই উক্ত সময়ের পরবর্ত্তী সময়ে লিখিত, বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু ঐ পরবর্ত্তী সময় নিরূপণ করিবার উপায় কি?—আমরা যে কয়েকখানি হস্তলিখিত মহাভারত সংগ্রহকরিতে পারিয়াছি, তন্মধ্যে একখানি সভাপর্ব্বের পুস্তক সন ১১৪১ সালে অর্থাৎ ১৬৫৬ শকে [১৭৩৪ খৃঃ অঃ] লিখিত। আরও একখানি উদ্যোগপর্ব্ব আমাদের নিকট আছে; সেখানিতে সন তারিখ লেখা নাই, কিন্তু সেখানির অবস্থা দর্শন করিলে তাহা পূর্ব্বোক্ত সভাপর্ব্বের পুস্তক অপেক্ষা অন্ততঃ ২০।৩০ বৎসর পুর্ব্বে লিখিত, বলিয়া অনুমান হয়। যদি তাহা হয়, তবে ঐ পুস্তক বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ১৭০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত, স্বীকার করিতে হইবে। মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে কোন পুস্তক স্বল্পকালমধ্যে দেশব্যাপী হইতে পারেনা। আমরা যে পুস্তকের কথা উল্লেখ করিতেছি, তাহা যে স্থানে লিখিত, সে স্থান কাশীরামের বাসগ্রাম হইতে প্রায় ২০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। সুতরাং অন্ততঃ ৩০ বৎসরের ন্যূনে কাশীরামের রচনার ততদূর পৌঁছান সম্ভববোধ হয়না। অতএব আমাদের বোধহয় সন ১০৭৫ সালে বা ১৫৯০ শকে অর্থাৎ এক্ষণ হইতে প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে কাশীরামদাস প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

এই পর্য্যন্ত লেখা সমাপ্ত হইলে পর আর এক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে সংবাদ দেন যে "কাশীরামদাসের পুত্র * আপন পুরোহিত-দিগকে সে বাস্তবাটী দান করেন, সেই দানপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা সন ১০৮৫ সালের আষাঢ় মাসে লিখিত; এক্ষণে ২।৩ খানি ছিন্ন বস্ত্র দিয়া আঁটা আছে, তথাপি অনেক স্থান ছিন্ন ও গলিত হইয়া গিয়াছে—সকল কথা পড়িতে পারাযায়না" ইত্যাদি—যদি এদানপত্র প্রকৃত হয়, তবে কাশীরাম এক্ষণ হইতে ২০০ বৎসরের কিঞ্চিদধিক পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আর কিছু-মাত্র সংশয় থাকে না।

* পুত্রের নাম জানিতে পারাযায় নাই।

কাশীরামদাস অতিবিনীত কবিত্বগর্ব্বশূন্য পরমভাগবত লোক ছিলেন। মহাভারতের ন্যায় ছন্দোবদ্ধ বৃহৎ গ্রন্থ তাঁহার পূর্ব্বে—অথবা পূর্ব্বেই কেন, এপর্য্যন্ত কেহ রচনা করিতে পারেন নাই। তিনি এতাদৃশ বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াও আপনাকে 'কবি' ও আপনার 'রচনা মধুর' এরূপ কোথাও কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। কেবল ব্যাসদেবের ও মহাভারতকথার ভূরি ভূরি প্রশংসান্তেই তাঁহার সকল ভণিতি পর্য্যবসিত হইয়াছে।

"ব্যাসের রচিত চিত্র অপূর্ব্ব ভারত। কাশীরামদাস কহে পাঁচালির মত॥"
"ভারত পঙ্কজরবি মহামুনি ব্যাস। পাঁচালী প্রবন্ধে রচে কাশীরামদাস॥"
"মহাভারতের কথা অমৃত লহরী। কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥"

ইত্যাদি যে কোন ভণিতিই পাঠ করাযাউক, তদ্দ্বারাই তাঁহার বিনয়-নম্রতার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়াযায়। তিনি সংস্কৃত জানিতেন কি না, তাহা সন্দেহ স্থল। কারণ তাঁহার মহাভারত মূলসংস্কৃতের অবিকল অনুবাদ নহে, অনেক স্থানেই তিনি ভূরি ভূরি বিষয়ের পরিবর্জ্জন ও ভূরি ভূরি বিষয়ের নূতনরূপ যোজনা করিয়াছেন। ইহার উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। মূল ও ভাষা মহাভারতের যে কোন স্থান খুলিয়া পাঠকবর্গ ইচ্ছা করিলেই মিলাইয়া দেখিতে পারিবেন। তদ্ভিন্ন কোন কোন উপাখ্যান একবারে নূতনসঙ্কলিতও হইয়াছে। বনপর্ব্বের মধ্যে শ্রীবৎসোপাখ্যান নামে যে একটী বৃহৎ উপাখ্যান আছে, তাহা মূল সংস্কৃতে একবারে নাই। অনেকে অনুমান করেন যে, উহা কাশীরামের স্বকপোলকল্পিত। কিন্তু যখন্ কবিকঙ্কণের চণ্ডীতেও খুল্লনার পরীক্ষাদানাবসরে—

"কাঠুরে সহিত ছিল সতী চিন্তা নারী"

এই কথার উল্লেখ আছে, তখন্ আমাদের অনুমান হয় যে, ঐ উপাখ্যান কোন পৌরাণিকমূল হইতেই হউক বা অন্যরূপেই হউক দেশমধ্যে প্রচলিত ছিল; কবি তাহাকেই হৃষ্টপুষ্ট করিয়া নিজগ্রন্থমধ্যে নিবেশিত

করিয়াছেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া বোধহয়, কৃত্তিবাসের ন্যায় কাশীরামদাসও কথকের মুখে মহাভারত শ্রবণ করিয়া এই রচনা করিয়াছেন। তিনি নিজেই কয়েক স্থলে লিখিয়াছেন—

শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার। অবহেলে শুন তাহা সকল সংসার॥

যাহাহউক কাশীরামের সংস্কৃত জানা না থাকিলেও তাঁহার রচনা অসংস্কৃতজ্ঞের রচনার ন্যায় বোধহয়না। ঐ রচনাতে এরূপ সংস্কৃত শব্দ সকল প্রযুক্ত আছে যে, তাহা সংস্কৃতানভিজ্ঞ লোকের লেখনী হইতে নির্গত হওয়া সহজকথা নহে।

কবিত্ব বিষয়ে কাশীরামদাস কবিকঙ্কণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন, সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার কবিত্বশক্তি কম ছিল, একথা বলা যায়না। মহাভারতে আদি, করুণ, রৌদ্র, বীর ও শান্ত রসের ভূরি ভূরি স্থল আছে, কাশীরাম সেই সকল স্থলেই কবিত্ব ও কল্পনাশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। ঐ পরিচয় মহাভারতের সর্ব্বত্রই প্রচুর আছে; উদাহরণস্বরূপ কয়েকটীমাত্র আমরা নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম—

দ্রৌপদীর রূপবর্ণনা।

পূর্ণ সুধাকর, হইতে প্রবর, কে বলে কমল মুখ।
গজমতি ভূষা, তিলফুল নাসা, দেখি মুনিমন সুখ॥
নেত্রযুগ মীন, দেখিয়া হরিণ, লাজে দোঁহে গেল বন।
চারু ভুরুলতা, দেখিয়া মন্মথা, নিন্দে নিজ শরাসন॥
প্রবাল শ্রীধর, বিরাজে অধর, পূর্ব্বীয় অরুণ ভালে।
মধ্যে কাদম্বিনী, স্থির সৌদামিনী, সিন্দুর চাঁচর চুলে॥
তড়িত মণ্ডল, গণ্ডেতে কুণ্ডল, হিমাংশু মণ্ডল আড়ে।
দেখি কুচকুম্ভ, লজ্জায় দাড়িম্ব, হৃদয় ফাটিয়া পড়ে॥
কণ্ঠ দেখি কম্বু, প্রবেশিল অম্বু, অগাধ অম্বুধি মাঝে।
নিন্দিত মৃণাল, দেখি ভুজ ব্যাল, প্রবেশিল বিলে লাজে॥
মাজা দেখি ক্ষীণ, প্রবেশে বিপিন, করিহর হরি লাজে।
করে কোকনদ, পাইল বিপদ, নখতেজে দ্বিজরাজে॥

কনক কঙ্কণ, করে ঝন ঝন, চরণে নূপুর হংস।
জঘন সুন্দর, বিহার কন্দর, স্বর্ণকাঞ্চী অবতংস॥
রামরম্ভা তরু, চারু যুগ উরু, দেখি নিন্দে হাত হাতি।
উদর সুকৃশ, মাজা মৃগ-ঈশ, নিতম্বযুগল ক্ষিতি॥
নীল সুকোমল, শরীর অমল, কমলে গঠিত অঙ্গ।
ভারের কারণ, হীন আভরণ, সহজে মোহে অনঙ্গ॥
কমলবদন, কমল নয়ন, কমল গঞ্জিত গণ্ড।
দ্বিকর কমল, কমলাঙ্ঘ্রিতল, ভুজ কমলের দণ্ড॥
মন্দ মন্দ বায়, যোজনেক যায়, অঙ্গের কমলগন্ধ।
হইয়া উন্মত, ধায় চতুর্ভিত, কমল-মধুপ-বৃন্দ॥
কুরুকুল ধ্বংসে, কমলার অংশে, সৃজিল কমলজাত।
কমলাবিলাসী, বন্দি কহে কাশী, কমলাকান্তের সুত॥

আদিপর্ব্ব।

লক্ষ্যভেদোদ্যত ব্রাহ্মণরূপী অর্জ্জুনকে দেখিয়া সভাসদদিগের উক্তি—

কেহ বলে ব্রাহ্মণেরে না কহ এমন। সামান্য মনুষ্য বুঝি না হবে এজন॥
দেখ দ্বিজ, মনসিজ, জিনিয়া মূরতি। পদ্মপত্র, যুগ্মনেত্র, পরশয়ে শ্রুতি॥
অনুপম, তনুশ্যাম, নীলোৎপল আভা। মুখরুচি, কত শুচি, করিয়াছে শোভা॥
সিংহগ্রীব, বন্ধুজীব, অধরের তুল। খগরাজ, পায় লাজ, নাসিকা অতুল॥
দেখ চারু, যুগ্মভুরু, ললাট প্রসর। কি সানন্দ, গতি মন্দ, মত্ত করিবর॥
ভুজযুগে, নিন্দে নাগে, আজানুলম্বিত। করিকর, যুগ বর, জানু সুবলিত॥
বুকপাটা, দন্তছটা, জিনিয়া দামিনী। দেখি এরে, ধৈর্য্যধরে, কোথা কে কামিনী॥
মহাবীর্য্য, যেন সূর্য্য, ঢাকিয়াছে মেঘে। অগ্নি অংশু, যেন পাংশু, আচ্ছাদিল নাগে॥
এইক্ষণে, লয় মনে, বিন্ধিবেক লক্ষ্য। কাশী ভণে, কৃষ্ণজনে, কি কর্ম্ম অশক্য॥

আদিপর্ব্ব।

কুরুসৈন্যের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধারম্ভ।

আকাশ হইতে শীঘ্র তারা যেন ছুটে। চালাইয়া দিল রথ কর্ণের নিকটে॥
কর্ণের সম্মুখে ছিল যত রথিগণ। অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ॥
শেল শূল শক্তি জাঠী মুষল মুদ্গার। ঝাঁকে ঝাঁকে চতুর্দ্দিকে বরিষে তোমর॥
পর্ব্বত আকার হস্তী ভীষণদশন। চরণে কম্পিত ক্ষিতি জলদগর্জ্জন॥

দেখিয়া হাসিয়া বীর কুন্তীর নন্দন। দিব অস্ত্র গাণ্ডীবে যোড়েন সেই ক্ষণ॥
না হতে নিমেষ পূর্ণ ছাড়িতে নিশ্বাস। শর জাল করিয়া পূরিল দিক্‌পাশ॥
বরিষা কালেতে যেন বরিষয়ে মেঘে। দিনকর তেজ যেন সর্ব্বঠাঁই লাগে॥
যত রথী পদাতি কুঞ্জর হয়গণ। করেন জর্জ্জর বিন্ধি ইন্দ্রের নন্দন॥
বেগে রথ চালায় সারথি বিচক্ষণ। বাতাধিক মনোজব জিনিয়া খঞ্জন॥
ক্ষণে বামে ক্ষণে দক্ষে আগে পিছে ছুটে। ভূমিতে ক্ষণেক পড়ে ক্ষণে শূন্যে উঠে
ক্ষণেক ভিতরে যায় ক্ষণেক বাহির। রথবেগে পড়িল অনেক মহাবীর॥
মৃগেন্দ্র বিহরে যেন গজেন্দ্রমণ্ডলে। নাগে নাগান্তক যেন মারে কুতূহলে॥
কাটিল রথের ধ্বজ সারথি সহিত। খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল চতুর্ভিত॥
ধনুকসহিত বামহাত ফেলে কাটি। বুকে বাজি পড়ে কেহ কামড়ায় মাটী॥
অস্ত্রানলে দগ্ধ কেহ করে ছট ফটা। কাটিয়া ফেলিল কারু দন্ত দুই পাটী॥
শ্রবণ নাসিকা গেল দেখি বিপরীত। কাটিয়া পাড়িল মুণ্ড কুণ্ডলসহিত॥
কাটিলেন রথধ্বজ করি খণ্ড খণ্ড। মধ্যচক্রে কাটিলেন সারথির মুণ্ড॥
তীক্ষ্ণবাণাঘাতে মত্ত কুঞ্জর সকল। আর্ত্তনাদ করি পড়ে মস্থি বহুদল॥
চক্রাকারে ভ্রমি ভূমে দিয়া পড়ে দন্ত। পেটেতে বাজিয়া কারু বাহিরায় অন্ত্র॥
এই মত মহামার করিল ফাল্গুনি। সকল সৈন্যেরে বিন্ধি করিল চালনী॥

বিরাটপর্ব্ব।

রণভূমিতে দুর্য্যোধনকে পতিত দেখিয়া গান্ধারীর বিলাপ।

পুত্রদরশনে দেবী অজ্ঞানা হইল। গান্ধারী মরিল বলি সকলে ভাবিল॥
পঞ্চপাণ্ডবেতে তাঁরে তুলিয়া ধরিল। শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি আদি বহু প্রবোধিল॥
সম্বিৎ পাইয়া তবে গান্ধারতনয়া। চাহিয়া কৃষ্ণেরে বলে শোকাকুল হৈয়া॥
দেখ কৃষ্ণ পড়িয়াছে রাজা দুর্য্যোধন। সঙ্গেতে নাহিক কেন কর্ণ দুঃশাসন॥
শকুনি সঙ্গেতে কেন না দেখি রাজার। কোথা ভীষ্ম মহাশয় শান্তনুকুমার॥
কোথা দ্রোণাচার্য্য কোথা কৃপ মহাশয়। একলা পড়িয়া কেন আমার তনয়॥
কোথা সে কুণ্ডল কোথা মণি মুক্তাস্রজ্। কোথা গেল হস্তী ঘোড়া কোথা রথধ্বজ।
একাদশ অক্ষৌহিণী যার সঙ্গে ধায়। হেন দুর্য্যোধন রাজা ধূলায় লোটায়॥
সুবর্ণের খাটে যার সতত শয়ন। হেন তনু ধূলার উপরে নারায়ণ॥
জাতি যূথী পুষ্প আর চাঁপা নাগেশ্বর। রঙ্গণ মালতী আর মল্লিকা সুন্দর॥
এসকল পুষ্পে পুত্র থাকিত শুইয়া। হেন তনু লোটে ধূলা দেখনা চাহিয়া॥

অগুরু চন্দন গন্ধ কুঙ্কুম কস্তুরী। লেপন করিত সদা অঙ্গের উপরি॥
শোণিতে সে তনু আজি হইল শোভন। আহা মরি কোথা গেল রাজা দুর্য্যোধন॥
ত্যজহ আলস্য কেন না দেহ উত্তর। যুদ্ধহেতু তোমারে ডাকয়ে বৃকোদর॥
উঠ পুত্র ত্যজ নিদ্রা অস্ত্র লহ হাতে। গদাযুদ্ধ কর গিয়া ভীমের সহিতে॥
কৃষ্ণার্জ্জুন ডাকে তোমা যুদ্ধের কারণ। প্রত্যুত্তর কেন নাহি দেহ দুর্য্যোধন॥
এত বলি গান্ধারী হইল অচেতনা। প্রিয়ভাষে কৃষ্ণচন্দ্র করেন সান্ত্বনা॥ নারীপর্ব্ব।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে যে প্রকার নূতন নূতন ছন্দের অনুসরণ আছে, মহাভারতে তাহা অধিক নাই। ইহাতে আদ্যোপান্ত সমুদায়ই পয়ার; মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ ও লঘু ত্রিপদী এবং ২।১টী তরল পয়ার প্রভৃতি আছে। ইহাতে বোধহয় কবি, সাগরস্বরূপ ভারতরচনায় প্রবৃত্তহইয়া কিরূপে প্রারব্ধের পরিসমাপন করিবেন, তজ্জন্য সতত চিন্তিত ছিলেন, এবং রচনার শীঘ্রতাসম্পাদন নিমিত্ত সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন, সুতরাং ছন্দের পারিপাট্যের প্রতি তত মনোযোগ দিতে পারেননাই। কিন্তু এস্থলে ইহা স্বীকারকরিতে হইবে যে, পূর্ব্ববর্ণিত গ্রন্থ সকলে যেমত যে সে বর্ণ লইয়া অন্ত্যবর্ণের মিলকরিয়া দেওয়াহইয়াছে, ইহাতে সেরূপ করাহয় নাই। মিত্রাক্ষরতার বিশুদ্ধ নিয়ম ইহাতে অনেকদূর অনুসৃতহইয়াছে।

যাহাহউক, কীর্ত্তিবাস রামায়ণকে ও কাশীরামদাস মহাভারতকে ভাষায় পরিবর্ত্তিতকরিয়া সাধারণ লোকের যে, কিরূপ উপকার করিয়াগিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষকরাযায় না। অধিক কি বাঙ্গালাদেশমধ্যে ইহাঁরাই বাল্মীকি ও ব্যাসকে উজ্জীবিত রাখিয়াছেন, বলিতে হইবে। ঐ দুই গ্রন্থ ভাষায় না থাকিয়া কেবল সংস্কৃতে বদ্ধ থাকিলে, রামচন্দ্রের অকপট পিতৃভক্তি, লক্ষ্মণ ও ভরতের অবিচলিত জ্যেষ্ঠানুরাগ, সীতার অনুপম পাতিব্রত্য, পাণ্ডবদিগের অলৌকিক সৌভ্রাত্র, যুধিষ্ঠিরের অপরিসীম ধর্ম্মনিষ্ঠা, পঞ্চপতিত্বেও পাঞ্চালীর আশ্চর্য্যরূপ সতীধর্ম্মরক্ষা, ধার্ম্মিকদিগের বিপদ্বিনাশার্থ কৃষ্ণরূপী ভগবানের তাদৃশ চতুরতা, এ সকল কথা দেশের কয়জন লোকের মুখে শুনাযাইত? এখন্—বিশেষতঃ আবার ছাপার পুথি হওয়াতে—মুদীরাপর্য্যন্ত রামায়ণ

মহাভারতের বিষয় লইয়া কথায় কথায় দৃষ্টান্তদিয়া থাকে। ইহা মহাত্মা কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাসের অনুগ্রহের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। পশ্চিমদেশে তুলসীদাসের রামায়ণ থাকাতে তদ্বর্ণিত উপাখ্যান সাধারণে বলিতেপারে, কিন্তু ভারতের সেরূপ কোন ভাষাগ্রন্থ না থাকায় তদুপাখ্যানসকল সংস্কৃতানভিজ্ঞ সাধারণ লোকের পক্ষে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়, অথবা কাশীদাসের পরম শ্লাঘার বিষয়, বলিতেহইবে যে, মহাসমৃদ্ধ ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় বহুল ধনব্যয়ে ১০। ১২ জন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সাহায্য লইয়া অবিশ্রান্ত ৮ বৎসরকাল পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক যে মহাভারতের বাঙ্গালাগদ্যানুবাদ সমাপন করিতে পারিয়াছেন, এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি বর্দ্ধমানাধিপ ৺ মহাতাপচন্দ্রবাহাদুর ঐরূপ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য লইয়া প্রায় বিংশতি বৎসরের পূর্ব্বে যে মহাভারতের বাঙ্গালাঅনুবাদ শেষকরিতে পারেন নাই, নিস্ব কাশীরামদাস, বোধহয়, খড়োঘরের পিঁড়ায় ছেঁড়া মাদুরে বসিয়া সেই প্রকাণ্ড মহাভারতের ছন্দোবন্ধে বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। তাদৃশ বৃহৎকার্য্যসম্পাদনে বোধহয় কেবল কথকের মুখে কথাশ্রবণই তাঁহার প্রধান সাহায্য হইয়াছিল।

এস্থলে ইহাও উল্লেখকরা আবশ্যক যে, কথকদিগের হইতেও বাঙ্গালাভাষার অনেক উন্নতি হইয়াছে। তাঁহারা পুরাণের সংস্কৃতশব্দসকল চলিতভাষায় যোগকরিয়া ব্যাখ্যা করেন। ঐ সকল ব্যাখ্যা গীতস্বরসহকৃত হওয়ায় সাধারণের মনে অঙ্কিত হইয়াযায়, সুতরাং সেই সকল শব্দ ক্রমে ক্রমে ভাষার মধ্যেই ব্যবহৃতহইয়া ভাষার পুষ্টিসম্পাদন করে। ফলতঃ কথকতার প্রচার না থাকিলে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামদাসের মহাভারত বোধহয় আমরা কখনই প্রাপ্ত হইতাম না। কথকতার ব্যবসায়ও আমাদের দেশে নূতন নহে—কবিকঙ্কণের পূর্ব্বেও উহার প্রাদুর্ভাব ছিল। পূর্ব্বকালীন লোকেরা

কথকদিগের বিলক্ষণ সমাদর ও গৌরব করিতেন। গৌরবের কারণও ছিল; যেহেতু তৎকালে কথকদিগের মধ্যে অনেকে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। কৃষ্ণহরি, গদাধরশিরোমণি, রামধনতর্কবাগীশ প্রভৃতি কথকদিগের নাম লোকে অদ্যাপি ভক্তিসহকারে উল্লেখ করিয়াথাকে। সম্প্রতি কতকগুলি নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর লোক ঐ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে, এবং তাহাদের অনেকেরই পানাসক্তি, বিশেষতঃ পরদারানুরক্তিদর্শনে ঐ শ্রেণীর উপরেই লোকের অভক্তি জন্মিয়াগিয়াছে। এখন্ আর কোন ভদ্রলোকে নিজবাটীর মধ্যে কথা দিতে পার্য্যমাণে সম্মত হননা।

মহাভারতের ভাষা রামায়ণ ও চণ্ডীর ভাষা অপেক্ষা অনেক মার্জ্জিত ও স্পষ্ট; ইহাতে বোধহয় ঐ সময়ে বাঙ্গালার অনুশীলন কিছু অধিক হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। পূর্ব্বহইতে গণনাকরিয়াও দেখাযাইতেছে যে, ঐ সময়ে বাঙ্গালাপুস্তকের সঙ্খ্যা অনেকগুলি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফলতঃ চণ্ডী ও রামায়ণের সময় অপেক্ষা মহাভারতের সময়ে বাঙ্গালার কিঞ্চিৎ শ্রীসোষ্ঠব হইয়াছিল, তাহা বিলক্ষণ অনুভবহয়।

কাশীরামদাস মহাভারত ভিন্ন আর কোন রচনাকরিয়াছিলেন কি না, তাহা বলা যায়না। যদি করিয়াও থাকেন, তাহা লুপ্ত হইয়াছে বোধহয়।

রামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্ত্তন।

কাশীরামদাসের মহাভারতের পর প্রায় ৮০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঙ্গালার কোন ভাল গ্রন্থ আমরা দেখিতে পাইতেছি না। ঐ কালমধ্যে কোন ভালগ্রন্থ হইয়াছিল? কি হয় নাই? তাহাও স্থির বলিতে পারাযায়না। যাহাহউক আমরা মহাভারতের পর একবারে শিবসঙ্কীর্ত্তনে হস্তক্ষেপ করিলাম। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ রামেশ্বরভট্টাচার্য্য

ইহার প্রণেতা। ইনি জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত কর্ণগড় নামক স্থানের পূর্ব্বাধিকারী যশবন্তসিংহের সভাসদ ছিলেন এবং সেই সভাতেই ঐ সঙ্গীতের প্রকাশ করেন। আমাদিগের এক পরমাত্মীয় ব্যক্তির * অনুসন্ধানে প্রকাশ হইয়াছে—বরদা পরগণার অন্তর্গত যদুপুর গ্রামে রামেশ্বরের পূর্ব্বনিবাস ছিল। পরে তিনি যশোবন্তসিংহের সভাসদ হইয়া মেদিনীপুর পরগণার অন্তঃপাতী অযোধ্যাবাড়গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তিনি গ্রন্থমধ্যেই উক্ত রাজপরিবারের ও নিজপরিবারের যে সকল বিস্তৃতবিবরণ লিখিয়াছেন, তাহার কয়েকটী উদ্ধৃত করিয়াদিলেই এ বিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন হইবে না। সে সকল এই—

"মহারাজ রঘুবীর, রঘুনাথসম ধীর, ধার্ম্মিক রসিক রসময়।
যাঁহার পুণ্যের বলে, অবতীর্ণ মহীতলে, রাজা রামসিংহ মহাশয়॥
তস্য পুত্র যশবন্ত, সিংহ সর্ব্ব গুণবন্ত, শ্রীযুত অজিতসিংহ তাত।
মেদিনীপুরাধিপতি, কর্ণগড়ে স্ববসতি, ভগবতী যাঁহার সাক্ষাৎ॥"—
"তস্য পোষ্য রামেশ্বর, তদাশ্রয়ে করে ঘর, বিরচিল শিবসঙ্কীর্ত্তন॥"—
"ভট্ট নারায়ণ মুনি, সন্তান কেসরকুনি, যতি চক্রবর্ত্তী নারায়ণ।
তস্য সুত মহাজন, চক্রবর্ত্তী গোবর্দ্ধন, তস্য সুত বিদিত লক্ষ্মণ॥
তস্য সুত রামেশ্বর, শম্ভুরাম সহোদর, সতী রূপবতীর নন্দন।
সুমিত্রা পরমেশ্বরী, পতিব্রতা সে সুন্দরী, অযোধ্যানগর নিকেতন॥
যদুপুরে পূর্ব্ববাস, হেমৎসিংহ পরকাশ, রাজা রামসিংহ কৈল স্থিত।
স্থাপিয়া কৌশিকীতটে, রচিয়া পুরাণপটে, রচাইল মধুরসঙ্গীত॥"—
"যশবন্ত সিংহ সিংহবাহিনীর দাস। সে রাজসভায় হলো সঙ্গীত প্রকাশ॥
জগতে ভরিল যার যশকীর্ত্তি গানে। কর্ণপুরে কলিরামে কেবা নাই জানে॥
ভঞ্জভূমীশ্বর ভূপ ভুবনবিদিত"—
"ভগিনী পার্ব্বতী গৌরী সরস্বতী ত্রয়। দুর্গাচরণাদি করে ভাগিনেয় ছয়॥
ভাগিনেয়ীপুত্র রামকৃষ্ণ বন্দ্যঘটী। এসকলে সুকুশলে রাখিবে ধূর্জটি॥
সুমিত্রার শুভোদয় পরেশীর প্রিয়। পরকালে প্রভু পদতলে স্থল দিও॥"

---

* পূর্ব্বোক্ত রামাক্ষয় বাবু।

এতদ্ভিন্ন অনেক স্থলেই কবি আপনাকে রামসিংহ-প্রতিষ্ঠিত ও যশবন্তসিংহের সভাসদ বলিয়া ব্যক্তকরিয়াছেন। যাহাহউক কবির ভ্রাতা, ভগিনী, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ীপুত্র প্রভৃতির নামোল্লেখ আছে, কিন্তু কোন স্থলে সন্তানের নামোল্লেখ নাই, অতএব বোধহইতেছে, তাঁহার সন্তান হয়নাই। সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী দুই স্ত্রীর নামোল্লেখ থাকায় ইহাও অনুমানহয় যে, একের বন্ধ্যাত্ববোধ হইলে অপরবিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত আত্মীয় লিখিয়াছেন যে, কবির বংশে অযোধ্যা-বাড়গ্রামে অদ্যাপি দুইটী বালক আছে, কিন্তু সে দুইটীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কিরূপ? তাহা জানিতেপারাযায়নাই।

পূর্ব্বোল্লিখিত কর্ণগড় মেদিনীপুরের ৩ ক্রোশ উত্তরবর্ত্তী। তথায় যশবন্তসিংহের বংশীয় কেহই নাই, কিন্তু ভগবতী মহামায়ার ভগ্নপ্রায় মন্দিরাদি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ঐ স্থানে পঞ্চমুণ্ডী (যোগাসন-বিশেষ) প্রস্তুত করিয়া রামেশ্বরকবি জপ করিতেন, তাহাতে মহামায়া প্রসন্না হইয়া তাঁহাকে বর দিয়াছিলেন, এবং সেই বরপ্রভাবেই তিনি শিবসঙ্কীর্ত্তন রচনাকরেন, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। শিবসঙ্কীর্ত্তনকে ঐ দেশে 'শিবায়ন' কহে। কবি কোন্ শকে এই শিবায়ন রচনাকরিয়াছিলেন, নিজরচনামধ্যেই তাহা উল্লিখিত আছে। যথা—

"শাকে হলে চন্দ্রকলা রাম করতলে। বাম হৈল বিধিকান্ত পড়িল অনলে॥
সেই কালে শিবের সঙ্গীত হলো সারা।"

আমরা অনেক ভাবিয়াচিন্তিয়াও এই শ্লোকহইতে স্পষ্টরূপে কোন শাক বাহির করিতেপারিলামনা। বোধ হয় উক্ত রচনায় লিপিকরপ্রমাদ-বশতঃ পাঠব্যতিক্রম হইয়া থাকিবে। মুদ্রিতপুস্তকে ঐ শাকের স্থলে অঙ্ক দ্বারা ১৬৩৪ নিবেশিত আছে। উহা অতিকষ্টকল্পনায় সঙ্গতকরা যাইতে পারে। যাহাহউক অগত্যা উহাই স্বীকারকরিতে হইল। কিন্তু এ বিষয়ে আর একটী প্রমাণ পাওয়াযাইতেছে—নবাব সুজাউদ্দীনের সময়ে ১৬৫৬ শকে [১৭৩৪ খৃঃ অব্দে] এই যশবন্তসিংহ ঢাকার নায়েব

নবাব সরফরাজ খাঁর প্রতিনিধি ঘালিবআলীর সহিত দেওয়ান হইয়া ঢাকায় গিয়াছিলেন। ইহাঁরই যত্নে পুনর্ব্বার টাকায় ৮ মণ চাউল হওয়ায় নবাব সায়স্তাখাঁর সময়হইতে আবদ্ধ ঢাকানগরের পশ্চিমদ্বারের কবাট উন্মুক্ত হইয়াছিল। যশবন্ত ১৬৫৬ শকে দেওয়ান হইয়াছিলেন, এবং মুদ্রিতপুস্তকের গণনানুসারে শিবসঙ্কীর্ত্তন ১৬৩৪ শকে সমাপ্ত হয়—এই ২২ বৎসরের অন্তর ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। যেহেতু যশবন্তের দেওয়ান হইবার ২২ বৎসর পূর্ব্বেও ঐ গ্রন্থ রচিতহওয়া অসম্ভাবিত নহে। বিশেষতঃ ইতিহাসে ইহাও দেখাযাইতেছে যে, দেওয়ানীলাভের পূর্ব্বেও যশবন্ত প্রসিদ্ধ মুর্শিদকুলীখাঁর অধীনে বহুদিন থাকিয়া বিলক্ষণ খ্যাতি-প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। ফলতঃ শিবসঙ্কীর্ত্তন মহাভারতের পরে এবং কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দরের পূর্ব্বে যে রচিতহইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কবিকঙ্কণ—দেবদেবীর বন্দনা, গ্রন্থসূচনা, সৃষ্টিপ্রকরণ, দক্ষযজ্ঞ, হরপার্ব্বতীর বিবাহ, শিবের ভিক্ষা, কন্দল প্রভৃতিক্রমে—যেরূপে গ্রন্থ আরম্ভকরিয়াছিলেন, ইনিও অবিকল সেইরূপে গ্রন্থের আরম্ভ করিয়াছেন। তৎপরে ইহাতে ধর্ম্মকথাপ্রসঙ্গে শিবের উক্তিতে রুক্মিণীব্রত, রামনামমাহাত্ম্য, বাণরাজার উপাখ্যান প্রভৃতি অনেক পৌরাণিক উপাখ্যান এবং সতীমাহাত্ম্য ও ব্রতাদির অনেক কথা বর্ণিত আছে। ঐ সকল কথার পর শিবের কৃষিকর্ম্মারম্ভ, তাঁহাকে ছলিবার উদ্দেশে ভগবতীর বাগ্দিনীবেশে তথায় গমন, শিবকে ঠকান, শিবের শাঁখারী-বেশে হিমালয়ে গমন এবং ভগবতীকে শাঁখা পরাইবার প্রসঙ্গে বাগ্দিনী-রূপে প্রতারণার প্রত্যুত্তরদান, হরগৌরীর মিলন প্রভৃতি যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আমরা অন্যকোথাও দেখি নাই—বোধহয় উহা কবির স্বকপোলকল্পিত হইবে। এই সকল স্থলে কবি বিলক্ষণ চতুরতা, বিলক্ষণ পরিহাসরসিকতা ও বিলক্ষণ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। বাগ্দিনীর পালা ও শাঁখাপরাইবার বৃত্তান্তটী আমাদের এতই মিষ্ট লাগিল

যে, ২।৩ বার পাঠকরিয়াও তৃপ্তিবোধ হইলনা। কেবল ঐ স্থলই কেন? কার্ত্তিকগণেশের কন্দল, পিতাপুত্রের ভোজন, হরগৌরীর কন্দল প্রভৃতি স্থানগুলিও বিশেষ প্রীতিকর। ফলতঃ শিবসঙ্কীর্ত্তন গ্রন্থখানি অবশ্যই উৎকৃষ্টকাব্যমধ্যে গণ্যহইতেপারে। তবে করুণরস না থাকিলে কোন কাব্যই মনকে আর্দ্র করিতেপারেনা—কবি এগ্রন্থের কোন স্থলেই করুণরসের উদ্দীপ্তি করিতে পারেননাই।

শিবসঙ্কীর্ত্তনের নায়কনায়িকা দেবদেবী; সুতাং তাঁহাদের আচার-ব্যবহারের যুক্তাযুক্ততাবিচার অকর্ত্তব্য। কবির রচনা বেশ কোমল ও বিশদ নহে। ইনি বড়ই অনুপ্রাসপ্রিয় ছিলেন—স্থানে স্থানে অনুপ্রাস-সকল বেশ মিষ্ট হইয়াছে সত্য, কিন্তু স্থলবিশেষে বিলক্ষণ কর্কশও বোধহয়। নিম্নভাগে তাঁহার রচনার কিয়দংশ উদ্ধৃতকরিয়া দেওয়াগেল, পাঠকগণ দেখিয়া দোষগুণ বিচার করিতে পারিবেন।

পিতাপুত্রের ভোজন।

যোগ করে দুটী পুত্র লয়ে তার পর। পাতিত পুরটপীঠে বসে পুরহর॥
তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী। দুটী সুতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি॥
তিন জনে একুনে বদন হলো বার। গুটি গুটি দুটী হাতে যত দিতে পার॥
তিন জনে বার মুখে পাঁচ হাতে খায়। এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায়॥
দেখে দেখে পদ্মাবতী বসে এক পাশে। বদনে বসন দিয়া মন্দ মন্দ হাসে॥
শুক্তা খেয়ে ভোক্তা চায় হস্তদিয়া নাকে। অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্ত্তি ডাকে॥
গুহ গণপতি ডাকে অন্ন আন মা। হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য হৈয়ে খা॥
মূষিকী মায়ের বাক্যে মৌনী হয়ে রয়। শঙ্কর শিখায়ে দেন শিখিধ্বজ কয়॥
রাক্ষস ঔরসে জন্ম রাক্ষসীর পেটে। যত পাব তত খাব ধৈর্য্য হব বটে?॥
হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে। ঈষদুষ্ণ সূপ দিল বেসারির পরে॥
লম্বোদর বলে শুন নগেন্দ্রের ঝী। সূপ হলো সাঙ্গ আন আর আছে কি?॥
দড়বড় দেবী এনে দিলা ভাজা দশ। খেতে খেতে গিরীশ গৌরীর গান যশ॥
সিদ্ধিদল কোমল ধুতুরা ফল ভাজা। মুখে ফেলে মাথা নাড়ে দেবতার রাজা॥
উল্বণ চর্ব্বণে ফিরে ফুরাল ব্যঞ্জন। এককালে শূন্য থালে ডাকে তিন জন॥
চটপট পিশিতমিশ্রিত করে যূষে। বায়ুবেগে বিধুমুখী ব্যস্ত হয়ে আইসে॥

চঞ্চল চরণে বাজে নূপুর চমৎকার। রণরণ কিঙ্কিণী কঙ্কণ ঝনৎকার॥
দিতে নিতে গতায়াতে নাহি অবসর। শ্রমে হলো সজল কোমল কলেবর॥
ইন্দুমুখে মন্দ মন্দ ঘর্ম্মবিন্দু সাজে। মৌক্তিকের শ্রেণী যেন বিদ্যুতের মাজে॥
খরবাদ্যে সুপদ্যে নর্ত্তকী যেন ফিরে। সুরস পায়স দিল পিষ্টকের পরে॥
হরবধূ অন্নমধু দিতে আরবার। খসিল কাঁচলী হলো পয়োধর ভার॥
নাটাপাটা হাতে বাটা আলুইল কেশ। গব্য বিতরণ কৈল দ্রব্য হৈল শেষ॥
ভোক্তার শরীরে মূর্ত্তি ফিরে ভগবতী। ক্ষুধারূপ অন্তে কৈল শান্তিরূপে স্থিতি॥
উদর হইল পূর্ণ উঠিল উদ্গার। অতঃপর গণ্ডূষ করিতে নারে আর॥
হট্ করে হৈমবতী দিতে আইল ভাত্। শার্দ্দূল কম্পনে সবে আগুলিল পাত॥

হরপার্ব্বতীর কন্দল।

আত্মারাম আজি রামরসে হৈয়া ভোর। ভোলা ভুলে গেল ভিক্ষা দুঃখে নাহি ওর॥
ভাত নাই ভবনে ভবানীবাণী বাণ। চমৎকার চন্দ্রচূড় চণ্ডীপানে চান॥
কিঞ্চিৎ করিয়া কোপ কহিলেন ভব। কালিকার কিছু নাই উড়াইলে সব?॥
বাড়া ব্যয় কর বুড়া বৈসে পাছে রয়। বৃদ্ধকালে ঘুরাইয়া বধিবে নিশ্চয়॥
দুঃখীর দুহিতা নহ দোষ দিব কি। ভিক্ষুকের ভার্য্যা হৈলে ভূপতির ঝী॥
দেবী বলে দেবদেব দোষ কেন দেও। দিয়াছিলে যত দ্রব্য লেখা করে নেও॥
বিশ্বনাথ বলে এই বয়সে আমার। বসুমতী পাতাল গিয়াছে কতবার॥
লেখা জোখা জানি নাহি রামরস পেয়ে। হয়েছি অজরামর হরিগুণ গেয়ে॥
মিছা লেখা জোখা এক্ষ মনে মনে কর। ঠেকিছি তোমার ঠাঁই ঠেঙ্গাইয়া মার॥
ভ্রূভঙ্গেতে, ভবানি! ভুবন ভুলে যায়। ভোলানাথে ভুলাইবে কতবড় দায়॥
ক্ষমাকর ক্ষেমঙ্করি। খাবনাহি ভাত। যাবনাই ভিক্ষায় যাকরে জগন্নাথ॥
পার্ব্বতী বলেন প্রভু তুমি কেন যাবে। চাক্ করিলে ভাঙ্, এখন পাক করিতে কবে॥
এখন্ বাপের কাছে বসে আছে পো। ক্ষুধা পেলে ক্ষেমঙ্করি! খেতে দেনা গো॥
বাপের বিভব নাহি কি করিবে মায়। স্বামীর সম্পদ বিনা শিশু পোষা দায়॥

শঙ্খপরিধানের উপাখ্যান।

হৈমবতী হরপাশে হাসে মন্দ মন্দ। কান্ত সঙ্গে করিয়া কথার অনুবন্ধ॥
প্রণমিয়া পার্ব্বতী প্রভুর পদতলে। রঙ্গিণী সে রঙ্গনাথে শঙ্খ দিতে বলে॥
গদগদ স্বরে হরে করে কাকুবাদ। পূর্ণকর পশুপতি পার্ব্বতীর সাদ॥
দুঃখিনীর হাতে শঙ্খ দেও দুটী বাই। কৃপা কর কান্ত আর কিছু নাহি চাই॥

লজ্জায় লোকের কাছে লুকাইয়া রই। হাত নাড়া দিয়া বাড়া কথা নাহি কই॥
তুলডাঁটী পারা দুটী হস্ত দেখ মোর। শঙ্খ দিলে প্রভুর পুণ্যের নাহি ওর॥
পতিব্রতা পড়িল প্রভুর পদতলে। তখন্ তুলিয়া তাঁরে ত্রিলোচন বলে॥
শঙ্খের সংবাদ বলি শুন শৈলসুতা। অভাগার ঘরে ইহা অসম্ভব কথা॥
গৃহস্থ গরীব যার সাতগেঁটে ট্যানা। সোহাগে মাগীর কানে কাঁটি কড়ি সোণা॥
ভাত নাই ভবনে ভর্ত্তার ভাগ্য বাঁকা। মিন্‌সে মরে জল খেটে মাগী মাগে শাঁখা॥
তেমনি তোমার দেখি বিপরীত ধারা। রহিতে আমারে ঘরে নাহি দিবে পারা॥
অর্থ আছে আমার আপনি যদি জান। স্বতন্তরা বট শঙ্খ পর নাই কেন॥
নিবারিতে নাহি কেহ নহ পরাধীন। ত্যক্ত কর কেন মিছা কহ সারাদিন॥
মহেশের মন জান মহতের ঝী। আপনি অন্তরযামী আমি কব কি॥
বুড়াবৃষ বেচিলে বিপত্তি হবে ঘোর। সেই বিনা সম্ভাবনা কিবা আছে মোর॥
জানে নাই যে জন জানাতে হয় তাকে। ভামিনী ভূষণ পায় ভাগ্যে যদি থাকে॥
ভিখারীর ভার্য্যা হয়ে ভূষণের সাধ। কেন অকিঞ্চন সঙ্গে কর বিসম্বাদ ? ॥
বাপ বটে বড় লোক বল গিয়া তারে। জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে॥
সেই খানে শঙ্খ পরি সুখ পাবে মনে। জানিয়া জনক ঘরে যাও এইক্ষণে॥
একথা ঈশ্বরী শুনে ঈশ্বরের মুখে। শূল্য হলো যেন শেল পড়ে বুকে॥
দণ্ডবৎ হইয়া দেবের দুটী পায়। কান্তসনে ক্রোধ করে কাত্যায়নী যায়॥
কোলে করি কার্ত্তিকেয় হস্তে গজানন। চঞ্চল চরণে হৈল চণ্ডীর চলন॥
গোড়াইল গিরীশ গৌরীর পিছু পিছু। শিব ডাকে শশিমুখী শুনে নাই কিছু॥
নিদান দারুণ দিব্য দিলে দেবরাও। আর গেলে অম্বিকা আমার মাথা খাও॥
করে কর্ণ চাপিয়া চলিল চণ্ডবতী। ভাবিল ভাইএর কিরা ভবানীর প্রতি॥
ধাইয়া ধূর্জ্জটি গিয়া ধরে দুটী হাতে। আড় হইয়া পশুপতি পড়িলেন পথে॥
যাও যাও যত ভাব জানাগেল বলি। ঠেলিয়া ঠাকুরে ঠাকুরাণী গেলা চলি॥
চমৎকার চন্দ্রচূড় চারিদিকে চায়। নিবারিতে নারিয়া নারদপাশে ধায়॥
রামেশ্বর ভাষে ঋষি দেখ বসে কি। পাথারে ফেলিয়া গেলা পর্ব্বতের ঝী॥

হিমালয় হইতে হরপার্ব্বতীর প্রত্যাগমন।

ঘর যেতে হর চায়, গৌরীগিয়া কহে মায়, শুনি রাণী শোকে অচেতন।
রাম বনবাস জানি, যেমন কৌশল্যা রাণী, কাকুস্বরে করেন রোদন॥
সুখময়ী রাজকন্যা, ভিক্ষুগৃহে দুঃখগণ্যা, কেমনে রহিবে তুমি তায়।

উপরি লিখিত উক্তিদ্বারা ইহাও ব্যক্ত হইতেছে যে, কবির রামদুলাল নামে এক পুত্র এবং জগদীশ্বরী নামে এক কন্যা ছিলেন। বাসস্থানের কথাও তিনি স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা—

"ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্টগ্রাম" ইত্যাদি।

বোধহয় রামপ্রসাদসেন বাল্যকালে সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। তিনি জাতীয় চিকিৎসাব্যবসায় অবলম্বনকরেননাই। প্রাপ্তবয়স্ক হইলে কলিকাতার কোন ধনিকের * সংসারে মুহুরিগিরিকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই পরমার্থচিন্তাতেই রত থাকিত, বিষয়কার্য্যে বড় ব্যাপৃত হইতনা। বাল্যাবধিই তাঁহার কবিত্বশক্তি সমুদ্ভুত হইয়াছিল। ঐ শক্তিসহকারে তিনি কালীবিষয়কগীতি রচনাকরিতেন। সেই সকল গীতি এবং কালীনাম আপনার নিকটস্থ হিসাবের খাতার প্রান্তভাগেই লিখিয়ারাখিতেন। একদিন উক্ত ধনিকের প্রধানকর্ম্মচারী তাহা দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েন এবং প্রভুকে প্রদর্শনকরেন। প্রভু পরমশাক্ত ও গুণজ্ঞলোক ছিলেন। তিনি রামপ্রসাদের লেখা আদ্যোপান্ত পাঠকরিলেন এবং তন্মধ্যে এই গানটী—

আমায় দেও মা তবিলদারী। আমি নেমক্ হারাম নই শঙ্করি॥
পদরত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা আছে যার, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি॥
শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা তবু জিম্মা রাখ তাঁরি।
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গীর তবু শিবের মাইনা ভারি॥
আমি বিনা মাইনায় চাকর কেবল চরণধুলার অধিকারী॥
যদি তোমার বাপের ধারা ধর তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর তবে ত মা পেতে পারি॥
প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মত পদ পাইতো সে পদ লয়ে বিপদ সারি॥

---

* কাহারও মতে দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের, কাহারও মতে দুর্গাচরণ মিত্রের।

পাঠ করিয়া একবারে মুগ্ধ হইলেন, রামপ্রসাদকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহাকে অনর্থক সংসারচিন্তা হইতে বিরত হইয়া কেবল উক্তরূপকার্য্যেই সময়াতিপাত করিতে উপদেশ দিলেন এবং যাবজ্জীবন মাসিক ৩০৲ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া বাটী পাঠাইয়াদিলেন।

তদনুসারে রামপ্রসাদ বাটী আসিয়া নিশ্চিন্তমনে পরমার্থচিন্তা ও নানাবিধ গীতরচনা করিয়া সময়ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রামপ্রসাদের গানের সুর নূতনরূপ, উহা যার পর নাই মধুর এবং সহজ—অর্থাৎ যাহাদের তাল মান কিছুই বোধনাই, তাহারাও অনায়াসে রামপ্রসাদের গান গাইতে পারে। কৃষ্ণনগরের অধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ঐ সময়ে স্বাধিকারভুক্তকুমারহট্টে মধ্যে মধ্যে আসিয়া অবস্থিতি করিতেন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় গুণজ্ঞ ও বিদ্যার উৎসাহদাতা লোক এদেশে কেহ ছিল কি না সন্দেহ। তিনি রামপ্রসাদের গুণগান শুনিয়া তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিতেন এবং সর্ব্বদাই তাঁহার গান শুনিয়া ও তাঁহার সহিত সদালাপ করিয়া পরমানন্দে থাকিতেন। রামপ্রসাদের সঙ্গীতবিদ্যা অধিক ছিলনা এবং স্বরও মধুর ছিল না—কিন্তু স্বরচিতপদের গানে তাঁহার এরূপ অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল যে, তদ্দ্বারা তিনি লোককে আর্দ্র করিয়া দিতেন। কথিত আছে রামপ্রসাদ একবার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত মুর্শীদাবাদে গিয়াছিলেন, এবং তথায় গঙ্গার উপর নৌকার মধ্যে গান করিতেছিলেন। দৈবযোগে নবাব সিরাজউদ্দৌলাও নৌকাকরিয়া নিকটদিয়া যাইতেছিলেন, এমত সময়ে রামপ্রসাদের গান শুনিতে পাইয়া তাঁহাকে নিজনৌকায় আনাইলেন, এবং গান করিতে আজ্ঞা করিলেন। রামপ্রসাদ নবাবের নিকটে বসিয়া হিন্দীগান আরম্ভ করিলেন, নবাব তাহাতে বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "না না ওগান নয়—ওনৌকায় যে গান গাইতেছিলে, সেই গান গাও" অনন্তর রামপ্রসাদ এরূপ নৈপুণ্যসহকারে স্বরচিত গানসকল গাইতে লাগিলেন যে, তাহাতে নবাবের পাষাণহৃদয়ও দ্রব হইয়াগেল।

কৃষ্ণচন্দ্র, রামপ্রসাদকে ক্রমে ক্রমে অধিক ভাল বাসিতে লাগিলেন। তিনি উহাঁকে কৃষ্ণনগরের রাজসভায় রাখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু রামপ্রসাদ তাহাতে সম্মত হন নাই। রাজা কুমারহট্টে আসিলেই তাঁহার গীতশ্রবণ করিতেন এবং তাঁহাকে ও তত্রত্য আজুগোসাঁইকে একত্র করিয়া তাঁহাদের বিবাদ লাগাইয়াদিয়া কৌতুক দেখিতেন। আজুগোসাঁইকে সকলে পাগল মনেকরিত। কিন্তু তাঁহার অভ্যন্তরে কিছু কবিত্ব ও ভাবুকতা ছিল। রামপ্রসাদ কোন গান রচনাকরিলেই আজুগোসাঁই তাহার একটী উত্তর দিতেন। নিম্নভাগে রামপ্রসাদ ও আজুগোসাঁইএর দুইটী গানের কিয়দংশ উদ্ধৃতহইল। রামপ্রসাদের গান—

এই সংসার ধোঁকার টাটী। ওভাই আনন্দরাজারে লুটী॥
ওরে ক্ষিতি বহ্নি বায়ু জল শূন্যে অতি পরিপাটী।
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা অহঙ্কারে লক্ষকোটি॥ ইত্যাদি।

আজু গোসাঁইএর উত্তর—

এই সংসার রসের কুটী। খাই দাই রাজত্বে বসে মজা লুটী॥
ওহে সেন নাহি জ্ঞান বুঝ তুমি মোটামুটী।
ওরে ভাই বন্ধু দারা স্থত পিঁড়ি পেতে দেয় দুধের বাটী॥

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের কবিত্বশক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ১০০ বিঘা নিষ্করভূমি এবং 'কবিরঞ্জন' এই উপাধি দিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ রাজদত্ত সম্মানের প্রতিদানস্বরূপ বিদ্যাসুন্দর নামে এক পদ্য গ্রন্থ রচনাকরিয়া ঐ গ্রন্থের 'কবিরঞ্জন' নাম দিয়া রাজাকে অর্পণ করেন। তদ্ভিন্ন তিনি কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন নামে আর দুই খানি গ্রন্থও রচনাকরিয়াছিলেন। রামপ্রসাদের একটী গানে "লাখ উকীল করেছি খাড়া" এই কথার উল্লেখ থাকায় কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তিনি লক্ষ গীত রচনা করিয়াছিলেন। তাহা সম্ভব না হউক, তিনি যে, বহুসংখ্যক গীতরচনা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয়নাই। এই সকল গীত কুত্রাপি একত্র পাওয়াযায়না, 'কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহ' নামক

পুস্তকেও কয়েকটী মাত্র আছে। অনেক ভিক্ষুকে রামপ্রসাদী পদ গান-করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

রামপ্রসাদ তান্ত্রিকমতাবলম্বী ছিলেন এবং উপাসনার অনুরোধে কিঞ্চিৎ সুরাপান করিতেন। ইহাতে অনেকে তাঁহাকে মাতাল বলিয়া ঘৃণা করিত—কিন্তু তিনি তাহাতে ক্রুদ্ধ হইতেন না। একদা কুমারহট্টের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বলরামতর্কভূষণ তাঁহাকে মাতাল বলিয়া অবজ্ঞাকরায় তিনি নিম্নলিখিত গানটীদ্বারা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলেন যথা—

"সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাইরে কুতূহলে।
আমার মনমাতালে মেতেছে আজ, মদমাতালে মাতাল বলে॥"

এইরূপ সাংসারিক সকলবিষয়েই সামান্য সামান্য কথায় মুখে মুখে গানরচনাকরিবার শক্তি দেখিয়া রামপ্রসাদকে অনেকে কালীর বরপুত্র বা সিদ্ধপুরুষ বলিয়া বিশ্বাসকরিত। রামপ্রসাদেরও মনেমনে বোধ-ছিল যে, তিনি পূর্ব্বজন্মেও কালীভক্ত ছিলেন, কিন্তু এ জন্মে তিনি আপন স্ত্রীকে আপনার অপেক্ষা সৌভাগ্যবতী মনে করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ভগবতী কালী স্বপ্নযোগে তাঁহার পত্নীকে প্রত্যাদেশ দিয়াছেন; বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে অনেক স্থলে এই কথার উল্লেখ আছে যথা—

"ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে। আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব। কহিবার কথা নহে সে কথা কি কব॥"

এস্থলে ইহাও উল্লেখকরা আবশ্যক যে, নীলুঠাকুর নামক কবিওয়ালার দলেও রামপ্রসাদ নামে একজন কবি ছিলেন। নিম্নলিখিত গীতাংশে তাঁহার উল্লেখ পাওয়াযায় যথা—

"যেমন ঢাকের পিঠে বাঁয়া থাকে বাজেনাকো একটী দিন।
তেম্‌নি নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটিন॥"

কেহ কেহ অনুমানকরেন প্রসিদ্ধ রামপ্রসাদী পদসকল এই কবিওয়ালা রামপ্রসাদের রচিত—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের নহে। কিন্তু গীত ও বিদ্যা-সুন্দরাদি গ্রন্থের ভাষাদির সৌসাদৃশ্য দর্শনকরিয়া অপরে এ কথায় কোনরূপে বিশ্বাস করেন না।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের জীবনবৃত্তবিষয়ে কতকগুলি অলৌকিক উপাখ্যান আছে। অদ্যাপি অনেক লোক তাহাতে বিশ্বাস করেন, এই জন্য নিম্নভাগে কয়েকটী লিখিত হইল—একদা রামপ্রসাদ বেড়া বাঁধিতেছিলেন; তিনি বেড়ার যে পার্শ্বে বসিয়া দড়িতে গাঁইট দিতেছিলেন, তাঁহার কন্যা জগদীশ্বরী তাহার অপরপার্শ্বে বসিয়া আবশ্যকমতে দড়ী ফিরাইয়াদিতেছিলেন; হঠাৎ কার্য্যান্তর উপস্থিত হওয়ায় জগদীশ্বরী তথা হইতে চলিয়াযান—রামপ্রসাদ তাহা দেখিতে পাননাই, কিন্তু দড়ী পূর্ব্ববৎ সময়মত ফিরিয়া আসিতেছিল। কিয়ৎক্ষণপরে কন্যা তথায় আসিয়া বেড়া অনেকদূর বাঁধাহইয়াছে দেখিয়া, কে দড়ী ফিরাইয়া দিল? জিজ্ঞাসাকরায় রামপ্রসাদ কহিলেন 'কেন মা! তুমিই ত বরাবর দড়ী ফিরাইয়াছিতেছ'! তখন্ কন্যা আপনার কার্য্যান্তরগমনের কথা প্রকাশকরিলে রামপ্রসাদের বোধহইল যে, তবে সাক্ষাৎ জগদীশ্বরী আসিয়া দড়ী ফিরাইয়া দিয়াগিয়াছেন।

আর একদিন রামপ্রসাদ গঙ্গাস্নান করিয়া বাটী আসিলে তাঁহার মাতা কহিলেন রামপ্রসাদ! 'কে একটী স্ত্রীলোক তোমার গান শুনিতে আসিয়াছিল, তোমার দেখা না পাইয়া চণ্ডীমণ্ডপের দেওয়ালে কি লিখিয়া রাখিয়াগিয়াছে, পড়িয়া দেখ'। রামপ্রসাদ পড়িয়া দেখিলেন, কাশী হইতে স্বয়ং অন্নপূর্ণা গান শুনিতে আসিয়াছিলেন—দেখা না পাইয়া লিখিয়াগিয়াছেন যে, 'তুমি কাশীতে গিয়া আমাকে গান শুনাইয়া আইস'। রামপ্রসাদ তখনই আর্দ্রবস্ত্রে মাতাকে সঙ্গেলইয়া কাশীযাত্রা করিলেন এবং ত্রিবেণীর নিকটস্থ কোন গ্রামে গিয়া সে রাত্রি অবস্থানকরিলেন; নিশাযোগে অন্নপূর্ণা স্বপ্নে জানাইলেন যে, আর তোমায় কাশী যাইতে হইবেনা—এই খানেই আমাকে গান শুনাও। রামপ্রসাদ তথায় অনেক গান গাইলেন, তন্মধ্যে একটী গান এই—

কাজ্ কি আমার কাশী।
ঘরে বসে পাব গয়া গঙ্গা বারাণসী॥
হৃৎকমলে মার চরণ কাশী, সেই কালচরণ ভালবাসি,

।

কাশী মলে হয় মুক্তি, বটে সেই শিবের উক্তি,
সকলের মূল ভক্তি মুক্তি তার দাসী॥ ইত্যাদি।

রামপ্রসাদের মৃত্যুবিষয়েও এরূপ জনশ্রুতি যে, কালীপূজার পর দিন রামপ্রসাদ আপন পরিবারদিগকে আপনার আসন্নকাল উপস্থিত জানাইয়া প্রতিমাবিসর্জ্জনের সময়ে প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাতীরে গমনকরেন এবং একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত ৪টী গীত গানকরেন—

"কালী গুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে,
এ তনুতরণী ত্বরা করি চল বেয়ে।
ভবের ভাবনা কিবা মন কর নেয়ে॥
দক্ষিণ বাতাস মূল, পৃষ্ঠদেশে অনুকূল,
অনায়াসে পাবে কূল, কাল রবে চেয়ে।
শিব নহে মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারী অণিমাদি,
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী পলাইবে ধেয়ে"॥ ১॥

"বল্ দেখি ভাই কি হয় মোলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে॥
কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেউ বলে সালোক্য পাবি, কেউ বলে সাযুজ্য মিলে॥
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে;
ওরে শূন্যেতে পাপপুণ্য গণ্য, মান্য করে সব খোয়ালে॥
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই, তাই হবি রে নিদানকালে;
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, লয় হয়ে সে মিশায় জলে"॥ ২॥

"নিতান্ত যাবে দিন, এ দিন যাবে, কেবল ঘোষণা রবে গো।
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো॥
এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে,
ওমা শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে, নায়ে লবে গো।
দশের ভরা ভরে নায়, দুঃখীজনে ফেলে যায়,
ওমা তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে গো।
প্রসাদ বলে পাষাণমেয়ে, আসান দেমা ফিরে চেয়ে,
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো"॥ ৩॥

।

" তারা তোমার আর কি মনে আছে।
ওমা এখন্ যেমন রাখ্‌লে সুখে, তেম্‌নি সুখ কি পাছে ॥
শিব যদি হন সত্যবাদী; তবে কি মা তোমায় সাধি,
মাগো ওমা—ফাঁকীর উপরে ফাঁকী, ডানচক্ষু নাচে।
আর যদি থাকিত ঠাঁই, তোমারে সাধিতাম নাই,
মাগো ওমা—দিয়ে আশা, কাট্‌লে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে।
প্রসাদ বলে মন দড়, দক্ষিণার জোর বড়,
মাগো ওমা—আমার দফা, হলো রফা, দক্ষিণা হয়েছে " ॥ ৪ ॥

প্রবাদ এইরূপ যে, এই শেষোক্তগানের "দক্ষিণা হয়েছে" এই অংশটুকু গাইবামাত্র ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ হইয়া রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়। এই সকল উপাখ্যান কতদূর সত্য বা সম্ভব, তাহালিখিবার প্রয়োজন নাই, বিজ্ঞপাঠকগণ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। যাহাহউক রামপ্রসাদের বংশীয়েরা কলিকাতায় বাস করিয়াছেন। ইহঁাদের কুমারহট্টস্থ বাসস্থান পড়াঢিবি হইয়া রহিয়াছে।

রামপ্রসাদের জীবনবৃত্ত লইয়া অনেকক্ষণ গেল; এক্ষণে তদীয়গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করাকর্ত্তব্য। তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে বৃহৎ ও প্রধান কবিরঞ্জন বা বিদ্যাসুন্দর। কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন নামে তাঁহার যে অপর দুইগ্রন্থ আছে, তাহা ক্ষুদ্র ও কেবল গানময়। তাঁহার কোনগ্রন্থেই সময় নির্দ্দেশক কোন কথা নাই। সুতরাং তাঁহার কবিরঞ্জন কোন্ শকে রচিত হইয়াছে, তাহা স্থির বলাযায়না; কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই বোধহয় যে, কবিরঞ্জনবিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলরচনার ২।১ বৎসর পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। অন্নদামঙ্গল ১৬৭৪শকে সমাপ্ত হইয়াছে, একথা তদ্‌গ্রন্থেই উল্লিখিত আছে; সুতরাং কবিরঞ্জন ১৬৭০।৭২শকে রচিত হইয়াছে, অনুমান করাযাইতেপারে। এস্থলে কেহ কেহ বিপরীত অনুমানও করিয়াথাকেন—তাঁহাদের বোধে কবিরঞ্জনবিদ্যাসুন্দর অন্নদামঙ্গলের পর। কিন্তু একথা কোনরূপেই সঙ্গত বলিয়াবোধহয়না। যেহেতু অন্নদামঙ্গলের অন্তর্গত বিদ্যাসুন্দরের রচনা, কবিরঞ্জনবিদ্যাসুন্দরের রচনা

অপেক্ষা অনেক মধুর, অনেক চাতুর্য্যসম্পন্ন ও অনেক উৎকৃষ্ট। অতএব তাহা বিদ্যমান দেখিয়াও কবিরঞ্জনরচনা করা প্রবহমাণ নদীসন্নিধানে সরোবরখননের ন্যায় নিতান্ত অবিজ্ঞের কার্য্য হয়। প্রধানকবি রাম-প্রসাদ তত অবিবেচক ও অসহৃদয় ছিলেন, ইহা সম্ভবহয়না। বরং এই-রূপ সম্ভব যে, রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর রচনাকরিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রদান করিলে তিনি উহা পাঠকরিয়া পরমপরিতুষ্ট হয়েন; কিন্তু উহাকে আরও বিশোধিত ও সুমধুর করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় সভাসদ ভারত-চন্দ্ররায়গুণাকরের হস্তে সমর্পণ করেন। রায়গুণাকর উহা বিশোধিত না করিয়া ঐ মনোরম উপাখ্যানকে অস্থিস্বরূপ অবলম্বনপূর্ব্বক মাংসাদি যোজনা করিয়া নিজে এক বিদ্যাসুন্দর লেখেন এবং তাহা কৌশলক্রমে অন্নদামঙ্গলের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াদেন এবং রচনামুখে উপাখ্যানাংশেও যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তকরেন। সে পরিবর্ত্ত প্রধানতঃএই—কবিরঞ্জনের হীরামালিনী, বিদ্যা ও সুন্দরের পরস্পর সন্দর্শনাদির পর তাঁহারা যেরূপে গোপনে মিলিত হইয়াছিলেন, তৎসমস্ত অবগত ছিল—রায়গুণাকরের মালিনী সমাগমের বিষয় কিছুই জানিত না এবং কবিরঞ্জন বিদ্যার গৃহে ও শয্যায় সিন্দূর মাখাইয়া চোর ধরিবার উপায় করিয়াছিলেন; রায়-গুণাকর বিদ্যাকে বাসগৃহ হইতে স্থানান্তরে পাঠাইয়া কোটাল ও তাহার ভ্রাতাদিগকে স্ত্রীবেশে সেইগৃহে রাখিয়া মহারসিকতাসহকারে চোরকে গ্রেফ্তার করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন সুন্দরের পরিচয় দিবার জন্য শারীশুক দুইটী গুণাকরের নিজের পক্ষী। এ ছাড়া আর আর যে বিভিন্নতা আছে তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে।

এস্থলে ইহাও উল্লেখকরা আবশ্যক যে, বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানটী রামপ্রসাদেরও স্বকপোলকল্পিত নহে। অনেকের বিশ্বাস এই যে, বররুচিকৃত একখানি প্রাচীন পুস্তক আছে। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান তাহাতে বর্ণিত আছে। আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কোথাও সে পুস্তক পাইলাম না। "সুন্দরকাব্য" নামে দ্বাদশসর্গে বিভক্ত এক-

খানি সংস্কৃতবিদ্যাসুন্দর আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহা বররুচিকৃত প্রাচীনগ্রন্থ নহে—একজন আধুনিক বঙ্গদেশীয় কবির বিরচিত। ঐ গ্রন্থে কবিত্বশক্তির পরিচয় বিলক্ষণ আছে, কিন্তু উপাখ্যানাংশে তত বৈচিত্র্য নাই—তজ্জন্য উহা রামপ্রসাদ বা ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ দেখিয়া রচিত হইয়াছে, এরূপ অনুমান করাযায়না। যেহেতু তাহা হইলে উহাঁদের গ্রন্থে উপাখ্যানাংশে যে সকল বৈচিত্র্য আছে, তাহা তিনি কখনই ছাড়িতেন না। বরং এরূপও কতক বোধহয় যে, রামপ্রসাদ ঐ গ্রন্থ বা ঐরূপ কোন গ্রন্থ দেখিয়াই কবিরঞ্জন রচনাকরিয়াছিলেন; কারণ ঐ উভয় পুস্তকের অনেক অংশে ঐক্য আছে। স্থূলকথা এই যে, উক্ত গ্রন্থবর্ণিত উপাখ্যানের সহিত বিদ্যাসুন্দরের চলিত উভয়বিধ উপাখ্যানেরই বৈলক্ষণ্য নাই। তবে হীরার স্থলে বিমলা, গঙ্গারামের স্থলে মাধব, বাঘাইএর স্থলে রাঘব ইত্যাদি কয়েকটী নামঘটিত যাহা বৈলক্ষণ্য আছে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। কিন্তু চোরধরা প্রকরণে কবিরঞ্জন ও গুণাকরের যে দুইরূপ কৌশল আছে, ঐ সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরে তাহার কোনরূপই নাই। সুন্দর ও বিদ্যার পরিচয়দানস্থলে ও বিচার-সময়ে উক্ত বাঙ্গালা দুই বিদ্যাসুন্দরেই যে সংস্কৃতশ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে—উহাতে সে শ্লোকগুলি নাই, কিন্তু সেস্থলে অপরবিধ শ্লোক রচিত হইয়াছে। চোরপঞ্চাশৎ নামক শ্লোকের একটীও উহাতে নাই—তবে ২।৪টী কবিতায় চোরপঞ্চাশদ্বর্ণিত কোন কোন শ্লোকের ভাব লক্ষিতহয় এইমাত্র।

সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের আরও একখানি হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তক আমরা পাইয়াছি—এখানি অতি ক্ষুদ্র, ইহাতে কোন পর্ব্বতে অবস্থিত রাজকন্যা বিদ্যার সহিত সুন্দরের উক্তিপ্রত্যুক্তি, উভয়ের গোপনে সমাগম, বিহার ও রাজসমীপে তাহা প্রকাশিত হওয়ায় সুন্দরের প্রতি দণ্ডদানোদ্যম পর্য্যন্ত ৫৬টী শ্লোকে বর্ণিত আছে। বর্দ্ধমান বীরসিংহ সুরঙ্গ প্রভৃতির কোন কথা নাই। এ পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম নাই,

কিন্তু ইহা বররুচিপ্রণীত সেই পুস্তক কি না? তদ্বিষয়ে আমাদের সংশয় আছে। যাহাহউক, রচনাদৃষ্টে এখানিকে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া বোধহয়না। সুন্দরের পরিচয় ও বিচার স্থলে পূর্ব্বোক্ত দুই ভাষাপুস্তকেই যে সংস্কৃত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহাতেও সেগুলি এবং সেইরূপ আরও কতকগুলি আছে—সুতরাং ঐ শ্লোকগুলি ভাষা-পুস্তকরচয়িতার যে, কাহারও নিজের রচিত নহে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফলকথা সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে—যে, বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান রামপ্রসাদ বা ভারতচন্দ্র কাহারও স্বকপোলকল্পিত নহে। অবশ্যই উহার কোন প্রাচীন মূল ছিল। কিন্তু সেই মূলখানি কোন গ্রন্থ? তাহা স্থির বলিতে পারাযায়না। "বররুচি-বিরচিতং সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরম্"নামে যে একখানি পুস্তক মুদ্রিতহইয়াছে। উহা আমাদিগের উল্লিখ্যমান এই গ্রন্থই প্রায় অবিকল। কেবল উহাতে চোরপঞ্চাশৎটী অধিক আছে। আমাদের নিকটস্থিত হস্তলিখিত পুস্তকে চোরপঞ্চাশতের শ্লোকগুলি একবারে নাই।

অনেকে কহিয়া থাকেন যে, রামপ্রসাদের পূর্ব্বেও প্রাণরামচক্রবর্ত্তী নামে এক কবি বররুচিপ্রণীত প্রাচীনগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া কালিকা-মঙ্গল নামে এক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; তাহাতেও বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বর্ণিত আছে। রামপ্রসাদ সেই উপাখ্যানকে আদর্শকরিয়া কবিরঞ্জন রচনাকরেন—কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, আমরা বিবিধ চেষ্টা করিয়াও কোথাও কালিকামঙ্গলের একখণ্ড পাইলাম না—সুতরাং সে বিষয়ে কোন কথা বলিতে পারাগেলনা। কিন্তু এস্থলে একথা অবশ্য বলাযাইতেপারে যে, কবিরঞ্জন নিজগ্রন্থমধ্যে রাজসমক্ষে বিদ্যার রূপাদিবর্ণনাপ্রসঙ্গে যে পাঁচটী শ্লোক উদ্ধারকরিয়াছেন, এবং ভারতচন্দ্র ঐ স্থলে যে ৫০টী শ্লোক 'চোরপঞ্চাশৎ' নামে তুলিয়া তাহার দুই পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ঐ শ্লোকগুলি বর্দ্ধমানস্থিত সুন্দরচোরের রচিত নহে। ঐ সকল শ্লোক 'চোর' নামক একজন কবির রচিত। জয়দেব

স্বরচিত প্রসন্নরাঘব নাটকের প্রথমে ঐ চোরের নামোল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

যস্যা শ্চোর শ্চিকুরনিকরঃ কর্ণপূরো ময়ূরো হাসো হাসঃ কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো বিলাসঃ।
হর্ষো হর্ষো হৃদয়বসতিঃ পঞ্চবাণস্তু বাণঃ কেষাং নৈষা কথয় কবিতাকামিনী কৌতুকায় ॥
"যার শিরে শোভে 'চোর' চিকণ চিকুর। 'ময়ূর' যাহার কর্ণে মণিকর্ণপূর ॥
'হাস' যার হাস, 'হর্ষ' হর্ষের প্রকাশ। কবীন্দ্র শ্রীকালিদাস্ যাহার বিলাস ॥
পঞ্চবাণ 'বাণ' যার হৃদয়মাঝারে। কবিতাকামিনী হেন না ভুলায় কারে ॥" (র, স,)

এ ভিন্ন আরও প্রাচীন শ্লোক আছে—যথা—

"কবি রমরঃ কবি রমরুঃ কবী চোরময়ূরকৌ"। ইত্যাদি।

যাহাহউক, ঐ চোরকবির প্রকৃতনাম বিহ্লণ; তিনি বিন্ধ্যপর্ব্বতের সমীপস্থ কোন দেশে ৮০০ বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ দেশের কোন রাজকন্যার অধ্যাপনাকার্য্যে তিনি ব্রতী ছিলেন। ক্রমে উভয়ের প্রণয়বন্ধ হওয়ায় গোপনে গান্ধর্ব্ববিবাহ হয়—রাজা তাহা জানিতে পারিয়া বিহ্লণকে বধকরিবার জন্য শ্মশানে পাঠাইলে তিনি তথায় বসিয়া ঐ সকল শ্লোক রচনাকরেন *। এক্ষণে কালিকামঙ্গলকারই হউন, বা রামপ্রসাদই হউন প্রথমে ঐ শ্লোক তাঁহাদের বর্ণনীয়বিষয়ের উপযোগী দেখিয়া নিজগ্রন্থমধ্যে নামান্তরে প্রবেশিত করিয়াছেন।

কবিরঞ্জন গ্রন্থমধ্যে পুষ্পচয়নানন্তর সুন্দরসমীপাগতা হীরামালিনীর চরিত্র, চোরান্বেষণসময়ে বিদ্যু ব্রাহ্মণীর বিদ্যাসন্নিধানে যাইয়া কথারম্ভ, কোটালচরগণের বৈষ্ণব ফকির উদাসীনপ্রভৃতির বেশধারণপ্রসঙ্গে উহাদিগের আভ্যন্তরিক অবস্থা, চোরদর্শনে নাগরিকদিগের মনের ভাব প্রভৃতি অতি প্রকৃষ্টরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন—

"কাল কর পৃথক্ চিন্ত হে মনে এই। লকারে ঈকার দীর্ঘ অসি বটে সেই ॥"
"যৌবনজলধিমধ্যে মগ্ন মত্তগজ। উরে দৃষ্ট কুম্ভস্থল নহে সে উরজ ॥"

* রহস্যসন্দর্ভের ১ম পর্ব্বের ১১ খণ্ডে এবিষয় সবিস্তর বর্ণিত আছে।

" ভূতলে আছাড়ে গা, কপালে কঙ্কণ ঘা, বিন্দু বিন্দু বহে পড়ে রক্ত।
তাহে শোভা চমৎকার, অশোক কিংশুক হার, গাঁথা চান্দে দিল যেন ভক্ত॥ "
" কোন্ ধর্ম্ম, হেন কর্ম্ম, পোড়ে মর্ম্ম, গাত্রচর্ম্ম, দিয়া দিব পাদুকা চরণে।
হৃদয়েশ, এই বেশ, পায় ক্লেশ, কৃপালেশ, কর ভাই অকাল মরণে॥ "

এইরূপ ভূরি ভূরি স্থলে তিনি যে, কতই ভাবুকতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। স্থানেস্থানে তাঁহার স্বভাবোক্তিবর্ণন যে, কিরূপ সুমধুর হইয়াছে, তাহা বলা যায়না। বিদ্যাপতির রচনার ন্যায় 'কৈসন' 'যৈসন' ইত্যাদি হিন্দিশব্দমিশ্রিত এবং মাধবভাট প্রভৃতির উক্তিতে শুদ্ধহিন্দিগ্রথিত বর্ণনাও অনেক দেখিতেপাওয়াযায়। ইতিপূর্ব্বে রামেশ্বরের যে শিবসঙ্কীর্ত্তনের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার রচনায় যেরূপ অনুপ্রাসচ্ছটা লক্ষিত হয়, ইহার রচনায়ও প্রায় সেইরূপ। উদাহরণস্বরূপ নিম্নভাগে কয়েকটী উদ্ধৃত হইল—

" ডুবিল কুরঙ্গশিশু মুখেন্দুশোভায়। লুপ্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দৃশ্য হয়॥ "
" সিংহাসনে নরসিংহ বীরসিংহ রায়। তপ্ত-তপনীয়-তনু তারাপতি প্রায়॥ "
" নহে সুখী সুমুখী নিরখি নন্দিনীরে। অসম্বর অম্বর, অম্বর পড়ে শিরে॥ "
" শিরে হানি পানি রাণী বলে কব কি। শুন পর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব গর্ভবতী ঝী।' ইত্যাদি—

এইরূপ অনুপ্রাসানুসন্ধানের জন্যই হউক বা যেকারণেই হউক রামপ্রসাদের রচনা সকলস্থলেই ললিত কোমল ও সুমধুর হয়নাই। অনেকস্থলে অসুন্দর ও কর্কশ লাগে এবং কয়েকস্থলে নিতান্ত গ্রাম্য ও অশ্লীলবর্ণনাও আছে। তিনি নিজেই একস্থলে প্রকারান্তরে গর্ব্ব করিয়াছেন—

" কালীকিঙ্করের কাব্যকথা বোঝা ভার। সে বোঝে অক্ষয়কালী হৃদে আছে যার।"

একথাও যথার্থবটে; তাঁহার কাব্যের অনেকস্থান সকলের বোধগম্য হয়না। কিন্তু সেরূপ অবিশদরচনা কবির প্রশংসা বা অপ্রশংসার বিষয়, তাহা পাঠকগণেই বিবেচনা করিবেন। তিনি কয়েকস্থলে কতকগুলি

সংস্কৃতশ্লোকের অনুবাদ করিয়াদিয়াছেন, কিন্তু অনুবাদগুলি এতই অস্পষ্ট যে, যাঁহারা সেই মূলশ্লোক না জানেন, তাঁহাদের উহা বোধগম্য হয়না।

পূর্ব্বে যেসকলগ্রন্থের সমালোচনা হইয়াছে, তৎসর্ব্বাপেক্ষা কবিরঞ্জনে অধিকপ্রকার নূতন ছন্দ আছে। পয়ার, মালঝাঁপ, দীর্ঘ ও ভঙ্গত্রিপদী, চতুষ্পদী, তোটক, একাবলী, দিগক্ষরা এবং আরও দুই একটী নূতনরূপ ছন্দ ইহাতে লক্ষিত হয়। তন্মধ্যেও অক্ষর, মাত্রা ও মিলের বৈষম্যাদি দোষও দেখিতে পাওয়াযায়॥

রামপ্রসাদপ্রণীত কালীকীর্ত্তনের রচনা মহাকাব্যের মত সুশৃঙ্খলরূপে নিবদ্ধ নহে—উহার অধিকাংশই কেবল গানময়। অন্যছন্দোরচিতও যাহা আছে, তাহাতে অক্ষরবৈষম্য অত্যন্ত অধিক। কি অভিপ্রায়ে কবি এরূপ রচনা করিয়াছিলেন, বলিতে পারাযায়না। বোধহয় ওগুলি কোনরূপ গীত হইবে। কিন্তু ঐসকলগীতে যে অতি উৎকৃষ্ট ভাব আছে, তাহা সকলকেই স্বীকারকরিতেহইবে। গান স্বরসংযোগে গাইলে যেরূপ মিষ্টলাগে, কথায় বলিলে সেরূপ লাগেনা; অতএব গানশক্তিসম্পন্ন পাঠকমহাশয়দিগের নিকট আমাদের অনুরোধ এই যে, তাঁহারা গাইয়া দেখিবেন যে, রামপ্রসাদের কালীকীর্ত্তন কিরূপ মধুরপদার্থ। উহার একটী গান এই—

গিরিবর! আর আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদেকরে অভিমান, নাহিকরে স্তনপান, নাহিখায় ক্ষীর ননী সরে॥
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী, বলে উমা, ধরে দে উহারে।
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিনও মুখ দেখি, মায়ে ইহা সহিতে কিপারে?
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর অঙ্গুলি, যেতে চায় না জানি কোথারে।
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরাযায়, ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে॥
উঠেবোসে গিরিবর, করি বহুসমাদর, গৌরীরে লইয়া কোলে করে।
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী, মুকুর লইয়া দিল করে॥
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ, বিনিন্দিত কোটি শশধরে॥

রামপ্রসাদের কৃষ্ণকীর্ত্তন নামে যে গ্রন্থের কথা শুনাযায়, তাহা

দুষ্প্রাপ্য। ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তমহাশয় অনেক অনুসন্ধান করিয়াও উহার কয়েকটী শ্লোক বৈ বাহির করিতে পারেন নাই। অতএব তাহার সমালোচনাকরার আর প্রয়োজন হইতেছেনা। যাহাহউক এবিষয়ের আর বাহুল্য না করিয়া এক্ষণে কোন পুস্তকে অমুদ্রিত আর কয়েকটী রামপ্রসাদী গীতমাত্র নিম্নভাগে লিখিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করাগেল—

"মন কৃষিকাজ তোর এসেনা।
এমন মানবজনম রইল পড়ে, আবাদ কর্‌লে ফল্‌তো সোণা।
কালীনামের দেওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবেনা।
সে যে শক্ত বেড়া মুক্তকেশী, তার কাছেতে যম ঘেঁসেনা।
অদ্য অব্দশতান্তেবা বাজাপ্ত হবে জাননা।
এখন্ আপন ভেবে যতন করে. চুটিয়ে ফসল্ কেটে নেনা।
গুরু রোপণ করেছেন বীজ, তায় ভক্তি বারি সেঁচে দেনা।
ওরে একলা যদি না সেচ্‌তে পারিস্, রামপ্রসাদকে ডেকে নেনা" ॥ ১ ॥

"মা আমায় ঘুরাবি কত।
কলুর চোক্‌ঢাকা বলদের মত ॥
বেঁধে দিয়ে ভবের গাছে, পাকদিতেছ অবিরত———
একবার খুলে দেমা চোখের ঠুলি, হেরি তোর ঐ অভয়পদ" ॥ ২ ॥

"এবার কালি তোমায় খাব। খাবগো ওদীনদয়াময়ি।
এবার তুমি খাও কি আমি খাইমা, দুটার একটা করে যাবো।
হাতে কালী মুখে কালী, সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব,
যখন্ শমন কর্‌বে দমন, সেই কালী তার মুখে দিব" ॥ ৩ ॥

"এবার আমি বুঝ্‌বো হরে।
ঐ যে ধর্‌বো চরণ লব জোরে ॥
ভোলানাথের ভুল ধরেছি, বল্‌বো এবার যারে তারে,
ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে, চরণ ছেড়ে দেক্ আমারে।
মায়ের ধন পায়না বেটায়, সেধন নিলে কোন্ বিচারে,
ভোলা, মায়ের চরণ, করে ধারণ, মিছে মরণ দেখায় কারে" ॥ ৪ ॥

সম্প্রতি ‘প্রসাদপ্রসঙ্গ’ নামে একখানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; গ্রন্থকার তাহাতে ২০০ শতের অধিক রামপ্রসাদী গীত মুদ্রিত করিয়াছেন।

মধ্যকালের বিবরণে আমরা বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত হইতে আরম্ভকরিয়া কবিরঞ্জনবিদ্যাসুন্দর পর্য্যন্তের এক প্রকার সমালোচনা করিলাম। ঐকালের মধ্যে আমাদিগের সমালোচিত কয়েকখানি ভিন্ন যে আর কোন গ্রন্থ রচিত হয়নাই, একথা কে বলিতে পারে? আমরাই কয়েক খানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াও অনাবশ্যকবোধে সমালোচনা করি নাই। তদ্ভিন্ন হয়ত অনেকমহাশয়রচিত অনেক গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াগিয়াছে, অথবা বিদ্যমান থাকিতেও আমরা অনেকগ্রন্থের সন্ধান পাইনাই। যাহাহউক, মধ্যকালে ভাষার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা যথাক্রমে সমালোচিত তত্তদ্‌গ্রন্থের বিবরণেই একপ্রকার ব্যক্ত হইয়াছে। চৈতন্যভাগবত—কবিকঙ্কণ—মহাভারত ও কবিরঞ্জনবিদ্যাসুন্দরের ভাষা একরূপ নহে। উহা যে, ক্রমে ক্রমে মার্জ্জিত, বিশদ ও অধিকসংস্কৃতশব্দগর্ভক হইয়াআসিতেছে, তাহা স্পষ্টরূপেই বুঝিতেপারাযায়। কিন্তু এস্থলে ইহাও বিবেচনা করিতেহইবে যে, ঐ সময়ের যে ভাষা আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তৎসমুদয়ই পদ্যময়। পদ্য দেখিয়া ভাষার অবস্থা সম্যক্‌রূপে বোঝাযায়না; কারণ যে সকল কথা লোকে কথোপকথনে ব্যবহার করেনা, পদ্যমধ্যে তাদৃশ অনেক কথাও ব্যবহৃত হইয়াথাকে। অতএব ভাষার বিষয়ে বিবেচনাকরিতেহইলে শুদ্ধ পদ্যগ্রন্থের উপর নির্ভর না করিয়া গদ্যগ্রন্থের প্রতিও দৃষ্টিপাতকরা কর্ত্তব্য। কিন্তু মধ্যকালের গদ্যগ্রন্থ আমরা একখানিও দেখিতে পাই নাই। শুনিতে পাওয়াযায়, ত্রিপুরার রাজাবলী ও রামরামবসুর প্রণীত প্রতাপাদিত্যচরিত, এই দুইখানি গদ্যগ্রন্থ ঐকালের মধ্যে রচিত হইয়াছিল—কিন্তু

দুর্ভাগ্যক্রমে উহার একখানিও দেখিতেপাওয়াগেলনা। সুতরাং তদ্বিষয়ে কোন কথাই বলিতে পারাগেলনা। না পারাযাউক, ইহা বেশ দেখা যাইতেছে যে, মধ্যকালেও গদ্যগ্রন্থ প্রায় হয়ই নাই। ভাষার প্রতি দেশবাসী লোকদিগের যেরূপ আস্থা জন্মিলে এবং ভাষার যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইলে গদ্যগ্রন্থে লোকের অনুরাগ জন্মে, মধ্যকালে তাহার কিছুই হয় নাই—হইলে ঐ কালের মধ্যে কেহ না কেহ অবশ্য বাঙ্গালার কোন ব্যাকরণ রচনা করিতেন—কিন্তু তাহা কেহই করেন নাই। কোন বাঙ্গালা অভিধানও একালের মধ্যে রচিত হয়নাই। সুতরাং এ অংশে আদ্যকাল ও মধ্যকালের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই।

তবে এই কালের মধ্যে ছন্দের অনেক পারীপাট্য হইয়াছে—কিন্তু সে পারীপাট্যও প্রথমে হয় নাই। কবিকঙ্কণের সময়ে কিছু হইয়াছিল বটে, কিন্তু মধ্যকালও ইদানীন্তন কালের যে সন্ধিস্থল—রামপ্রসাদের কাল—তাহাতেই উহার প্রচুরপরিমাণ লক্ষিতহইতেছে। রামপ্রসাদের রচনাতেও প্রাচীনকবিদিগের ন্যায় মিলের দোষ দেখিতেপাওয়াযায়—যথা মরি=হই; কি=ঝী; থো=পো ইত্যাদি। এই মিলদোষজন্যই রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক হইলেও ইহাঁকে আমরা মধ্যকালের শেষে এবং ভারতচন্দ্রকে ইদানীন্তনকালের প্রথমে উপবেশিত করিলাম—নচেৎ ইহাঁদিগকে একস্থানে বসাইলেই চলিত। যাহা হউক এই কালে যে সকল নূতন ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে কবিরঞ্জনের তোটকটী কেবল সংস্কৃতের অনুকৃতি—উহার প্রতি অর্দ্ধ দ্বাদশঅক্ষরে ঘটিত এবং প্রতিতৃতীয় অক্ষর গুরু। তদ্ভিন্ন আর আর সকল ছন্দই পয়ার ও ত্রিপদীর রূপান্তর মাত্র। পয়ারেরই প্রতি চতুর্থবর্ণে মিল ও যতি থাকিলে মালঝাঁপ, কয়েকটী বর্ণ কমাইয়া দিলে একাবলী; ত্রিপদীরই পূর্ব্বার্দ্ধের প্রথম দুই চরণ না থাকিলে ভঙ্গত্রিপদী প্রভৃতি হইয়াথাকে। ঐ মালঝাঁপপ্রভৃতি নামসকল প্রাচীন নহে; বোধ হয় প্রথমকবিরা রচনাসময়ে ওরূপ নাম করেন নাই—অক্ষর যতি প্রভৃতির পরিবর্ত্তাদি করিলে

আর এক প্রকার নূতন মিষ্ট ছন্দ হয়, দেখিয়া তাঁহারা ঐ সকল ছন্দের সৃষ্টি করিয়াগিয়াছেন। পরবর্ত্তী লোকেরা ঐ সকলের অর্থানুরূপ নামকরণ ও লক্ষণ স্থির করিয়া তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

MOHARAJAH'S LIBRARY
28 DEC 1990
COOCH BEHAR.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ইদানীন্তন-কাল।

আদ্য ও মধ্যকালোৎপন্ন গ্রন্থসকলের সমালোচনাসময়ে তত্তদ্‌গ্রন্থের রচয়িতাদিগের জীবনবৃত্তসংগ্রহে আমরা কিছু বিশেষ যত্ন করিয়াছি; কারণ ঐ সকল গ্রন্থকারের জীবনবৃত্ত সাধারণতঃ দুর্জ্ঞেয়; অথচ তাহা জানিতে সকলেরই কৌতূহল জন্মে। কিন্তু ইদানীন্তনকালের গ্রন্থকার-দিগের জীবনবৃত্ত লোকের তত দুর্জ্ঞেয় নহে; বিশেষতঃ তাঁহাদের সঙ্খ্যাও অধিক—অতএব এ পরিচ্ছেদমধ্যে গ্রন্থকারমাত্রেরই সাধারণ্যে সকলের সবিস্তর জীবনবৃত্ত দিতে আমরা সমর্থ হইব না—গ্রন্থকারগণ তজ্জন্য আমাদিগকে মার্জ্জনাকরিবেন।

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, কয়েক বৎসর হইতে বাঙ্গালাগ্রন্থের সঙ্খ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। সেই সকলগুলিই যদি গ্রন্থের মত গ্রন্থ হইত, তাহাহইলে এই অবস্থাকে ভাষার যারপর নাই সৌভাগ্যের অবস্থা মনেকরা যাইতে পারিত। কিন্তু তাহা নহে—তাদৃশ গুণজ্ঞান থাকুক না থাকুক, যাহা কিছু একটা লিখিয়া ও ছাপাইয়া প্রকাশকরা এক্ষণকার অনেকের রোগ দাঁড়াইয়াছে। স্কুলের অনেক দুগ্ধপোষ্য বালকেও গ্রন্থকার হইবার অভিমানে মত্ত হইয়াছে—যে কোনরূপে হউক কোন পুস্তকের টাইটেল্‌পেজের উপর মুদ্রিতনাম বাহির করিতে পারিলেই অনেকে জীবন সার্থক মনে করিতেছে। এইরূপে যে সকল গ্রন্থ বহির্গত হইতেছে, সে সকল গ্রন্থ কিছু সাধারণের পাঠ্য হইবে না এবং অধিককাল স্থায়ীও হইবেনা—দিনকত পরেই কোথায় বিলীন হইয়া যাইবে। বিশেষতঃ তন্মধ্যে এমত সকল গ্রন্থও আছে, যাহা একবারে নিতান্ত পূতিগন্ধি গলদোমময়। পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন না যে, আমরা সে সকলেও হস্তক্ষেপ করিব।

৮ ভারতচন্দ্ররায়ের অন্নদামঙ্গলাদি।

তৃতীয়পরিচ্ছেদে উল্লিখিত রামপ্রসাদসেনের সমকালেই এই মহাকবি প্রাদুর্ভূত হয়েন। জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী ভুরশূট পরগণার মধ্যে 'পেঁড়ো' নামক গ্রাম ইহাঁর জন্মভূমি। ইহাঁর পিতার নাম রাজা নরেন্দ্র-নারায়ণরায়। তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে ভারতচন্দ্র সর্ব্বকনিষ্ঠ। নরেন্দ্র-নারায়ণ একজন বিখ্যাত জমীদার ছিলেন, কিন্তু বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের জননীর সহিত কোনরূপ বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় তিনি উক্ত রাণীকর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হয়েন। ভারতচন্দ্র এই সময়ে বাটী হইতে পলায়ন করিয়া মাতুলালয়ে গমনপূর্ব্বক তথায় সঙ্ক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ ও অভিধানাদি অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তাঁহার বিবাহক্রিয়াও সম্পন্ন হয়। তৎকালে পারসী অর্থকরী বিদ্যা ছিল; তাহা না পড়িয়া অকেজো সংস্কৃত অধ্যয়নকরায় তাঁহার জ্যেষ্ঠেরা অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। এজন্য তিনি অভিমানবশতঃ পুনর্ব্বার বাটী হইতে পলাইয়া হুগলীর সমীপস্থ দেবানন্দপুরগ্রামে মুন্সীবাবুদিগের বাটীতে অবস্থিতিপূর্ব্বক পারস্যভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন।

ভারত যে, নিগূঢ় কবিত্বরত্নের আকর, ইহার পূর্ব্বে তাহা কেহই জানিত না। তিনিও এপর্য্যন্ত রীতিমত কোনরূপ রচনাই করেন নাই। একদা ঐ বাবুদিগের বাটীতে সত্যনারায়ণের সির্ণি উপস্থিত হওয়ায় ভারতচন্দ্রই পাঁচালী পড়িবার নিমিত্ত আদিষ্ট হইলেন। কিন্তু তিনি পররচিত পাঁচালী পাঠ না করিয়া নিজেই ত্রিপদীচ্ছন্দে এক পাঁচালী রচনাকরিয়া সভামধ্যে পাঠকরিলেন। তাহা শুনিয়া সভাস্থ সকলেই চমৎকৃত হইলেন এবং ভারতের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে আর একবার তথায় সির্ণিদেওয়ার ব্যাপার উপস্থিত হইলে ভারত পূর্ব্বরচিত পাঁচালী পাঠ না করিয়া চৌপদীচ্ছন্দে হিন্দি-মিশ্রিত অপর এক পাঁচালী রচনা করিয়া পাঠ করেন। এই উভয় পাঁচালীরই শেষভাগে ভারতের পরিচয়াদি প্রদত্ত হইয়াছে যথা—

—" দেবানন্দপুর গ্রাম, দেবের আনন্দ ধাম, হীরারাম রায়ের বাসনা ॥
ভারত ব্রাহ্মণ কয়, দয়াকর মহাশয়, নায়েকেরে গোষ্ঠীর সহিত।
ব্রতকথা সাঙ্গ হল, সবে হরি হরি বল, দোষ ক্ষম যতেক পণ্ডিত " ॥—তথা

" ভরদ্বাজ অবতংস, ভূপতি রায়ের বংশ, সদাভাবে হতকংস, ভুরশুটে বসতি।
নরেন্দ্ররায়ের সুত, ভারত ভারতীযুত, ফুলের মুখুটী খ্যাত, দ্বিজপদে সুমতি ॥
দেবের আনন্দধাম, দেবানন্দপুর গ্রাম, তাহে অধিকারী রাম-রামচন্দ্র মুনসী।
ভারতে নরেন্দ্ররায়, দেশে যার যশ গায়, হয়ে মোরে কৃপাদায়, পড়াইল পারসী ॥
সবে কৈল অনুমতি, সঙ্ক্ষেপে করিতে পুঁতি, তেমতি করিয়া গতি, না করিও দূষণা।
গোষ্ঠীর সহিত তাঁয়, হরি হোন্ বরদায়, ব্রত কথা সাঙ্গপায়, সনে রুদ্র চৌগুণা" ॥ (১১৩৪)

যৎকালে এই পাঁচালী রচিত হয়, তৎকালে ভারতের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসরের অধিক নহে। এরূপ অল্পবয়সে এতাদৃশ মনোহর রচনা করিতে দেখিয়া "উঠন্তি মূলো পত্তনে চেনা যায়" ন্যায়ে সকলেই অনুমান করিয়াছিলেন যে, ভারতচন্দ্র ভবিষ্যতে একজন অসাধারণ কবি হইবেন।

পারস্যভাষায় কৃতবিদ্য হইয়া বাটী গমন করিলে পর ভারতচন্দ্রের জ্যেষ্ঠেরা তাঁহাকে সর্ব্বকর্ম্মে সুনিপুণ বোধ করিয়া আপনাদিগের ইজারালওয়া বিষয়ের খাজনাদাখিলাদি কার্য্যের তত্ত্বাবধানকরণার্থ মোক্তারস্বরূপ করিয়া বর্দ্ধমানরাজভবনে প্রেরণ করেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহাদের সেই ইজারাসংক্রান্ত বিষয়ের খাজনা দাখিল না হওয়ায় গোলযোগ উঠে এবং সেই গোলযোগে ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমানরাজকর্ত্তৃক কারাবদ্ধ হয়েন। ভদ্রলোকের পক্ষে কারাবাস যে কিরূপ ক্লেশকর, তাহা বর্ণন করা বাহুল্য। ভারতচন্দ্র কিছু দিন সেই ক্লেশ সহ্য করিয়া কারাধ্যক্ষের অনুকূলতায় তথাহইতে পলায়ন করেন—এবং রাজার অধিকার যত দূর ছিল, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক একজন নাপিত ভৃত্য সমভিব্যাহারে একবারে কটকে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য মহারাষ্ট্র সুবাদার শিবভট্টের আশ্রয় লয়েন এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া কিয়ৎকাল পুরু-

যোত্তমে যাইয়া বাস করেন। তথায় তিনি শ্মশ্রুধারণ গেরুয়াবস্ত্র-পরিধানপ্রভৃতি উদাসীনের বেশ পরিগ্রহ করিয়া বৈষ্ণবদিগের দলে মিশিয়াছিলেন। কিয়দ্দিনানন্তর তিনি উক্ত সম্প্রদায়ের সহিত বৃন্দাবন-যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে একদিন খানাকুল কৃষ্ণনগরগ্রামে উপস্থিত হই-লেন। ঐ গ্রামে তাঁহার শালীপতিভ্রাতার বাটী, ইহা ঐভৃত্য অবগত ছিল। সে গোপনে তাঁহাকে সংবাদ দেওয়ায় তাঁহারা অনেকে আসিয়া ভারতকে ধরিলেন, এবং নানারূপ বুঝাইয়া উদাসীনবেশ অপনয়নপূর্ব্বক তাঁহাকে সংসারধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিলেন। অনন্তর ভারত শ্বশুরালয়ে গমনপূর্ব্বক পরমানন্দসহকারে কিয়ৎকাল অবস্থান করিলেন এবং পত্নীকে সেই স্থানেই রাখিয়া পুনর্ব্বার বহির্গত হইয়া ফরাসডাঙ্গার ফরাসীগবর্ণ-মেণ্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নিকট আসিয়া আশ্রয়গ্রহণ করিলেন।

দেওয়ানজী ভারতের বিদ্যাবুদ্ধি ও কবিত্বদর্শনে সাতিশয় প্রীত হই-লেন, কিন্তু ফরাসীদের গৃহে কর্ম্মকাজ করিয়াদিলে তাঁহার প্রকৃতগুণের প্রকাশ হইবে না, এই জন্য তাহা না দিয়া কৃষ্ণনগরের রাজা পরমগুণজ্ঞ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন। এত দিনের পর ভারতচন্দ্রের অন্তরায়মেঘ অপগত হইল—এখন্ তাঁহার সুবিমলপ্রভা দিন দিন উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইতেলাগিল। গুণজ্ঞ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার গুণের সবিশেষ পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে 'গুণাকর' এই উপাধি দিলেন এবং মাসিক ৪০ টাকা বেতন নির্দ্ধারণপূর্ব্বক সভাসদরূপে নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। এক্ষণে গুণাকর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাদ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করিতেলাগিলেন এবং রাজার অনুমতি অনুসারে কবিকঙ্কণের চণ্ডীর অনুকৃতিরূপে অন্নদামঙ্গলের রচনা করিলেন এবং তাহারই মধ্যে পরম-কৌশলসহকারে বিদ্যাসুন্দরের ও মানসিংহের উপাখ্যান যোজনাকরিয়া-দিলেন। এই গ্রন্থ ১৬৭৪ * শকে সমাপ্ত হয়। তৎপরে তিনি রসমঞ্জরী

* বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা। সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥

নামে আর একখানি কাব্যরচনা করেন, এবং "আ আরে বসন্ত" "আ আরে বর্ষা" আ আরে বাসনা" "আ আরে মামী" "আ আরে ভাগিনা" "বাহবারে হাওয়া" "পায় পায় পায়না" "পায় পায় পায়" "ধেড়ে" প্রভৃতি সমস্যাসকল পূরণকরিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনা যে, কতই করেন আহার সঙ্খ্যা নাই। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি বাঙ্গালা হিন্দি ও সংস্কৃত-মিশ্রিত "চণ্ডী নাটক" নামে একখানি নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্ষোভের বিষয় যে, উহা সমাপন করিয়া যাইতে পারেন নাই। ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমসময়ে তিনি মহারাজকৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ নিযুক্ত হয়েন এবং ৪৮ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৬৮২ শকে পরলোকযাত্রা করেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালাসাহিত্যসংসারের যে ক্ষতিটী হইয়াছে, তাহা আজিও—একশত বৎসরের অধিককাল মধ্যেও—কেহই পূরণ করিতে পারিলেন না।

এস্থলে ইহাও লেখা আবশ্যক যে, কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালেই তিনি আপন ইচ্ছা ও রাজার অনুমতি অনুসারে পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বাটীর সমীপে ফরাসডাঙ্গার পরপারবর্ত্তী মূলাজোড় নামক গ্রামে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া সেইখানেই পরিবারাদি আনয়ন পূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন। রাজা ঐ গ্রামখানি প্রথমে তাঁহাকে ইজারা দেন; পরে কোন কারণবশতঃ বর্দ্ধমানরাজের একজন কর্ম্মচারী রামদেবনাগকে উহা পুনর্ব্বার ইজারা দিতে হইয়াছিল। উক্ত নাগ ভারতচন্দ্র ও অপরাপর লোকের প্রতি অত্যাচার করায় গুণাকর নাগাষ্টক নামে ৮টী সংস্কৃত শ্লোকদ্বারা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট নিজদুঃখ নিবেদনকরিয়াছিলেন। এই সকল শ্লোকে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এভিন্ন তাঁহার রচিত আরও অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক আছে, তন্মধ্যে পঞ্চচামর ছন্দে একটী গঙ্গাষ্টক আছে। উহা রহস্যসন্দর্ভের প্রথম পর্ব্বস্থ নবমখণ্ডের ১৩৯ পত্রে একবার প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ছাড়া পারসী হিন্দি শ্লোকও তিনি রচনা করিতেপারি-

তেন। তাঁহার গ্রন্থমধ্যেও স্থানে স্থানে ইহার নিদর্শন আছে। পূর্ব্বোক্ত মূলাজোড়গ্রামেই ভারতচন্দ্রের বংশীয়েরা বাস করিতেছেন।

অন্নদামঙ্গল—রায়গুণাকরের গ্রন্থের মধ্যে অন্নদামঙ্গলই বৃহৎ ও প্রধান। এই গ্রন্থের তিনটী ভাগ আছে। তন্মধ্যে প্রথমভাগে দেব-দেবীর বন্দনা হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টিপ্রকরণ, দক্ষযজ্ঞ, হরপার্ব্বতীর বিবাহ, শিবের ভিক্ষা পর্য্যন্ত যাহা যাহা বর্ণিত আছে, তাহা কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর অনুকৃতি। তৎপরে—অন্নপূর্ণামাহাত্ম্য, কাশীনির্ম্মাণ, ব্যাসদেবের আচরণ, তাঁহার অপর কাশীনির্ম্মাণচেষ্টা, ব্যাসের প্রতি অন্নপূর্ণার ছলনা প্রভৃতি বর্ণনসকল কিয়ৎপরিমাণে কাশীখণ্ডমূলক। অনন্তর বসুন্ধরে অন্নদার শাপ, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, নলকূবরে দেবীর শাপ, ভবানন্দ মজুন্দারের জন্মবিবণ, হরিহোড়কে ত্যাগকরিয়া অন্নপূর্ণার ভবানন্দ-ভবনে গমন ইত্যাদি বিবরণ সকল কবির স্বকপোলকল্পিত। এই ভবানন্দমজুন্দারকে দেবাংশ বলিয়া বর্ণনকরা মহারাজকৃষ্ণচন্দ্রের অভি-প্রেত ছিল; কারণ তাঁহার দেবাংশতা প্রথিত হইলে মহারাজের বংশের গৌরব হয়—যেহেতু মহারাজ উক্ত ভবানন্দ মজুন্দারেরই বংশীয় এবং উহাঁর অত্যতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র।

যাহাহউক, যদিও এই প্রথম ভাগের অনেক স্থলেই ভারতচন্দ্র কবি-কঙ্কণের চণ্ডী এবং বোধহয় কোন কোন স্থলে রামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্ত্তন হইতেও অস্থি সঙ্কলনকরিয়া তদুপরি মাংসযোজনা করিয়াছেন—তথাপি ইহাতেও তাঁহার সামান্য কবিত্ব ও সামান্য পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায়নাই। উভয় গ্রন্থের সেই সেই স্থল পাঠকরিয়া দেখিলেই বিলক্ষণ অনুভব হইবে। এই গ্রন্থস্থ দক্ষকৃতশিবনিন্দা, শিবের দক্ষালয়ে গমন, দক্ষযজ্ঞনাশ, শিব-বিবাহের সম্বন্ধ, রতিবিলাপ, নারীগণের কন্দল, শিবনিন্দা, হরগৌরীর কন্দল, শিবের ভিক্ষা প্রভৃতি বর্ণনগুলি যে কিরূপ সুন্দর ও কিরূপ মধুর হইয়াছে, তাহা লিখিয়া শেষকরা যায়না। ঐ সকল স্থান যখন্ পাঠ-করাযায়, তখনই নূতন বোধহয়। বিশেষতঃ দক্ষযজ্ঞপ্রসঙ্গে ভুজঙ্গ-

প্রয়াত ও তূণক ছন্দটী যে, কিরূপ উপযুক্তস্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা ঐ স্থলের কিরূপ চমৎকারিতা জন্মিয়াছে, তাহা বর্ণনীয় নহে। আমরা কালিদাসকৃত রতিবিলাপ পাঠকরিয়াছি কিন্তু তাহাতেও—

"শিবের কপালে রয়ে, প্রভুরে আহুতি লয়ে, না জানি বাড়িল কিবা গুণ।
একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে, আগুনের কপালে আগুন ॥'
"অরে নিদারুণ প্রাণ, কোন্ পথে পতি যান, আগে যা রে পথ দেখাইয়া।
চরণরাজীবরাজে, মনঃশিলা পাছে বাজে, হৃদে ধরি লহরে বহিয়া ॥"

এরূপ মনোহর ভাব দেখিতে পাই নাই। নারদ হিমালয়ে গমনকরিয়া সখীগণের সহিত রমমাণা পার্ব্বতীকে প্রণাম করিলে, পার্ব্বতী রোষভরে যেরূপে মাতার নিকটে গিয়া যেরূপ যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা কি সাধারণলেখনী হইতে বাহির হইবার বিষয়?। শিবনামাবলী ও হরিনামাবলীর রচনা দুইটী পাঠকের রসনায় যেন নৃত্য করিতে থাকে। গঙ্গা ও ব্যাসের কথোপকথন এবং পরস্পরকৃত পরস্পর নিন্দার প্রসঙ্গে কতই পাণ্ডিত্য, কতই পরিহাসরসিকতা ও সংক্ষেপের মধ্যে মহাভারতের কতই সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা বলা যায়না। হরিহোড়ের বৃত্তান্তে দুঃখিনী পদ্মিনী বর্ণন ও হরিহোড়ের কাষ্ঠাহরণ বিবরণদ্বারা দারিদ্র্যবর্ণনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতেও কালকেতু-ব্যাধের নিকটে ভগবতীর ছলে পরিচয় প্রদান আছে সত্য বটে, কিন্তু ইহাতে ভবানন্দ মজুন্দারের গৃহে যাইবার সময়ে ঈশ্বরীপাটুনীর সমীপে অন্নপূর্ণার পরিচয়দান তদপেক্ষা অনেক বিশদ ও অনেক মনোরম হইয়াছে। ফলতঃ রায়গুণাকরের রচনার এমনই মোহিনীশক্তি যে, উহার কোন অংশের কোন দোষ নেত্রগোচর হয়না। পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ উহার কোন্ সন্দর্ভ যে, আমরা উদ্ধৃত করিব, তাহা স্থির করিতে পারিনা। যাহাহউক নিম্নভাগে দুই তিনটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

অন্নদার মোহিনীরূপ।

মায়া করি জয়া বিজয়ারে লুকাইয়া। দেখা দিলা ব্যাসদেবে মোহিনী হইয়া॥
কোটি শশী জিনি মুখ কমলের গন্ধ। ঝাঁকে ঝাঁকে অলি উড়ে মধুলোভে অন্ধ॥
ভুরু দেখি ফুলধনু ধনু ফেলাইয়া। লুকায় মাজার মাঝে অনঙ্গ হইয়া॥
উন্নত স্বয়ম্ভু শম্ভু কুচ হৃদি-মূলে। ধরেছে কামের কেশ রোমাবলী ছলে॥
অকলঙ্ক হইতে শশাঙ্ক আশা লয়ে। পদনখে রহিয়াছে দশরূপ হয়ে॥
মুকুতা যতনে তনু সিন্দুরে মাজিয়া। হার হয়ে হারিলেক বুক বিন্ধাইয়া॥
বিননিয়া চিকণিয়া বিনোদ কবরী। ধরাতলে ধায় ধরিধায়ে বিষধরী॥
চক্ষে জিনি মৃগ ভালে মৃগমদবিন্দু। মৃগ কোলে করিয়া কলঙ্কী হইল ইন্দু॥
অরুণেরে রঙ্গ দেয় অধর রঙ্গিমা। চঞ্চলা চঞ্চলা দেখি হাস্যের ভঙ্গিমা॥
রতন কাঁচুলী শাড়ী বিজুলী চমকে। মণিময় আভরণ চমকে ঝমকে॥
কথায় পঞ্চম স্বর শিখিবার আশে। ঝাঁকে ঝাঁকে কোকিল কোকিলা চারি পাশে॥
কঙ্কণঝঙ্কার হৈতে শিখিতে ঝঙ্কার। ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিবার॥
চক্ষুর চলন দেখে শিখিতে চলনি। ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন খঞ্জনী॥
নিরূপম সেরূপ কিরূপ কব আমি। যেরূপ হেরিয়া কামরিপু হন কামী॥

অন্নদার জরতীবেশে ছলনা।

মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী। ডানি করে ভাঙ্গা লড়ী বাম কক্ষে ঝুড়ী॥
ঝাঁকড় মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি। হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়া কাঁদি॥
ডেঙ্গর উকুন নীকি করে ইলি বিলি। কোটি কোটি কাণকোটারীর কিলি কিলি॥
কোটরে নয়ন দুটী মিটি মিটি করে। চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিল অধরে॥
ঝর ঝর ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে। শুনিতে না পান কাণে শত শত ডাকে॥
বাতে বাঁকা সর্ব্ব অঙ্গ পিঠে কুঁজভার। অন্ন বিনা অন্নদার অস্থি চর্ম্ম সার॥
শত গাঁটি ছেঁড়া টেনা করি পরিধান। ব্যাসের নিকটে গিয়া হৈলা অধিষ্ঠান॥
ফেলিয়া চুপড়ী লড়ী আহা উহু করে। জানু ধরি বসিলা বিরসমুখী হয়ে॥
ভূমে ঠেকে থুতি হাঁটু কাণ ঢেকে যায়। কুঁজভরে পিঠ দাঁড়া ভূমিতে লোটায়॥
উকুনের কামড়েতে হইয়া আকুল। চক্ষু মুদি দুই হাতে চুল্‌কান চুল॥
মৃদুস্বরে কথা কন অন্তরে হাসিয়া। অরে বাছা বেদব্যাস কি কর বসিয়া॥

ঈশ্বরীপাটুনীকে ভগবতীর ছলে পরিচয় দান।

ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী। বুঝহ ঈশ্বরি! আমি পরিচয় করি॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি। জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত। পরম কুলীন স্বামী বন্দ্য বংশখ্যাত॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম। সকলের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ। কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন॥
কু কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ। কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি। জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে। না মরে পাষাণ বাপ দিল হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই। যে মোরে আপনা ভাবে তার ঘরে যাই॥

অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয়ভাগের নাম মানসিংহ! বিদ্যাসুন্দর ইহারই অন্তর্গত বৃহৎউপাখ্যান—সুতরাং উহাকেই দ্বিতীয়ভাগরূপে নির্দ্দেশ করাযাইতেপারে। জাহাঙ্গীর বাদসাহের সেনাপতি রাজা মানসিংহ, যশোহরাধিপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করিবার বাসনায় সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে যশোহরযাত্রাকালে প্রথমে বর্দ্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। তৎকালে পূর্ব্বোক্ত ভবানন্দ মজুন্দার কাননগোঁই-পদাধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি মানসিংহের বর্দ্ধমানগমনের সংবাদ প্রাপ্তহইয়া অভ্যর্থনার্থ নানাউপহারসমেত উক্ত নগরে গমনকরেন। মানসিংহ তথায় কয়েকদিন অবস্থানকরিয়া প্রসঙ্গক্রমে বিদ্যাসুন্দরের কথা শুনিতে পাইলেন এবং ভবানন্দ মজুন্দারকে সমভিব্যাহারে গ্রহণ-পূর্ব্বক সুরঙ্গাদর্শন করিতে যাইয়া তথায় মজুন্দারের মুখেই বিদ্যাসুন্দরের আদ্যোপান্ত উপাখ্যান শ্রবণ করিলেন। ফলতঃ গুণাকর ভবানন্দ মজুন্দারকেই উক্ত উপাখ্যানের বক্তা করিয়াছেন।

এস্থলে বোধহয় অনেকেরই জানিবার ইচ্ছা হয় যে, বিদ্যাসুন্দরের কাণ্ড বর্দ্ধমানে ঘটিয়াছিল কি না? এবং তথায় যে সুড়ঙ্গের কথা শোনা

যায়, তাহা কিরূপ?—ইহার প্রথম প্রশ্নের উত্তর লেখা অনাবশ্যক। কারণ বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় অলৌকিক কাণ্ড কোথাও কখন বাস্তবিক ঘটে? কি কেবল কবিদিগের কল্পনাবলেই সঙ্ঘটিত হয়? তাহা লিখিবার প্রয়োজন নাই—বিজ্ঞ পাঠকগণ বুঝিয়া লইবেন। কিন্তু যেরূপ শোনাযায়, তাহাতে বোধহয়, বিদ্যাসুন্দরের কাণ্ড উজ্জয়িনী-নগরে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল বলিয়া বররুচিকর্ত্তৃক বর্ণিত আছে। রামপ্রসাদসেনের জীবনবৃত্তে উল্লিখিত সংস্কৃত 'সুন্দরকাব্য' রচয়িতাই হউন বা যে কেহই হউন, বোধহয় প্রথমে উহাকে দূরদেশ হইতে আপনদেশ বর্দ্ধমানে আনিয়া স্থাপিত করেন; তৎপরে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রও দেশের মায়ায় মুগ্ধহইয়া তাহার অন্যথা করিতে পারেন নাই। যাহাহউক, উক্ত কয়েকখানি গ্রন্থরচনার পূর্ব্বে বর্দ্ধমানে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান ও সুড়ঙ্গের কথা প্রচারিত ছিল, তাহা আমাদের বোধহয়না। এমন কি বোধহয়, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচনার পর হইতেই লোকে ঐ কল্পিতকাণ্ডের ক্রমে ক্রমে স্থানসমাবেশ করিয়া দিয়াছে। যাহাহউক তত্রত্য সুরঙ্গার অবস্থা—যাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহা—নিম্নভাগে লিখিত হইল।

আমরা যৎকালে বর্দ্ধমানে ছিলাম, তখন্ একদিন—১৮৬৩ খৃঃ অব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি—কয়েকজন বন্ধুসহ সুরঙ্গাদর্শনার্থ কৌতুকাকুলিতচিত্তে বাসাহইতে নির্গত হইলাম এবং ইহাকে উহাকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অনেক অনুসন্ধানের পর নগরের প্রান্তবর্ত্তী পীরবর্হাম্ নামক একটী স্থানে উপস্থিত হইলাম। ঐ স্থানে বাঁকা নদীর নিজ উত্তরতীরেই একটী প্রাচীন ইষ্টকময় বাটীর ভগ্নাবশেষ স্তূপাকারে রহিয়াছে ও তদুপরি বন জঙ্গল অনেক হইয়াছে, দেখিতে পাওয়াগেল। ঐ স্থানেই সুরঙ্গ আছে, এই কথা তত্রত্য কয়েকজন লোক বলিয়া দিলে আমরা বহুকষ্টে তথায় উঠিলাম, কিন্তু দেখিলাম কোন ভগ্নাবশিষ্ট গৃহের মধ্যভাগে একটী পীরের আস্তানা আছে। একজন

ফকীরের মত লোক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সির্ণির জন্য পয়সা চাহিল। তাহাকেই সুড়ঙ্গের কথা জিজ্ঞাসা করায়, সে ঐ আস্তানারই পার্শ্ববর্ত্তী ভগ্নপ্রাচীরস্থ কুলুঙ্গির মত একটী গর্ত্ত দেখাইয়াদিল--কিন্তু তাহা দেখিয়া আমাদের পরিশ্রম পোষাইল না। পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ কহিল যে, "এই স্থানকেই বিদ্যাপোঁতা কহে; ইহার একক্রোশ পূর্ব্বে 'বীরহাটা' নামক যে স্থান আছে, ঐ খানেই রাজা বীরসিংহের রাজভবন ছিল—এবং ইহার একক্রোশ দক্ষিণে দামোদরের সমীপে মালিনীপোঁতা আছে, ঐ স্থানে হীরামালিনীর বাটী ছিল; সুড়ঙ্গের অপর প্রান্তের চিহ্নও তথায় আছে" ইত্যাদি। আমরা পূর্ব্বে একথাও কাহার কাহার মুখে শুনিয়াছি যে, মালিনী সুন্দরের নিকট হইতে হাটে যাইবার সময়ে——

"নাগর হে চলিলাম নাগরীর হাটে।"

এই যে, নাগরীহাট বা নাগরীহট্টের উল্লেখ করিয়াছে, উহা এক্ষণকার নাকুড়্ডি; এবং ঐ নাকুড়্ডির উত্তরমাঠের মধ্যে যে স্থানে 'দুর্লভা' নামে কালী আছেন, ঐ স্থানই উত্তরমশান——অর্থাৎ যেখানে সুন্দরকে কাটিতে লইয়া গিয়াছিল; সেই স্থান——বলিয়া প্রথিত। যাহা হউক আমরা বিদ্যাপোঁতাদর্শনের পর মালিনীপোঁতাদর্শনার্থ বাঁকানদী উত্তরণপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলাম কিন্তু অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন সন্ধান পাইলামনা। পরে একজন ইতরজাতীয় প্রাচীন লোক একটী উচ্চ মৃণ্ময় ঢিবি দেখাইয়া তাহাকেই মালিনীপোঁতা কহিল। সুড়ঙ্গের কথা জিজ্ঞাসা করায়, সে একটী পুষ্করিণী দেখাইয়া কহিল যে, "ইহারই ভিতরে সুড়ঙ্গ আছে; গ্রীষ্মকালে পুকুরের জল শুকাইলেও তাহা বাহির হয়না——ঢাকা থাকে। একবার একজন ঐ স্থান খুঁড়িতেগিয়া মুখে রক্ত উঠিয়া মারা পড়িয়াছিল; তদবধি আর কেহ উহা খুঁড়িতে সাহসী হয়নাই"—ইত্যাদি——

বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ—উহা অবলম্বন করিয়া অনে-

১৮

কানেক যাত্রা হইয়াছে, সুতরাং আপামরসাধারণ কেহই প্রায় উহার বিষয়ে অনবগত নহে। বিশেষতঃ গুণাকর উহাকে এমনই মধুর করিয়া গিয়াছেন যে, একবার পড়িলে কেহই আর ভুলিতে পারে না। ভারতচন্দ্রের ভিন্ন অন্যের রচিত যে, বিদ্যাসুন্দর আছে, তাহা অনেকে অবগতই নহেন; সুতরাং ঐ উপাখ্যানের এতাদৃশ সর্ব্বজনীনতা হওয়া বিষয়ে ভারতের লিপিনৈপুণ্য ভিন্ন আর কিছুই কারণ নহে। আমরাও পূর্ব্বে রামপ্রসাদাদির বিদ্যাসুন্দরের কথা জানিতাম না—ভারতের বিদ্যাসুন্দরই প্রথমে পড়িয়াছিলাম এবং তাহার অনেক ভাব আমাদের হৃদয়ে পাষাণরেখার ন্যায় একবারে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। বর্দ্ধমাননগরের বর্ণন পাঠ করিয়া উহার একখানি মানচিত্র আমাদের চিত্তপটে আবির্ভূত হইয়াছিল, এবং যত দিন আমরা বর্দ্ধমান না দেখিয়াছিলাম, তত দিন উহা অবিকৃত ছিল। ঐ মানচিত্রে বর্দ্ধমানকে কি সুখের, কি ঐশ্বর্য্যের, কি বিলাসের ও কি রমণীয়তার আধারই দেখিতে পাইতাম, বলিতে পারি না। রাজপুরীর সৌন্দর্য্য, পরিখার অলঙ্ঘ্যতা, সরোবরের চতুষ্পার্শ্বে জটাভস্মধারী অবধূত সন্ন্যাসীদের আখ্ড়া, সরোবরের রমণীয়তা, বকুলতলার বাঁধাঘাট, তথায় বিদ্যাধরীসদৃশী বর্দ্ধমানাঙ্গনাদিগের জলানয়নার্থ সবিলাসভাবে আগমন, এ সকলকাণ্ড বর্দ্ধমানে যাইলেই দেখিতেপাওয়া যায়, বলিয়া মনোমধ্যে একপ্রকার সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বর্দ্ধমানদর্শন করিবার পর তথাকার রাজপথের ধূলা লাগিয়া আমাদের সে মানচিত্রখানি মলিন হইয়াগিয়াছে, সুতরাং এখন্ তাহাতে সকলবস্তুর তাদৃশ সৌন্দর্য্য আর দেখিতে পাওয়াযায় না।

অনেকে কহিয়াথাকেন যে, বর্দ্ধমানাধিপের প্রতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ঈর্ষ্যাভাব ছিল। এই জন্য তিনি উক্ত রাজকুলে কলঙ্কারোপ করিবার অভিপ্রায়ে আপন সভাসদ ভারতচন্দ্রের দ্বারা বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান মনোমতরূপে বর্ণনা করান এবং বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান রাজবংশীয়েরাও ঐ উপাখ্যানকে আপনাদের বংশের কলঙ্ককর বোধ করিয়া অনেকদিন

পর্য্যন্ত বর্দ্ধমাননগরের মধ্যে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা করিতে দেন নাই। কিন্তু এ কথা সঙ্গতবলিয়া বোধহয় না। বীরসিংহ নামে বর্দ্ধমানে কোন রাজা ছিলেন কি না? তাহাই সন্দেহস্থল; থাকিলেও তাঁহার সহিত বর্ত্তমান রাজপরিবারের কোনরূপ সম্পর্ক ছিল, এমত বোধহয় না। সুতরাং বীরসিংহের পরিবারে কলঙ্কারোপ হইলে তাহা বর্ত্তমান রাজপরিবারে সংলগ্ন-হওয়ার কোন কারণ নাই। তদ্ভিন্ন কলঙ্কেরই বা কথা কি? যেরূপ বর্ণনা আছে, যদি তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার কর, তবে কালীর কিঙ্কর ও কিঙ্কর শাপভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বিদ্যাসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; মানবাবস্থাতেও ভগবতী সর্ব্বদা তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, এবং তাঁহারই উপদেশমতে সুন্দর অলৌকিক সন্ধিখনন করিয়া বিদ্যার মন্দিরে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন; সুন্দরের বিপৎপাত হইলে কালী স্বয়ং বিদ্যাকে আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক শ্মশানস্থলে গমন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং শাপাবসানে দুইজনকে সঙ্গে করিয়া স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেম। অতএব বিবেচনা করিতেহইবে যে, এরূপ কন্যা যে কুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং এরূপ বর যে কুলে বিবাহ করেন, সে কুল কলঙ্কিত হয়? না পবিত্র, মহোজ্জ্বল, পরমগৌরবান্বিত ও চিরস্মরণীয় হয়?—ফলকথা, বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান প্রচারের দ্বারা বর্দ্ধমানের বর্ত্তমানরাজপরিবারের প্রতি কলঙ্কারোপচেষ্টার কথা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। তবে একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমানরাজভবনে কর্ম্মচারীদিগের চক্রান্তে পড়িয়া বহুলক্লেশভোগ করিয়াছিলেন—সেই ক্রোধে, সুন্দরকে দেখিয়া নাগরীগণের স্বস্বপতিনিন্দাকরণাবসরে মুন্সী, বক্সী, পোদ্দার, দপ্তরীপর্য্যন্ত সকল রাজকর্ম্মচারীর স্ত্রীগণের চরিত্রের প্রতি গুণাকর কটুকটাক্ষ পাত করিয়াছেন।

বিদ্যাসুন্দর আদিরসপ্রধান। ইহার কয়েকস্থলে কতকগুলি অশ্লীল বর্ণনা আছে, তাহা অবশ্য বিজ্ঞদিগের রুচিতে নিন্দনীয় হইবে সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহা ছাড়িয়াদিয়া পরিলে ইহার অপর সমুদয় অংশ আগা-

গোড়া মধুর ও মনোহর। সুন্দর, মালিনী, বিদ্যা, রাণী, রাজা ও কোটাল প্রভৃতি গ্রন্থবর্ণিত পাত্রগণের চরিতগুলি যে, কিরূপ যথোচিতরূপে চিত্রিত হইয়াছে, তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করাযায়না। যদিও এই সকল চরিত পূর্ব্বে অপর চিত্রকরেরাও চিত্রিত করিয়াছিলেন, তথাপি ভারতের ন্যায় কেহই রঙ্ ফলাইতে পারেননাই। ইঁহার রচনার আদ্যোপান্তই যেন মাজাঘষা ও পরিষ্কার করা। যে অংশ পাঠ করিবে, সেই অংশেই মধুবৃষ্টি অনুভব করিবে। পঙ্‌ক্তিগুলি যেন সমস্থূল মুক্তামালা। বিশেষতঃ—

"দড়িবড়ি চড়ি ঘোড়া অমনি চাবুক।" "বাড়ী মোর ঘেরা বটে থাকি একাকিনী ॥"
"বাপ্‌ধন বাছারে বালাই যাক্ দূর। দাসীরে বলিলে মাসী ও মোর ঠাকুর ॥"
"বড়র পিরীতি বালির বাঁদ। ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ ॥"
"এস বৈস এয়ো, হৌক মেনে যেও, বল সে কেমন জন।"
"আখিবীথি সুন্দরে দেখিতে ধনী ধায়। অঙ্গুলি হেলায়ে হীরা ছুঁহারে দেখায় ॥"
"একি লো একি লো, একি কি দেখিলো, এ চাহে উহার পানে ॥"
"হাসি ঢলেপড়ে ধনী, কি বলিলা গুণমণি—" "যে বুঝি চোরের ধন বাট্‌পাড়ে লয় ॥"
"হায় বিধি পাকা আম্র দাঁড়কাকে খায়।" "ভেকে ভুলাইয়া পদ্মে ভৃঙ্গ মধু খায় ॥"
"মিছা কথা সেঁচাজল কতক্ষণ রয় ॥"

ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিগুলি পাঠমাত্র বোধহয় নিতান্ত অসামাজিকের হৃদয়েও একবারে অঙ্কিত না হইয়াথাকেনা। যাহাহউক আমরা বিদ্যাসুন্দরের অধিক অংশ উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থবাহুল্য করিবনা; কেবল প্রদর্শনার্থ একটী স্থলের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম——

গর্ভের সংবাদশ্রবণে বিদ্যার নিকটে রাণীর গমন।

——" শুনি চমকিয়া, চলে শীহরিয়া, মহিষী যেন তড়িত ॥
আকুল কুন্তলে, বিদ্যার মহলে, উত্তরিলা পাটরাণী।
উদর ডাগর, দেখি হৈল ডর, রাণীর না সরে বাণী ॥
প্রণমিতে মা রে, বিদ্যা নাহি পারে, লজ্জায় পেটের দায়।
কাপড়ে ঢাকিয়া, প্রণমে বসিয়া, বৈস বৈস বলে মায় ॥

গালে হাত দিয়া, মাটীতে বসিয়া, অধোমুখে ভাবে রাণী।
গর্ব্ভের লক্ষণ, করি নিরীক্ষণ, কহে ভালে কর হানি ॥
ওলো নিঃশঙ্কিনী, কুলকলঙ্কিনী, সাপিনী পাপকারিণী।
শাঁখিনীর প্রায়, আনিলি কাহায়, ডাকিয়া ডাক ডাকিনী ॥
ডরে মোর ঘরে, বায়ু না সঞ্চরে, ইহার ঘটক কে বা।
সাপের বাসায়, ভেকেরে নাচায়, কেমন কুটিনী সে বা ॥
না মিলিল দড়ী, নামিলিল কড়ী, কলসী কিনিতে তোরে।
আই মা কি লাজ, কেমনে একাজ, করিলি খাইয়া মোরে ॥
রাজা মহারাজ, তাঁরে দিলি লাজ, কলঙ্ক দেশে বিদেশে।
কি ছাই পড়িলি, কি পণ করিলি, প্রমাদ পাড়িলি শেষে ॥
এল কতজন, রাজার নন্দন, বিবাহ করিতে তোরে।
জিনিয়া বিচারে, না বরিলি কারে, শেষে মিটে গেলি চোরে ॥
শুনি তোর পণ, রাজপুত্রগণ, অদ্যাপি আইসে যায়।
শুনিলে এমন, হইবে কেমন, বল কি তার উপায় ॥
সন্ন্যাসীটা আছে, ভূপতির কাছে, নিত্য আসে তোর পাকে।
কি কব রাজায়, না দিল তাহায়, তবে কি এপাপ থাকে ॥
আমি জানি ধন্যা, বিদ্যা মোর কন্যা, ধন্য ধন্য সর্ব্ব ঠাঁই।
রূপগুণযুত, যোগ্য রাজসুত, হইবে মোর জামাই ॥
রাজার ঘরণী, রাজার জননী, রাজার শাশুড়ী হব।
যত কৈনু সাদ, সব হৈল বাদ, অপবাদ কত সব ॥
বিদ্যার মা ছলে, যদি কেহ বলে, তখনি খাইব বিষ।
প্রবেশিব জলে, কাতি দিব গলে, পৃথিবী বিদার দিস্ ॥
আলো সখীগণ, তোরা বা কেমন, রক্ষক আছিলি ভালে।
সকলে মিলিয়া, কুটিনী হইয়া, চূণকালী দিলি গালে ॥
তোরা ত সঙ্গিনী, এরঙ্গে রঙ্গিণী, এই রসে ছিলি সবে।
ভুলালি আমায়, দানীভাঁড়া যায়, সঙ্গীভাঁড়া যায় কবে ॥
থাক্ থাক্ থাক্, কাটাইব নাক, আগেতে রাজাকে কহি।
মাথা মুড়াইব, শালে চড়াইব, ভারত কহিছে সহি ॥

রাজার নিকটে রাণীর গমন।

"ক্রোধে রাণী ধায় রড়ে, অঞ্চল ধরায় পড়ে. আলুথালু কবরীবন্ধন।
চক্ষু ঘুরে যেন চাক, হাতনাড়া ঘনডাক, চমকে সকল পুরজন॥
শয়নগৃহেতে রায়, বৈকালিক নিদ্রাযায়, সহচরী চামর ঢুলায়।
রাণী আইল ক্রোধমনে, নূপুরের ঝন্‌ঝনে, উঠে বৈসে বীরসিংহরায়॥
রাণীর দেখিয়া হাল, জিজ্ঞাসয়ে মহীপাল, কেন কেন কহ সবিশেষ।
রাণী বলে মহারাজ, কি কব কহিতে লাজ, কলঙ্কে পুরিল সবদেশ॥
ঘরে আইবড় মেয়ে, কখন না দেখ চেয়ে, বিবাহের না ভাব উপায়।
অনায়াসে পাবে সুখ, দেখিবে নাতির মুখ, এড়াইলে ঝীর বিয়া দায়॥
কি কহিব হায় হায়, জ্বলন্ত আগুনপ্রায়, আইবড় এত বড় মেয়ে।
কেমনে বিবাহ হবে, লোকধর্ম্ম কিসে রবে, দিনেক দেখিতে হয় চেয়ে॥
উচ্চমাথা হৈল হেট, বিদ্যার হয়েছে পেট, কালামুখ দেখাইবে কারে।
যেমন আছিল গর্ব্ব, তেমনি হইল খর্ব্ব, অহঙ্কারে গেলে ছারেখারে॥
বিদ্যার কি দিব দোষ, তারে বৃথা করি রোষ, বিয়া হৈলে হৈত কতছেলে।
যৌবনে কামের জ্বালা, কদিন সহিবে বালা, কথায় রাখিব কত ঠেলে॥
সদামত্ত থাক রাগে, কোন ভার নাহিলাগে, উপযুক্ত প্রহরী কোটাল।
একভস্ম আর ছার, দোষগুণ কব কার, আমি মৈলে ফুরায় জঞ্জাল॥"

এখন্ পাঠকগণ বিবেচনাকরিয়া দেখুন যে, উল্লিখিতরূপ রচনা কি সরল, কি মধুর এবং কি স্বভাবসঙ্গত ও সময়সমুচিত! ভারতচন্দ্রের যদি আর কোন রচনাই না থাকিত, তথাপি সকল দিক্ বজায় রাখিয়া রাণীর এই একমাত্র পাকা গৃহিণীপনার বর্ণনদৃষ্টেই তাঁহাকে মহাকবি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেপারাযাইত। এমন স্বভাবসঙ্গত হৃদয়গ্রাহিণী বর্ণনা এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় কোন কবির লেখনীহইতে নির্গত হয়নাই। ইঙ্গরেজিতে পোপের ও সংস্কৃতে বাল্মীকির রচনা যেরূপ মধুর, আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গলাতে ভারতচন্দ্রের রচনাও সেইরূপ। এক্ষণকার কৃতবিদ্যদিগের অনেকে ভারতের কবিত্বের প্রতি নানারূপ উক্তি করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় ভারতচন্দ্র বাঙ্গালাকাব্যসভায় যে সিংহাসন লাভ

করিয়াছেন, তাহার নিকট ঘেঁসিতে পারে, এরূপ লোক এ পর্য্যন্ত জন্মে- নাই—পরেও জন্মিবে কি না সন্দেহ স্থল।

অন্নদামঙ্গলের তৃতীয়ভাগ প্রকৃত মানসিংহ। ইহার স্থূল বিবরণ এই যে, মানসিংহ বর্দ্ধমানহইতে যশোহরাভিমুখে যাত্রাকরিয়া ভবানন্দ মজুন্দারের বাসস্থল বাগোয়ানে উপস্থিত হইলে অন্নপূর্ণার মায়ায় তাঁহার সৈন্যের উপর তুমুল ঝড় বৃষ্টি হইল। তাহাতে অনেক সৈন্য মারাগেল এবং কয়েকদিন খাদ্যসামগ্রী কিছুই পাওয়াগেলনা। মজুন্দার ইহা শুনিতেপাইয়া অন্নপূর্ণার কৃপায় সপ্তাহকাল সমুদয় সেনার আহারের সমবধান করিলেন এবং অন্নপূর্ণার পূজার ক্রম তাঁহাকেও জানাইলে তিনিও পূজা করিয়া সমুদয় বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। পরে উভয়েই যশোহরযাত্রা করিয়া তুমুলসংগ্রামে প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করিলেন এবং বাদসাহের নিকট উপহার দিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে পিঞ্জরমধ্যে পুরিয়ালইলেন। অনন্তর মানসিংহ রাজ্যপ্রদান করাইবার আশা দিয়া ভবানন্দকে দিল্লীর রাজসভায় লইয়াগেলেন। বাদসাহ প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ে হৃষ্ট হইয়া পুরস্কারপ্রার্থনা করিবার আদেশ করিলে মানসিংহ, অন্নপূর্ণার কৃপায় ও ভবানন্দের অনুগ্রহে বিপদহইতে রক্ষা হইয়াছে, এই জন্য তাঁহাকে স্বদেশমধ্যে রাজত্ব প্রদানকরিবার নিমিত্ত বাদসাহের নিকট অনুরোধ জানাইলেন। জাহাঙ্গীর হিন্দুদেবতার ক্ষমতাবর্ণনশ্রবণে রুষ্ট হইয়া ভূত বলিয়া তাঁহাদের যথোচিত নিন্দা করিলেন। ভবানন্দ দেবনিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া সমুচিত উত্তর প্রদান করিলে বাদসাহ কুপিত হইয়া "তোদের ভূত কোথা দেখা" বলিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন—দিল্লীতে ভয়ঙ্কর ভূতের উপদ্রব হইল। জাহাঙ্গীর তাহাতে ভীত হইয়া অন্নপূর্ণাদেবীর স্তবাদি করিলে দেবী প্রসন্না হইলেন, ভূতের উপদ্রব নিবৃত্ত হইল এবং ভবানন্দমজুন্দার রাজ-

ত্বের ফরমান পাইয়া স্বদেশে আগমনপূর্ব্বক পূজাদি করিয়া কিছুদিন সুখে রাজত্ব করিলেন। অনন্তর দেবী তাঁহাকে পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত শ্রবণকরাইয়া এবং ভবিষ্যতে তাঁহার বংশে যেরূপ যেরূপ হইবে, তাহা কহিয়া চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী নাম্নী দুই পত্নীর সহিত স্বর্গধামে লইয়া গেলেন।

এই উপাখ্যানের মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে জগন্নাথপুরী, বারাণসী, অযোধ্যা ও রামচন্দ্র প্রভৃতির বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং সমুদয় অন্নদামঙ্গলকে অষ্টমঙ্গলানামে আটভাগে বিভক্তকরিয়া প্রত্যেক ভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পুনরুল্লিখিত হইয়াছে। এই ভাগের উপাখ্যানাংশে বিশেষ কিছু বৈচিত্র্য নাই। পূর্ব্বেই বলাগিয়াছে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নিজবংশের গৌরবপ্রকাশার্থই স্বকীয়পূর্ব্বপুরুষ ভবানন্দমজুন্দারকে অন্নপূর্ণার বরপুত্ররূপে বর্ণিত করিবার অভিলাষেই এই ভাগ রচনাকরান। কিন্তু কবি ইহাতেও আপনার কবিত্ব যতদূর প্রকাশকরিতেহয়, তাহার ত্রুটি করেননাই। সৈন্যমধ্যে ঝড় বৃষ্টি, প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ, মানসিংহ, জাহাঙ্গীর ও ভবানন্দের কথোপকথন, দাসু বাসুর খেদ, ভূতের উপদ্রব, বাটী আসিয়া দুই নারী লইয়া ভবানন্দের কৌতুক, সাধী মাধীর ঝগড়া, ইত্যাদি বিবরণ সামান্যকৌশলে, সামান্যপাণ্ডিত্যে ও সামান্যরসিকতা সহকারে বর্ণিত হয়নাই। যাহাহউক উহার মধ্যে অন্নদার মায়াপ্রপঞ্চে যে সকল অদ্ভুতকাণ্ড বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কি কোন পুরাণ বা তন্ত্র মূলক? কি কেবল ভয় ও বিস্ময়ের প্রাচুর্ভাব করণার্থ অদ্ভুতবর্ণনমাত্র? তাহা স্থিরকরিতে পারাগেলনা। দ্বিতীয়পক্ষই আমাদের মনে লাগিতেছে।

সমুদয় অন্নদামঙ্গলের মধ্যে মিত্রাক্ষরতার দোষ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইলনা। তবে যতিভঙ্গের দোষ স্থানে স্থানে আছে বটে, কিন্তু তাহা সামান্য। কেহ কেহ কহেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নিজ সভাসদগণদ্বারা অন্নদামঙ্গলকে বিলক্ষণরূপে বিশোধিত করাইয়াছিলেন, সেই জন্যই উহাতে দোষের ভাগ প্রায় লক্ষিত হয়না। সে কথাও সঙ্গত বোধহয়,—কিন্তু হউক তাহাতেও কবির কবিত্বের অল্পতা হয় না।

অন্নদামঙ্গলের মধ্যে ভঙ্গত্রিপদী, লঘুভঙ্গত্রিপদী, হীনপদত্রিপদী, দীর্ঘ ও লঘু চৌপদী, মালঝাঁপ, একাবলী, ললিত, ভঙ্গপয়ার, দিগক্ষরা, তূণক ভুজঙ্গপ্রয়াত, পঞ্চচামর প্রভৃতি অনেকগুলি নূতন নূতন ছন্দ আছে, তন্মধ্যে শেষোক্ত তিনটী সংস্কৃতমূলক। এই সংস্কৃতমূলক ছন্দে কয়েক স্থলে গুরুলঘুব্যত্যয়ও ঘটিয়াছে।

রায়গুণাকরের অপরগ্রন্থের নাম রসমঞ্জরী। এখানি সংস্কৃতের অনুবাদ। সংস্কৃত সাহিত্যদর্পণাদি অলঙ্কারগ্রন্থে নায়িকা ও নায়কদিগের যে সকল লক্ষণ, ভেদ ও উদাহরণাদি প্রদর্শিত হইয়াছে এবং নায়কসহায় পীঠমর্দ্দ, বিট, চেট ও বিদূষকের যে সকল স্বরূপনিরূপণাদি বর্ণিত আছে—শৃঙ্গাররসের যেরূপ লক্ষণ ও প্রকারভেদ কথিতহইয়াছে—আলম্বন, উদ্দীপন ও সাত্ত্বিকভাবের যেপ্রকার লক্ষণাদি নির্দ্দিষ্ট আছে, তৎসমুদয় বাঙ্গালাছন্দোবন্ধে ইহাতে নিবেশিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন জয়দেবের রতিমঞ্জরীতে পদ্মিনীপ্রভৃতি চারিজাতীয় স্ত্রীর ও শশকাদি চারিজাতীয় পুরুষের যেরূপ স্বরূপাদি নিরূপিত আছে, তাহাও ইহাতে অবিকল অনুবাদিত হইয়াছে। এ গ্রন্থ যে, অবশ্যই অশ্লীল হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু গ্রন্থের ভাষামাধুর্য্য ও ছন্দের লালিত্যবিষয়ে ভারতের নিকট হইতে যেরূপ আশা করিতে পারাযায়, তাহার অন্যথা হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে একটীমাত্র উদ্ধৃত করিলাম।

স্বীয়া নায়িকা।

নয়ন অমৃত নদী, সর্ব্বদা চঞ্চল যদি, নিজপতি বিনা কভু, অন্যজনে চায় না।
হাস্য অমৃতের সিন্ধু, ভুলায় বিদ্যুৎ ইন্দু, কদাচ অধর বিনা, অন্যদিকে ধায় না॥
অমৃতের ধারা ভাষা, পতির শ্রবণে আশা, প্রিয়সখী বিনা কভু, অন্য কাণে যায় না।
নতি রতি গতি মতি, কেবল পতির প্রতি, ক্রোধ হলে মৌনভাব, কেহ টের পায় না॥

আমাদের এ প্রস্তাব অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া উঠিল, অতএব ইহার আর বাহুল্য না করিয়া ভারতচন্দ্রের বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও হিন্দিতে অপর যে-সকল রচনা আছে, দিঙ্মাত্র উদাহরণস্বরূপ তাহাদের এক একটী উদ্ধৃত করিয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করিলাম।

সমস্যা—"বাহবারে হাওয়া"

পূরণ—চন্দনের দণ্ডধোরে, ফণি ফণা ছত্র কোরে, মলয় রাজত্ব হোরে, আরো রাজ্য চাওয়া।
বসন্ত সামন্ত সঙ্গে, শৈত্য গন্ধ মান্দ্য অঙ্গে, কাবেরী ভরিয়া রঙ্গে, হিমালয়ে যাওয়া॥
বিয়োগীরে কাঁদাইয়ে, সংযোগীরে ফাঁদাইয়ে, যোগি-যোগ ভাঙ্গাইয়ে, কামগুণ গাওয়া।
নর্ম্মীরে প্রকাশিয়ে, গর্ম্মীরে বিনাশিয়ে, শীতল করিলি হিয়ে, বাহবারে হাওয়া॥

নাগাষ্টকের একটী।

অয়ে কৃষ্ণ স্বামিন্ স্মরসি নহি কিং কালিয়হ্রদং পুরা নাগগ্রস্তং স্থিতমপি সমস্তং জনপদং।
যদীদানীং তত্ত্বং নৃপ ন কুরুষে নাগদমনং সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি!॥

চণ্ডীনাটক।

খট্ মট্ খট্ মট্ খুরোত্থধ্বনিকৃতজগতীকর্ণপূরাবরোধঃ
ফোঁ ফোঁ ফোঁ ফোঁতি নাসানিলচলদচলপ্রান্তবিভ্রান্তলোকঃ।
সপ্ সপ্ সপ্ পুচ্ছঘাতোচ্ছলদুদধিজলপ্লাবিতস্বর্গমর্ত্ত্যো
ঘর্ ঘর্ ঘর্ ঘোরনাদৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ কামরূপো বিরূপঃ॥

ঐ

শোন্‌রে গোঁয়ার লোগ, ছোড় দে উপাস রোগ,
মানহোঁ আনন্দভোগ, ভৈঁরবরাজ যোগমে।
আগমে লাগাও ঘীউ, কাহেকো জলাও জীউ,
এক রোজ প্যার পীউ, ভোগ এহি লোগ মে।
আপ্‌কো লাগাও ভোগ, কাম্‌কো জাগাও যোগ,
ছোড় দেও যোগ ভোগ, মোক্ষ এহি লোগমে।
ক্যা এগান ক্যা বেগান, অর্দ্ধ নার আব জান,
এহি ধ্যান এহি জ্ঞান, আর সর্ব্ব রোগ মে॥

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

অন্নদামঙ্গলের অব্যবহিত পরেই কোন ভাল বাঙ্গালাগ্রন্থ রচিত হইতে দেখাযাইতেছে না। উপরিউল্লিখিত পুস্তক অর্থাৎ গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণীই বোধহয়, অন্নদামঙ্গলের ঠিক্ পরেই রচিত। এ গ্রন্থ তত উৎকৃষ্টকবিত্বশক্তিসম্পন্ন নহে—কিন্তু ইহা প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলক্ষণ প্রচলিত, ও অনেকের শ্রদ্ধাস্পদ, এবং মনসার ভাসান, চণ্ডী ও রামায়ণের ন্যায় ইহাও চামরমন্দিরাসহযোগে সঙ্গীত হইয়াথাকে, এই জন্য ইহার বিষয়ে কিঞ্চিৎ লেখা আবশ্যক হইতেছে। কৃষ্ণনগরজিলার অন্তর্গত উলাগ্রামনিবাসী ৺দুর্গাপ্রসাদমুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থ রচনা-করেন। তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভে এইরূপে নিজপরিচয় দিয়াছেন—

"নবদ্বীপ নিবসতি, নরেন্দ্র ভূপতিপতি, গোষ্ঠীপতি-পতি যারে বলে।
তাঁর অধিকারে ধাম, দেবীপুত্র আত্মারাম, মুখুটী বিখ্যাত মহীতলে॥
খড়দহ ফুলে সার, বশিষ্ঠ তুলনা যাঁর, জায়া অরুন্ধতী ঠাকুরাণী।
কি দিব উপমা তাঁর, শিব শিবা অবতার, ব্যবহারে হেন অনুমানি॥
তাঁহার তনয় দীন, শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ক্ষীণ, যার দারা হরিপ্রিয়া সতী।
প্রত্যাদেশ হয় তারে, ভাষাগান রচিবারে, স্বপন কহিলা ভগবতী॥
কোটিচন্দ্র আভা যেন, জাহ্নবীর রূপ হেন, ব্রাহ্মণবালিকা বেশ ধরি।
নানা আভরণ গায়, রতন নূপুর পায়, বিচিত্র বসনখানি পরি॥
কহেন করুণাময়ী, শুন হরিপ্রিয়া কই, ভাষায় আমার গান নাই।
তোমার পতিরে কবে, প্রকাশ হইবে তবে, বাঞ্ছা যা করিবে দিব তাই॥
সুস্বপ্ন দেখিয়া সতী, প্রভাতে উঠিয়া অতি, ভক্তিভাবে পতিরে কহিলা।
নিবাস উলায় যার, শ্রীদুর্গাপ্রসাদ তার, কথা শুনি ভাবিতে লাগিলা॥"

দুর্গাপ্রসাদমুখোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র বা বৃদ্ধপ্রপৌত্র অদ্যাপি উলায় বাস করেন। প্রচলিত হিসাব ধরিয়া তাঁহাদের ৪।৫ পুরুষের সময় মোটামোটি গণনাকরিলে উক্ত পুস্তকের বয়ঃক্রম প্রায় ১০০ বৎসর হয়।

সূর্য্যবংশীয়রাজা ভগীরথ, তপস্যাদ্বারা প্রসাদিত করিয়া স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনয়নপূর্ব্বক কপিলশাপদগ্ধ পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্ধার-

সাধন করেন, ইহাই গ্রন্থের মূল বিবরণ। তবে অনুষঙ্গক্রমে অন্যান্য অনেক বিষয়েরও বর্ণন আছে। গ্রন্থকার কবিকঙ্কণচণ্ডীর অনুকরণে গঙ্গার উভয়পার্শ্ববর্ত্তী অনেক গ্রাম নগরাদির বর্ণনকরিয়াছেন, এবং তন্মধ্যে চাকদহের বর্ণনপ্রসঙ্গে বঙ্গদেশবাসীদিগের প্রতি অনেক বিদ্রূপ করিয়াছেন। এতাবতা দেখাযাইতেছে—বাঙ্গালদিগের সহিত এ-প্রদেশীয়লোকের বিসদৃশভাব নূতন নহে; উহা কবিকঙ্কণের সময়ে ছিল, দুর্গাপ্রসাদের সময়ে ছিল, এবং এখনও আছে। যাহাহউক এই গ্রন্থের ভাষা তত সুশ্রব্য এবং ছন্দও তত পরিশুদ্ধ হয় নাই, কিন্তু স্থানে স্থানে কবিত্বশক্তির কিছু কিছু পরিচয় পাওয়াযায়। প্রদর্শনার্থ একটী স্থল উদ্ধৃত হইল—

গঙ্গার ষষ্ঠীপূজায় নারীগণের আগমন।

"প্রেমরসে অবশেষে রামাগণ যত। রাণীপুরে বসি বেশ করে নানা মত॥
চাঁচর চিকুরজাল চিরুণে আঁচড়ি। বিনাইয়া বান্ধে খোঁপা দিয়া কেশাদড়ি॥
খোঁপায় সোণার ঝাঁপা বেণী কারো দোলে। কেহ বা পরিল সিঁথি মতি তার কোলে॥
কিবা শোভা সিন্দুর চন্দনে অতিশয়। মণিময় টীকা যেন ভানুর উদয়॥
কারো কারো ভুরু যেন কামধনু জিনি। কামের সর্ব্বস্ব ধন লয়েছে কামিনী॥
চক্ষু কারো বুঝি যেন খঞ্জনিয়া পাখী। দ্বন্দ্ব করে নাসা তিলফুল মধ্যে রাখি॥
ঢেঁড়ি চাঁপি মাকুড়ি কর্ণেতে কর্ণফুল। কেহ পরে হীরার কমল নাহি তুল॥
নাসিকাতে নথ কারো মুক্তা চুনী ভালো। লবঙ্গবেসরে কারো মুখ করে আলো॥
কিবা গজমুক্তা কারো নাসিকার কোলে। দোলে সে অপূর্ব্ব ভাব হাসির হিল্লোলে॥
কুন্দকলিকার মত কারো দন্তপাঁতি। দাড়িম্বের বীজ মুক্তা কারো দন্ত ভাতি॥
মার্জ্জিত মঞ্জনে দন্ত মধ্যে কালরেখা। মনে লয় মদনের পরিচয় লেখা॥
মুখশোভা করে কারো মন্দ মন্দ হাসি। সুধার সাগরে ঢেউ হেন মনে বাসি॥
পরিল গলায় কেহ তেনরী সোণার। মুকুতার মালা কণ্ঠমালা চন্দ্রহার॥
ধুকধুকি জড়াও পদক পরে সুখে। সোণার কঙ্কণ কারো শঙ্খের সম্মুখে॥
পতির আয়তি চিহ্ন সোহাগ যাহাতে। পরণে বাঙ্খান লোহা সকলের হাতে॥
পাঞামল পাশুলি আনট বিছা পায়। গুজরি পঞ্চম আর শোভা কিবা তায়॥
আনন্দে বসিয়া যত রসিকা কামিনী। সুখের বাজারে যেন করে বিকি কিনি॥"

উপরিউদ্ধৃত সন্দর্ভটী দর্শনকরিয়া বুঝাযাইতেছে যে, পূর্ব্বে ঝাঁপা, চাঁপি, লবঙ্গবেসর, পাতামল, পাশুলি, আনট্, কঙ্কণ প্রভৃতি যে সকল অলঙ্কার আমাদের কামিনীগণ পরিধানকরিতেন, এক্ষণে আর তাহাদের প্রায় প্রচলন নাই—তবে নিতান্তমফস্বলস্থানে কখনও ২|১টা ঐরূপ অলঙ্কার দেখিতেপাওয়াযায়। এস্থলে আর একটী বিষয়ে দৃষ্টিপাতকরা আবশ্যক হইতেছে—কবি লিখিয়াছেন, "মার্জ্জিত মঞ্জনে দন্তমধ্যে কাল রেখা"। এতদ্দর্শনে স্থির হইতেছে যে, ঐ সময়েও স্ত্রীলোকদিগের দাঁতে মিশি দিবার রীতি ছিল। তৎপূর্ব্বে রামপ্রসাদও বিদ্যার রূপবর্ণনপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন "দন্তাবলী শিশুঅলি কুন্দকলি মাঝে"। এতাবতা রামপ্রসাদের সময়েও মিশির ব্যবহার অনুমিত হইতেছে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে কোন কবি ওরূপ বর্ণন করেননাই। এমন কি, ভারতচন্দ্রও দন্তবর্ণনস্থলে "কি কাজ সিন্দূরে মাজি মুকুতার হার" এইরূপ লিখিয়াছেন। তদ্ভিন্ন কোন সংস্কৃত কবি দন্তকে কুন্দকুসুমসদৃশ ভিন্ন পক্কজম্বূফলতুল্য বলিয়া বর্ণনকরেননাই। অতএব ইহা স্থির বুঝাযাইতেছে যে, মিশি দিয়া দাঁত কালকরা আমাদের এতদ্দেশীয় প্রাচীন রীতি নহে। চীনবাসিনীরা দন্ত কৃষ্ণবর্ণ করিয়াথাকেন, বোধহয় তাঁহাদের নিকটহইতে মুসলমানীরা এবং মুসলমানীদের নিকটহইতে আমাদের কামিনীরা ঐ ব্যবহার গ্রহণকরিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে ইহাও উল্লেখকরা আবশ্যক যে, এই ব্যবহার এক্ষণে উঠিয়াযাইতেছে—কলিকাতার তন্তুবায় ও সুবর্ণবণিক্ সুন্দরীরা উহা একবারে ত্যাগকরিয়াছেন—অন্যান্য মহলেও উহার প্রচলন অতি অল্পই আছে এবং পল্লীগ্রামেও ক্রমে ক্রমে কলিকাতার তরঙ্গ প্রবেশ করিতেছে।

গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণীতে পয়ার ও ত্রিপদীচ্ছন্দই প্রায় সমুদায়, তোটক বা অন্যবিধ ছন্দ দুই একটী যাহা আছে, তাহা তত বিশুদ্ধ নহে।

গীত ও কবিতা।

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীর পর কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত রীতিমত ভাল বাঙ্গালা-গ্রন্থ অধিক হইয়াছিল কি না, তাহা বলাযায়না; কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, ১৭০০ শকের কিছু পূর্ব্ব হইতে ১৭৫০—৫৫ শক [১৮২৮—১৮৩৩ খৃঃঅ] পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে অনেকানেক মহাত্মা নানাবিষয়ের নানাবিধ গীত রচনাকরিয়াছিলেন। সেই সকল বিচিত্রপদাবলী-সমন্বিত চমৎকারজনকভাবসম্পন্ন গীতদ্বারাও বাঙ্গালাভাষার কম পুষ্টি-সাধন হয়নাই। ঐ সকল গীত এক্ষণে সমগ্ররূপে কোথাও পাওয়া-যায়না, কিন্তু সম্প্রতি কয়েক মহাশয় বহুপরিশ্রমস্বীকারপূর্ব্বক ঐ লুপ্ত-প্রায় গীতের অনেকগুলি সঙ্গ্রহকরিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহাতেই সেগুলি আবার জীবনলাভ করিয়াছে।

ঐ সকল গীতরচকদিগের মধ্যে প্রাচীনতা ও গুণগৌরব উভয়েই ৺ নিধিরামগুপ্ত সর্ব্বাগ্রে উল্লেখের যোগ্য। ইনি ১৬৬৩ শকে জন্ম-গ্রহণ করিয়া ১৭৫৬ শক [১৮৩৪ খৃঃঅঃ] পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ৯৭ বৎসর, জীবিত ছিলেন—সুতরাং ভারতচন্দ্রের মৃত্যুসময়ে ইহাঁর বয়স্ ১৯ বৎসর ছিল। আমাদের নিজ বাসগ্রাম ইলছোবার নিকটবর্ত্তী 'চাঁপ্তা' নামক গ্রামই ইহাঁর প্রকৃত বাসস্থান; পরে ইনি কলিকাতার অন্তর্ব্বর্ত্তী কুমারটুলি নামক স্থানে বাস করিয়াছিলেন। ইষ্টইণ্ডিয়াকোম্পানির অধীনে ইনি কর্ম্মকার্য্য করিতেন। আদিরসঘটিত গীতরচনায় ইহাঁর অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। ইহাঁর গীতসকল 'নিধুর টপ্পা' নামে প্রসিদ্ধ। আদিরস ভিন্ন নিধুবাবুর রচিত অন্যরূপ গীত অল্প আছে।

নিধুবাবুভিন্ন অপর গীতরচকদিগের মধ্যে রামবসু, হরুঠাকুর, রাসু-নৃসিংহ, নিত্যানন্দবৈরাগী প্রভৃতি কয়েকজন সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইহাঁরা 'কবিওয়ালা' নামে বিখ্যাত। বোধহয় 'কবি' নামক গীতপ্রণালী ইহাঁদিগের হইতেই প্রথমসৃষ্ট না হউক গৌরবাস্পদ হইয়াছিল। কবির গানে দুই দল থাকে—এক দল কোন গান গাইয়া নিবৃত্ত

হইলেই অপর দল তৎক্ষণাৎ তাহার প্রত্যুত্তররূপ গান বাঁধিয়া গাইতে আরম্ভ করে এবং সেই সকল উত্তরপ্রত্যুত্তর গীত শ্রবণকরিয়া সভাসদেরা কাহার জয়—কাহার পরাজয়—হইল, তাহার মীমাংসাকরিয়া দেন। ইহাঁদের প্রতিদলেই এক জন বা দুই জন করিয়া গীতরচক থাকেন; রামবসু হরুঠাকুর প্রভৃতি ঐরূপ গীতরচক ছিলেন। গীতরচকেরা কেহই বিদ্যাবিষয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেননা; কিন্তু আসরে বসিয়াই তৎক্ষণাৎ যথোপযুক্তরূপ প্রত্যুত্তরগীতরচনা করিবার অলৌকিকশক্তি থাকায় ইহাঁদিগকে সকলেই যথেষ্ট সমাদরকরিত। বিশেষতঃ তাদৃশ স্বল্পসময়ের মধ্যে রচিত গীতেও অসাধারণ কৌশল ও পাণ্ডিত্যপ্রকাশ থাকিত, এজন্য তাৎকালিক বিজ্ঞলোকেরা বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-মহাশয়েরা কবির গান শুনিতে বড়ই অনুরক্ত ছিলেন। যাত্রার গান-প্রণালীও তৎকালে প্রচলিত ছিল, কিন্তু ভদ্রলোকেরা কবি শুনিতে পাইলে কেহ যাত্রার নিকট ঘেঁসিতেননা। কবিতে লোকের ঐরূপ অনুরাগ হওয়ায়, উহার পরবর্ত্তী সময়েও পরাণদাস, উদয়দাস, নীলু-পাটুনি, রামপ্রসাদ, ভোলাময়রা, চিন্তাময়রা, আণ্টুনী সাহেব প্রভৃতি কয়েকজন কবিওয়ালা বিশেষগৌরবসহকারেই কালযাপন করিয়া-গিয়াছেন। এখনও কবির গানের প্রথা বর্ত্তমান আছে, কিন্তু তাহাতে লোকের সেরূপ অনুরাগও নাই সুতরাং সেরূপ ভাল গীতরচকও আর জন্মেনা। মধ্যে কবির গানের অনুকরণেই কলিকাতার ধনিসন্তানেরা 'হাফ্ আক্ড়াই' নামক গানপ্রণালীর আরম্ভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারও অপ্রচলন হইয়াছে।

রামবসু—কলিকাতার পরপারবর্ত্তী শালিকাগ্রাম ইহাঁর জন্মস্থান। ইনি ১৭০৯ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৭৫১ শকে [১৮২৯ খৃঃ অঃ] পরলোকগমন করেন। ইহাঁর রচিত গীতের প্রতি প্রাচীন লোক-দিগের বড়ই অনুরাগ দেখিতেপাওয়াযায়। অপরাপর গীত অপেক্ষা ইহাঁর বিরহবর্ণনা অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত। আমরা শুনিয়াছি,

একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞব্যক্তি রামবসুর 'বিরহ' শুনিয়া বলিয়াছিলেন "যদি আমার টাকা থাকিত, রামবসুকে লাখ্ টাকা দিতাম!"।

হরুঠাকুর—ইনি ১৬৬১ শকে কলিকাতার অন্তর্ব্বর্ত্তী সিমুলিয়া নামক স্থানে জন্মলাভ করিয়া ১৭৩৬ শকে [১৮১৪ খৃঃঅ] শরীরত্যাগ করেন। ইহাঁর প্রকৃতনাম হরেকৃষ্ণদীর্ঘাড়ী। ইনি রামবসুঅপেক্ষা বয়সে প্রাচীন ছিলেন। প্রথমে ইহাঁর পেসাদারী দল ছিলনা—সক্ করিয়া কবির দলে মিশিয়া গান গাইতেন। একদা রাজা নবকৃষ্ণ তাঁহার গানে মুগ্ধহইয়া পারিতোষিকস্বরূপ একজোড়া শাল দেন। হরুঠাকুর শালপুরস্কারে অপমানবোধ করিয়া ঢুলির মাথায় তাহা নিক্ষেপ করেন। ইহাতে রাজা প্রথমে কুপিত হন, পরে তাঁহার পরিচয় পাইয়া পরম সমাদর করেন। অনন্তর রাজা নবকৃষ্ণের প্ররোচনাতেই হরু-ঠাকুর পেসাদারীদল করিয়াছিলেন, এবং নবকৃষ্ণের মৃত্যুর পর প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক তাহা ত্যাগকরিয়াছিলেন। হরুঠাকুরের গান অনেকের মতে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

কবিওয়ালাদলের মধ্যে হরুঠাকুর ও রামবসুর মত অপর কেহই তাদৃশ প্রথিতনামা নহেন, অতএব তাঁহাদের বিষয় লিখিয়া গ্রন্থবাহুল্য না করিয়া পাঠকদিগের প্রদর্শনার্থ উহাঁদের কয়েক জনের রচিত কয়েকটী গীত নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিয়া এ প্রবন্ধ সমাপন করাগেল।

"নয়ননীরে কি নিবে মনের অনল। সাগরে প্রবেশি যদি না হয় শীতল॥
তৃষায় চাতকী মরে, অম্বুবারি নাহি হেরে, ধারাজল বিনা তার সকলই বিফল॥
যবে তারে হেরি সখি, ঝরিবে বরিষে আঁখি, সেই নীরে নিবে জানি অনল প্রবল॥"

(নিধুবাবু)

সখীসংবাদ।—মহড়া।

"ইহাই কি তোমারি, মনে ছিল হরি, ব্রজকুলনারী, বধিলে। বলনা কি বাদ সাধিলে॥—
নবীনো পিরীতো, না হইতে নাথো, অঙ্কুরে আঘাতো, করিলে॥

চিতেন।

একি অকস্মাতো, ব্রজে বজ্রাঘাতো, কে আনিল রথো, গোকুলে।
অক্রূরো সহিতে, তুমি কেন রথে, বুঝি মথুরাতে, চলিলে॥

অন্তরা।

শ্যাম ভেবে দেখ মনে, তোমারি কারণে, ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী।
নাহি অন্য ভাবো, শুন হে মাধবো, তোমারি প্রেমেরো প্রয়াসী॥" (হরুঠাকুর)

বিরহ।—মহড়া।

"মনে রৈল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে, যখন্ যায়গো সে, তারে বলি বলি বলা হলো না।
শরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে, নিলজ্জা রমণী বলে হাসিতো লোকে।
সখি ধিক্ থাক্ আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে, নারীজনম যেন করেনা॥

চিতেন।

একে আমার এ যৌবনকাল, তাহে কাল বসন্ত এলো।
এ সময় প্রাণনাথো প্রবাসে গেলো।
যখন্ হাসি হাসি সে আসি বলে,—সে হাসি দেখে ভাসি নয়নের জলে॥
তারে পারি কি ছেড়েদিতে, মন চায় ধরিতে, লজ্জা বলে ছি ছি ধরোনা॥"

ইঙ্গরেজদিগের কৃত বাঙ্গালার উন্নতি।

পূর্ব্বোল্লিখিত কবিওয়ালাদিগের সমকালে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতেও ভারতবর্ষাগত কয়েকজন ইঙ্গরেজমহোদয়দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার অনেক উন্নতি হইয়াছিল। ইঙ্গরেজেরা যদিও ১৬৮৭ শকে [১৭৬৫ খৃঃ অঃ] বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি ১৬৯৪ শকের [১৭৭২ খৃঃ অঃ] পূর্ব্বে তাঁহারা রাজ-

কার্য্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণকরেন নাই। উক্ত অব্দে তাঁহারা ঐ ভার গ্রহণ করিলে এতদ্দেশীয় ভাষা প্রভৃতি শিক্ষাকরা ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীদিগের আবশ্যক হইয়া উঠিল। ঐ সময়ে অসাধারণ-বুদ্ধিশক্তি-সম্পন্ন হালহেড্ সাহেব সিবিলি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া এতদ্দেশে ছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমপূর্ব্বক বাঙ্গালা পাঠকরিয়াছিলেন, এবং বোধহয় ইঙ্গরেজদিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে এই ভাষায় বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। ১৭০০ শকে [১৭৭৮ খৃঃ অঃ] তিনি বাঙ্গালাভাষার এক ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। ইহাই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ। তৎকালে কলিকাতায় মুদ্রাযন্ত্র ছিলনা; বিশেষতঃ বাঙ্গালার ছাপা অক্ষর তৎপূর্ব্বে সৃষ্ট হয় নাই। চিরস্মরণীয় চার্লস্ উইল্কিন্স্ নামা এক সাহেব ঐ সময়ে এদেশে অবস্থিত ছিলেন। তিনি প্রগাঢ়পরিশ্রমসহকারে সংস্কৃত প্রভৃতি এদেশের নানাভাষা অধ্যয়নকরিতে আরম্ভ করেন। তিনি অতিশয় শিল্পদক্ষ ও উৎসাহশীল ছিলেন। তিনিই সর্ব্বাগ্রে স্বহস্তে কুদিয়া ও ঢালিয়া একশাট বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করেন। ঐ অক্ষরে তাঁহার বন্ধু হালহেড্ সাহেবের ব্যাকরণ হুগলীতে মুদ্রিত হইয়াছিল। অতএব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, মুদ্রাযন্ত্রদ্বারা এদেশে ভাষার যে, এতদূর উন্নতি হইয়াছে, উল্লিখিত মহাত্মা উইল্কিন্স্ সাহেবই তাহার আদিকারণ।

১৭১৫ শকে [১৭৯৩ খৃঃ অঃ] লর্ড কর্ণওয়ালিস্ বাহাদুর যে সকল আইন সঙ্গৃহীত করেন, ফরষ্টর্ সাহেব সেই সকল আইন বাঙ্গালাতে অনুবাদকরিয়াছিলেন। এই সাহেব তৎকালে সর্ব্বাপেক্ষায় উত্তম বাঙ্গালা জানিতেন। ইহার কিয়ৎকালপরে ইনিই বাঙ্গালাভাষায় সর্ব্বপ্রথম অভিধান প্রস্তুত করেন। সে অভিধান এখন্ আর প্রায় দেখিতে পাওয়াযায়না।

১৭২১ শকে [১৭৯৯ খৃঃ অঃ] মার্সমান, ওয়ার্ড প্রভৃতি একদল পাদ্রী সাহেব শ্রীরামপুরে আসিয়া অবস্থান করেন। পাদ্রী কেরি সাহেব ঐ স্থানে আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হয়েন। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকেরা

যদিও ঐ সাহেবদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি তৎপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগের দ্বারা বাঙ্গালাভাষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। যেরূপ চৈতন্যসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিগের দ্বারা বাঙ্গালাপদ্যরচনার উন্নতি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেইরূপ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পাদ্রী সাহেবদিগের দ্বারাই বাঙ্গালাগদ্যরচনা সমধিক অনুশীলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, একথা অবশ্য স্বীকারকরিতে হইবে। ঐ সকল সাহেবেরা শ্রীরামপুরে একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনকরিয়া দেবনাগর বাঙ্গালা প্রভৃতি এতদ্দেশীয় নানাবিধ অক্ষর প্রস্তুত করাইলেন, এবং সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি, উড়িয়া প্রভৃতি নানাভাষায় বাইবেল অনু-বাদিতকরিয়া ঐ যন্ত্রে মুদ্রিত করিতে লাগিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত প্রভৃতি বাঙ্গালার প্রাচীন প্রাচীন গ্রন্থ সকলও উহাতে মুদ্রিত হইতেলাগিল। ঐ সকল পাদ্রীমহোদয়েরা ঐ সময়ে কয়েকটী বাঙ্গালাস্কুলও স্থাপনকরিয়াছিলেন। তাহারও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠ্য-পুস্তকসকল ঐ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য সর্ব্বপ্রথমে আরম্ভহওয়ায় ঐ নগর অদ্যাপি ছাপাঅক্ষর নির্ম্মাণবিষয়ে প্রাধান্যলাভ করিতেছে।

আমরা যে সময়ের কথা উল্লেখকরিতেছি, ঐ সময়ে পূর্ব্বোল্লিখিত হাল্‌হেড, উইল্কিন্স, ফর্‌ষ্টার্, কেরি, মার্সমান এবং কোল্‌ব্রুক, সর্-উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতি অনেকগুলি ইঙ্গরেজমহোদয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা প্রভৃতি এতদ্দেশীয় ভাষাসকলের অনুশীলনে ও উন্নতিবিধানে সাতিশয় যত্নবান্ হইয়াছিলেন। সুতরাং দেশীয়ভাষার উন্নতিপ্রার্থীদিগের পক্ষে উক্ত মহোদয়দিগের প্রতি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীদিগের এতদ্দেশীয়ভাষাশিক্ষার জন্য ১৭২২ শকে [১৮০০ খৃঃঅ] কলিকাতায় 'ফোর্ট্ উইলিয়মকালেজ' নামক যে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়, উক্ত সাহেবদিগের কেহ কেহ তাহাতে অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ বিদ্যালয়ের ব্যব-হারের জন্য অনেকগুলি বাঙ্গালাপুস্তক রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত কেরি সাহেব ঐ স্থানে থাকিয়াই বাঙ্গালা ও ইঙ্গরেজিতে ব্যাকরণ ও অভিধান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সে ব্যাকরণ এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, কিন্তু অভিধান এখন অনেকস্থলে দেখিতেপাওয়া যায়। ঐ অভিধানরচনায় উক্ত সাহেবের সামান্য বিদ্যা, সামান্য যত্ন ও সামান্য অধ্যবসায় প্রদর্শিত হয়নাই। মার্স্মান সাহেব উহাকেই সঙ্ক্ষিপ্তকরিয়া অভিধান প্রস্তুতকরিয়াছেন। সাহেবভিন্ন কয়েকজন বাঙ্গালীও ঐ কালেজের অধ্যাপক হইয়া কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রামরামবসু অতি কদর্য্য গদ্যে 'প্রতাপাদিত্য-চরিত' নামে এক পুস্তক লেখেন এবং পণ্ডিতবর ৺মৃত্যুঞ্জয়তর্কালঙ্কার 'প্রবোধচন্দ্রিকা' রচনাকরেন।

প্রবোধচন্দ্রিকা।

এই পুস্তকের রচয়িতা মৃত্যুঞ্জয়তর্কালঙ্কারের জন্মভূমি উৎকলদেশ। ইনি নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। কলিকাতায় ইনি প্রথমে ফোর্ট-উইলিয়ম্ কালেজের সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হয়েন; তৎপরে কিয়ৎকালের জন্য তত্রত্য সদরদেওয়ানি আদালতের জজপণ্ডিতও হইয়াছিলেন। প্রবোধচন্দ্রিকা উক্ত কালেজের ছাত্রদিগের নিমিত্তই রচিত হয়। উহা ১৭৫৫ শকে [১৮৩৩ খৃঃঅ] প্রথমমুদ্রিত হয়। তৎকালে গ্রন্থকার জীবিত ছিলেননা।

প্রবোধচন্দ্রিকা আদ্যোপান্ত সমুদয়ই গদ্যে লিখিত। ইহা নিতান্ত ক্ষুদ্র গ্রন্থ নহে। 'স্তবক' নামে ইহার ৪টী ভাগ আছে—প্রতিভাগের আবার 'কুসুম' নামে অনেকগুলি অবান্তর অংশ আছে। গ্রন্থের প্রথমেই ভাষার প্রশংসা। পরে বিক্রমাদিত্যতনয় বৈজপাল রাজা শ্রীধরাধর-নামক স্বীয় পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষা করাইবার অভিলাষে তৎসমক্ষে বিদ্যার অনেকরূপ গুণানুবাদ করিয়াছেন; তৎপরে আচার্য্যপ্রভাকরের নিকটে

বিদ্যাশিক্ষার্থ পুত্রকে সমর্পণ করিয়াছেন। প্রভাকর রাজপুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক বর্ণবিচার হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রীয় অনেক বিষয়ের উপদেশ দিয়াছেন এবং তৎপরে হিতোপদেশদানচ্ছলে লৌকিক শাস্ত্রীয় নানাকথাসমেত নানারূপ বিষয়ের নানাবিধ উপাখ্যান বর্ণন করিয়াছেন।

এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে "এই উপস্থিত গ্রন্থ যে ব্যক্তি বুঝিতেপারেন এবং ইহার লিপিনৈপুণ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাঁহাকে বাঙ্গালাভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপন্ন বলাযাইতেপারে"। একথা অযথার্থ নহে। সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষব্যুৎপন্ন ব্যতিরেকে এ গ্রন্থের সমুদয়ভাগ কেহই, বোধহয়, বুঝিতেপারেন না। এখানি সম্যক্ বুঝিতেপারিলে যে, অনেকবিষয়ে অনেক জ্ঞান জন্মে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার ইহাতে ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কার ছন্দ স্মৃতি ন্যায় সাঙ্খ্য জ্যোতিষ রাজনীতিপ্রভৃতি শাস্ত্রের কত কথাই যে, মধ্যে মধ্যে উল্লেখকরিয়াছেন তাহার সঙ্খ্যা নাই। তদ্ভিন্ন উপাখ্যানকথনাবসরে বণিক্ কৃষক গোপ সূত্রধর রজক চর্ম্মকার প্রভৃতি নানা ব্যবসায়িক স্ত্রী পুরুষ সাধারণের তত্তদ্ব্যবসায়সম্পৃক্ত চলিত ভাষাসকল এত প্রয়োগকরিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে এত প্রহেলিকা ও জনপ্রবাদের অবতারণা করিয়াছেন যে, তৎপাঠে ভিন্নজাতীয় লোকদিগের বাঙ্গালার অনেক বিষয়জ্ঞতালাভ হইতেপারে। বোধহয় এই জন্যই বাঙ্গালাপরীক্ষাপ্রদানার্থী সাহেবদিগের নিমিত্ত অদ্যাপি ঐ গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

এ সকল গুণ থাকিলেও প্রবোধচন্দ্রিকা কোনরূপে উৎকৃষ্টগ্রন্থ মধ্যে গণ্য হইতেপারেনা। এই গ্রন্থে উপদেশজনক ভূরি ভূরি কথার সমাবেশ আছে সত্যবটে, কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তার সম্যক্ সহৃদয়তার অভাবে সে সকল সুশৃঙ্খলরূপে সম্বদ্ধ হয় নাই। কোন গৃহে প্রবেশ করিয়া থালা ঘটী বাটী বস্ত্র পুস্তক পেড়া বাক্স, স্বর্ণ রৌপ্য মণি মুক্তা প্রবাল, লেপ কাঁথা ছেঁড়ামাদুর প্রভৃতি বস্তুসকল একত্র বিশৃঙ্খল ও উপর্য্য-

পরি ভাবে অবস্থাপিত দেখিলে নয়নের যেরূপ অপ্রীতি জন্মে, প্রবোধ-চন্দ্রিকাপাঠেও সেইরূপ অপ্রীতি উপস্থিত হয়;—ঐ সকল বস্তু সুশৃঙ্খল-ভাবে যথাযথস্থানে সজ্জীকৃত দেখিলে যেরূপ আহ্লাদ জন্মে, ইহাতে সে আহ্লাদ জন্মে না। তদ্ভিন্ন ইহার ভাষাও নিতান্ত বিশৃঙ্খল ও অত্যন্ত নীরস। কোন স্থল দীর্ঘদীর্ঘসমাসসমন্বিত এবং নিতান্ত অপ্রচলিত শব্দদ্বারা গ্রথিত, কোন স্থল বা একান্ত অপভ্রংশপদদ্বারা বিরচিত। কোন কোন স্থানের বাক্যের দীর্ঘতা ও বিশৃঙ্খলতা জন্য অর্থবোধই হইয়া উঠেনা। বাঙ্গালাপরীক্ষাপ্রদানার্থী সাহেব মহোদয়েরা সেই সকল স্থলে যে, কিরূপে দন্তস্ফুট করেন, তাহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। কিন্তু এস্থলে একথাও অবশ্য স্বীকারকরিতে হইবে যে, ভাষার এরূপ অপ্রাঞ্জলতাজন্য গ্রন্থকার অধিকদূষণীয় হইতে পারেন না, কারণ তিনি যে সময়ের লোক এবং যেরূপে শিক্ষিত লোক, তাহাতে তাঁহার লেখনীহইতে উহা অপেক্ষা প্রাঞ্জলতর ভাষা বহির্গত হইবে, এরূপ আশা করা একপ্রকার অসঙ্গত। আজিও সংস্কৃতশাস্ত্রে পরমপ্রবীণ মহামহোপাধ্যায় চতুষ্পাঠীর ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগকে এক-পাত বাঙ্গালা লিখিতেদিলে তাঁহারা প্রায় ঐরূপ বাঙ্গালাই লিখিয়া বসিবেন। অদ্যাপি তাঁহাদের অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, কঠিন জটিল ও দুর্ব্বোধ রচনাতেই পাণ্ডিত্যপ্রকাশ হয়। আমাদের শুনা আছে যে, একসময়ে কৃষ্ণনগররাজবাটীতে শাস্ত্রীয় কোন বিষয়ের বিচার হয়। সিদ্ধান্ত স্থির হইলে একজন স্কুলের পণ্ডিত তাহা বাঙ্গালায় লেখেন। সেই রচনা শ্রবণকরিয়া একজন অধ্যাপক অবজ্ঞা-প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন—"এ কি হয়েছে!—এ যে বিদ্যাসাগরী বাঙ্গালা হয়েছে!—এ যে অনায়াসে বোঝাযায়!!"

রামমোহনরায়ের কৃত পুস্তকসকল।

বাঙ্গালাভাষার উন্নতিচিকীর্ষু উল্লিখিত ইঙ্গরেজমহোদয়দিগের সমকালেই মহাত্মা রামমোহনরায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাঁদ্বারা বাঙ্গালাভাষার অনেক উন্নতি হইয়াছে। ১৬৯৬ শকে [১৭৭৪ খৃঃ অ] হুগলীজিলার অন্তর্ব্বর্ত্তী খানাকুলকৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাধানগরনামকগ্রামে রামকান্তরায়ের ঔরসে ইহাঁর জন্ম হয়। রামমোহন শৈশবকালে গ্রাম্য গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালায় তৎকালপ্রচলিত রীতি অনুসারে বাঙ্গালাভাষায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি পাটনানগরীতে গমনপূর্ব্বক পারসী ও আরবী অধ্যয়নকরেন। এই ভিন্নদেশীয়ভাষার অনুশীলনকালেই হিন্দুদিগের দেবদেবী প্রভৃতি সমস্তই কাল্পনিক বলিয়া তাঁহার প্রথম উদ্বোধ হয়। তৎপরে তিনি বারাণসীগমনপূর্ব্বক সংস্কৃতভাষা শিক্ষাকরিয়া বেদাধ্যয়ন আরম্ভকরেন। সংস্কৃতশাস্ত্রের প্রগাঢ় অনুশীলনদ্বারা হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁহার প্রথমোদ্ভূত বিদ্বেষভাব বিচ্ছিন্ন নাহইয়া বরং দৃঢ়বদ্ধ হইয়াউঠিল। তদনুসারে তিনি পুরাণপ্রতিপাদ্য হিন্দুধর্ম্ম যাহাতে সকলের মনহইতে অপনীতহয়, এবং “একমেবাদ্বিতীয়ম্” বচনানুসারে অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা দেশমধ্যে প্রচারিতহয়, তদর্থ যত্নবান্ হইলেন এবং তদুপায়স্বরূপ ১৬বর্ষ বয়ঃক্রমসময়েই “হিন্দুগণের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী” নামক একখানি বাঙ্গালাগ্রন্থ রচনাকরিলেন। এই গ্রন্থদর্শনে তাঁহার পিতা বড়ই বিরক্ত ও কুপিত হইলেন; তাহাতে রামমোহন দুঃখিত হইয়া পিতৃভবন পরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতবর্ষের নানাস্থানের প্রচলিত ধর্ম্মপ্রণালীর অবগতির জন্য অনেকদেশ পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে বৌদ্ধধর্ম্ম উত্তমরূপে শিক্ষাকরিবার অভিলাষে তিব্বৎদেশে গিয়া ৩ বৎসরকাল বাস করিলেন এবং তথাহইতে পুনর্ব্বার বাটী আসিয়া শাস্ত্রানুশীলনও “ব্রাহ্মধর্ম্ম” প্রচারের চেষ্টাতেই সতত উদ্যত রহিলেন।

২২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি ইঙ্গরেজি শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং ক্রমাগত ৬।৭ বৎসর পরিশ্রম করিয়া ইহাতেও বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়াছিলেন—এরূপ পারদর্শী যে, ইঙ্গরেজিভাষায় অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনাকরিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি দৃঢ়তর অধ্যবসায়সহকারে অনুশীলনকরিয়া ক্রমে ক্রমে হিব্রু লাটিন গ্রীক ফরাসী প্রভৃতি সমুদয়ে ১০টী প্রধান প্রধান ভাষায় লব্ধাধিকার হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে তিনি রঙ্গপুরের কালেক্টরের নিকট প্রথমে কেরাণীগিরি এবং পরে দেওয়ানিপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জনরব এই যে, ঐ স্থানে কর্ম্ম করিয়া তিনি বার্ষিক ১০,০০০ টাকা আয়ের এক জমীদারী ক্রয়করিতে পারিয়াছিলেন। অনন্তর ১৭৩৬ শকে [১৮১৪ খৃঃ অঃ] কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ৫০ বৎসর হইয়াছিল। কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি কেবল শাস্ত্রালোচনা এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারদ্বারা কুসংস্কারাবিষ্ট অজ্ঞানাচ্ছন্ন লোকদিগকে উৎকৃষ্টপথে আনয়ন এই দুই কার্য্যের চেষ্টাতেই সর্ব্বদা অভিনিবিষ্ট থাকিতেন। এই প্রসঙ্গে দেশীয় বিদেশীয় অনেকানেক পণ্ডিতদের সহিত তাঁহাকে সর্ব্বদাই বিচার করিতে হইত। সেই সকল বিচার প্রায় বাচনিক হইত না—লিখিত হইত। এইজন্য তাঁহাকে ইঙ্গরেজি ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই বেদান্ত উপনিষদ্ প্রভৃতি অনেক শাস্ত্রের অনুবাদ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক গ্রন্থ রচনাকরিতে হইয়াছিল। তাঁহার বিপক্ষেরাও পাষণ্ডপীড়ন ও অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনাকরিয়া তাঁহার মত খণ্ডনকরিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা কেবল তাহা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, এমত নহে—রামমোহনরায়কে ধর্ম্মনাশকারী বলিয়া পথিমধ্যে প্রহারকরিবার চেষ্টা করিতেও ত্রুটি করেন নাই। ঐ প্রহারের ভয়ে তাঁহাকে সর্ব্বদা রক্ষিবেষ্টিত হইয়া গমনাগমন করিতে হইত। কিন্তু তিনি এ সমস্ত অক্ষুব্ধচিত্তে সহ্যকরিয়া নিজ উদ্দেশ্যসাধনবিষয়ে ক্ষণমাত্র ঔদাসীন্য প্রদর্শন

করেন নাই। যে সকল লোক তাঁহার ঘোরতরবিদ্বেষী হইয়াছিলেন, তাঁহারাও তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ও ক্ষমতার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন। তিনি "ধর্ম্মতলা ইউনিটেরিয়ান্ যন্ত্রালয়" নামক একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনকরিয়া তাহাতে নিজমতানুসারী গ্রন্থ এবং বিপক্ষদিগের প্রদত্ত দূষণার উত্তরসকল মুদ্রিতকরিয়া প্রকাশকরিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

কলিকাতার বর্ত্তমান 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রধানতঃ তাঁহা কর্ত্তৃকই ১৭৫০ শকে [১৮২৮ খৃঃ অঃ] প্রথম সংস্থাপিত হয়। ১৭৫১ শকে [১৮২৯ খৃঃ অঃ] রাজবিধিদ্বারা যে, হিন্দুজাতীয় সতীদিগের মৃতপতির সহিত সহমরণপ্রথা নিবারিত হয়, রামমোহনরায় তদ্বিষয়েও একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। প্রাচীন হিন্দুসম্প্রদায় রামমোহনরায়ের এই সকল কার্য্যকলাপসন্দর্শনে মহাদুঃখিত, ভীত ও কুপিত হইলেন এবং হিন্দুধর্ম্মের সংরক্ষণার্থ 'ধর্ম্মসভা' নামে এক সভা সংস্থাপনকরিলেন। কিছুকালপর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্ম্মসভায় নানারূপ তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। এক্ষণে সে ধর্ম্মসভা আর জীবিত নাই।

রামমোহনরায় বহুদিন হইতে বিলাত যাইবার জন্য বড়ই অভিলাষী ছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার সুযোগ হইয়াউঠেনাই। এক্ষণে দিল্লীর বাদসাহ তাঁহার নিজের কোন কার্য্যসাধনের উদ্দেশে তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি প্রদানপূর্ব্বক বিলাত পাঠাইতে প্রস্তুত হইলেন, তদনুসারে তিনি ১৮৩০ খৃঃ অব্দের ১৫ই নবেম্বরে অপর তিনজন দেশীয় লোক সমভিব্যাহারে বিলাতযাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে বোধহয় কোন হিন্দু বিলাতগমন করেননাই। বিলাতে যাইবার সময়ে জাহাজে তিনি কেবল শাস্ত্রানুশীলন, ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়াই পরমানন্দে কালযাপন করিতেন। ইঙ্গলণ্ডে উপস্থিত হইলে তত্রত্য প্রধান প্রধান লোকেরা তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্মানুরাগ ও বাক্পটুতা প্রভৃতির আধিক্য দেখিয়া তাঁহার পরম সমাদর ও মহাসম্ভ্রম

করিয়াছিলেন। তিনি ইঙ্গলণ্ডে কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়াই ফ্রান্সে গমন করেন এবং তথা হইতেই রুগ্ন হইয়া পুনর্ব্বার ইঙ্গলণ্ডে যান এবং সেই স্থানেই ১৮৩৩ খৃঃ অব্দের ২৭এ সেপ্টেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যু-কালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর হইয়াছিল। ব্রিষ্টল্‌নগরের সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার শব সমাহিত হইয়াছে।

'পৌত্তলিকদিগের ধর্ম্মপ্রণালী' 'বেদান্তের অনুবাদ' 'কঠোপনিষদ্' 'বাজসনেয়সংহিতোপনিষদ্' 'মাণ্ডুক্যোপনিষদ্' 'পথ্যপ্রদান' প্রভৃতি রামমোহনরায়রচিত যে কয়েকখানি বাঙ্গালাপুস্তক দেখিতে পাওয়া-যায়, তৎসমস্তই শাস্ত্রীয়গ্রন্থের অনুবাদ এবং পৌত্তলিকমতাবলম্বী প্রাচীন ভট্টাচার্য্যমহাশয়দিগের সহিত বিচার। ঐ সকল বিচারে তিনি নিজের নানাশাস্ত্রবিষয়ক প্রাগঢ় বিদ্যা, বুদ্ধি, তর্কশক্তি, শাস্ত্রের সারগ্রাহিতা, বিনয়, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি ভূরি ভূরি সদ্‌গুণের একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। নিবিষ্টচিত্তে সে সকল অধ্যয়নকরিলে চমৎকৃত ও তাঁহার প্রতি ভক্তিরসে আপ্লুত হইতে হয়। সে সকল ধর্ম্মসম্পৃক্ত-বিষয় এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে প্রদর্শনকরান আমাদিগের অভিমত নহে, ইচ্ছা হইলে তাঁহারা সেই সকল গ্রন্থ পাঠকরিয়া দেখিতে পারিবেন। যাহাহউক ইহা অবশ্য স্বীকারকরিতে হইবে যে, রাম-মোহনরায়ের সময়েই তাঁহার রচিত উল্লিখিতরূপ গ্রন্থসকল এবং তদুত্তরে পৌত্তলিকমতাবলম্বী ভট্টাচার্য্যমহাশয়দিগের রচিত গ্রন্থ ও পত্রিকা সকলের দ্বারাই বিশুদ্ধভাবে বাঙ্গালাগদ্যরচনার রীতি প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

রামমোহনরায়রচিত ধর্ম্মসম্পর্কশূন্য অপর কোন গ্রন্থ আছে কি না, তাহার সন্ধান পাওয়াযায়নাই। কেবল 'গৌড়ীয়ভাষার ব্যাকরণ' নামে একখানি ব্যাকরণ দেখিতেপাওয়াযায়। উহা তিনি মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত বিলাতগমনের পূর্ব্বে কলিকাতাস্কুলবুকসোসাইটীকে প্রদানকরিয়া যান। অল্পমূল্যে উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রচারকরিবার উদ্দেশে

কতিপয় ইউরোপীয় ও দেশীয় মহাশয়দিগের যত্নে ১৭৩৯ শকে [১৮১৭ খৃঃ অঃ] এই সোসাইটী সংস্থাপিত হইয়াছিল। রামমোহনরায়ের ঐ ব্যাকরণ উক্ত সোসাইটীদ্বারা অদ্যাপি প্রকাশিত হইতেছে। বোধ-হয় ঐ ব্যাকরণখানি বাঙ্গালাভাষার তৃতীয় বা চতুর্থ ব্যাকরণ। উহা ইঙ্গরেজীব্যাকরণের রীতি অবলম্বনকরিয়া লিখিত—উহাতে বাঙ্গালা-ভাষাশিক্ষার্থীদিগের অনেকগুলি জ্ঞাতব্যবিষয় নিবেশিত আছে। ইঙ্গরেজিতেও তাঁহার ঐরূপ একখানি ব্যাকরণ দেখিতেপাওয়াযায়। বাঙ্গালাখানি ঐ ইঙ্গরেজিরই অনুবাদ।

রামমোহনরায়ের যে আর একটী মহতী শক্তি ছিল, এ পর্য্যন্ত তাহার উল্লেখ করাযায় নাই। তিনি অত্যুৎকৃষ্ট গান রচনাকরিতেপারিতেন। তাঁহার ব্রহ্মসঙ্গীত বোধহয় পাষাণকেও আর্দ্র, পাষণ্ডকেও ঈশ্বরানু-রক্ত ও বিষয়নিমগ্ন মনকেও উদাসীন করিয়া তুলিতেপারে। ঐ সকল গীত যেরূপ প্রগাঢ়ভাবপূর্ণ, সেইরূপ বিশুদ্ধরাগরাগিণীসমন্বিত; অনেক কলাবতে সমাদরপূর্ব্বক উহা গাইয়াথাকেন। তাঁহার রচিত প্রায় দেড় শত গান আমরা দেখিতে পাইয়াছি, তন্মধ্যে নিম্নভাগে দুইটীমাত্র উদ্ধৃত করিলাম—

"মনে স্থির করিয়াছ চিরদিন কি সুখে যাবে।
জীবন যৌবন ধন মান রবে সমভাবে॥
এই আশা তরুতলে, বসিয়াছ কুতূহলে,
বিষয় করিয়া কোলে, জাননা ত্যজিতে হবে।
অরে মন শুন সার, দিবা অন্তে অন্ধকার,
সুখান্তে দুঃখেরি ভার, বহিতে হবে——
অতএব অবধান, যে অবধি থাকে প্রাণ,
ব্রহ্মে কর সমাধান, নির্ম্মল আনন্দ পাবে॥ ১॥"

"মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু, তুমি রবে নিরুত্তর।

যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া,
তার মুখ চেয়ে তত, হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,
দৃষ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ, হিম কলেবর।
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর ॥ ২ ॥

মদনমোহনতর্কালঙ্কার প্রণীত রসতরঙ্গিণী প্রভৃতি।

রামমোহনরায়ের মৃত্যুসময়ে মদনমোহনতর্কালঙ্কার যুবা পুরুষ ছিলেন। ইহাঁর জীবনবৃত্তসংক্রান্ত ২।৩ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে—তন্মধ্যে একখানি "কবিবর ৺মদনমোহনতর্কালঙ্কারের জীবনচরিত ও তদ্‌গ্রন্থসমালোচনা" নামে তাঁহার নিজজামাতার রচিত। ইহাতে সমুদয় বিষয়ের বিস্তৃত ও সঠীক সংবাদ আছে। অতএব আমরা এ বিষয়ে কিছু বাহুল্য না করিয়া সঙ্ক্ষেপেই তাঁহার জীবনবৃত্ত প্রকটিত করিলাম।

এই মহোদয় ১৭৩৭ শকে [১৮১৫ খৃঃ অঃ] নদিয়া জিলার অন্তর্ব্বর্ত্তী বিল্বগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা ৺রামধনচট্টোপাধ্যায় কলিকাতা সংস্কৃতকালেজের একজন পুস্তকলেখক ছিলেন। তাঁহার পর তদীয় ভ্রাতা ৺রামরত্নচট্টোপাধ্যায় ঐ কার্য্য প্রাপ্তহয়েন। ইনিই প্রথমে মদনমোহনকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া সংস্কৃতকালেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। কিয়দ্দিবস তথায় থাকিয়াই মদনমোহন রোগাক্রান্ত হইয়া দেশে আইসেন এবং সেই স্থানেই কিয়ৎকাল চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। পুনর্ব্বার তিনি কলিকাতা সংস্কৃতকালেজে প্রবিষ্ট হইয়া ১৭৬৪ শক [১৮৪২ খৃঃ অঃ] পর্য্যন্ত তথায় অবস্থানপূর্ব্বক

ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রসকল ক্রমে ক্রমে অধ্যয়নকরেন। এই সঙ্গে কিঞ্চিৎ ইঙ্গরেজীও শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই পঠদ্দশাতেই শ্রীযুক্তঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগরের সহিত তাঁহার অনির্বচনীয় প্রণয় জন্মে। তৎকালে তাঁহারাই দুইজনে যে, সংস্কৃত-কালেজের সমুজ্জ্বল রত্নস্বরূপ ছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। পঠদ্দশাতেই মদনমোহন রসতরঙ্গিণী ও বাসবদত্তা নামে দুইখানি পদ্যগ্রন্থ প্রণয়নকরেন। বাল্যকালহইতেই তাঁহার অসাধারণ কবিত্বশক্তিসন্দর্শনে সুকবি ৺জয়গোপালতর্কালঙ্কার ও সহৃদয়াগ্রগণ্য গুণনিকষ পূজ্যপাদ ৺প্রেমচন্দ্রতর্কবাগীশ মহাশয় প্রভৃতি কালেজের তাৎকালিক অধ্যাপক মহাশয়েরা তাঁহার প্রতি যারপরনাই প্রীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার কবিত্বের অনুরূপ 'কাব্যরত্নাকর' এই উপাধি তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা জানিনা, কি জন্য তাঁহার বন্ধুগণকর্তৃক 'তর্কালঙ্কার' উপাধিদ্বারা সেই উপাধি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

পাঠ সমাপ্ত করিয়া তর্কালঙ্কার কলিকাতার বাঙ্গালাপাঠশালা, বারাসত বিদ্যালয়, কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম্‌কালেজ ও কৃষ্ণনগর-কালেজ, এই কয়েক বিদ্যালয়ে অধ্যাপকতা করিয়া পরিশেষে ১৭৬৯ শকে [১৮৪৭ খৃঃ অ] কলিকাতা সংস্কৃতকালেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদে অভিষিক্ত হয়েন। তাঁহার সেই সহাস্যবদনবিনির্গত রসপূর্ণ মধুর অধ্যাপনা যেখানকার যে ছাত্র একবার শ্রবণকরিয়াছেন, তিনি তাহা আর এজন্মে ভুলিতে পারিবেন না। তর্কালঙ্কার কেবল নামেই মদন ছিলেননা—রমণীয় রূপ ও সর্ব্বজন-হৃদয়াহ্লাদক রসিকতাতেও মদন ছিলেন। তিনি ৩ বৎসর মাত্র সংস্কৃতকালেজে ছিলেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই তাঁহাদ্বারা তথায় অনেকগুলি দেশহিতকর কার্য্য সংসাধিত হইয়াছিল। কলিকাতার 'সংস্কৃতযন্ত্র' নামক মুদ্রাযন্ত্র তাঁহারই যত্নে স্থাপিত এবং তাহাতে বাঙ্গালা সংস্কৃত অনেকগুলি প্রাচীনগ্রন্থ মুদ্রিত হয়। এই সময়েই শিক্ষাসমাজের সর্ব্বাধ্যক্ষ জে, ই, ডি, বেথুন

সাহেব তর্কালঙ্কারের গুণগান শুনিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করেন। নিস্বার্থ পরহিতৈষী সাহেবমহোদয় অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন এতদ্দেশীয় কামিনীদিগের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত কলিকাতায় একটী বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনকরিতে ইচ্ছুক হইলে তর্কালঙ্কারই প্রধান উদ্যোগী হইয়া হেদুয়ার তীরস্থ বালিকাবিদ্যালয়সংস্থাপনে তাঁহার সহায়তা করেন এবং "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াঽতিযত্নতঃ" মহানির্ব্বাণতন্ত্রের এই বচন উদ্ধৃতকরিয়া সাধারণের যাহাতে স্ব স্ব বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষাপ্রদানে অনুরাগ জন্মে, তদর্থ বিবিধরূপে উৎসাহ দেন এবং দেশে সমাজচ্যুত হইবার ভয়েও ভ্রূক্ষেপ নাকরিয়া দৃষ্টান্ত দর্শাইবার জন্য আপনার দুই কন্যাকে ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ প্রেরণকরেন। তিনি ইহা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন এমত নহে—কিয়ৎকালপর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্বয়ং ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা করিতেন। এই সময়ে শিশুবোধক ও নীতিকথা প্রভৃতি ভিন্ন বালকবালিকাদিগের পাঠোপযোগী কোন ভাল পুস্তক ছিলনা; তর্কালঙ্কারই সর্ব্বপ্রথমে সেই অভাবের পূরণার্থ ৩ ভাগ শিশুশিক্ষা প্রণয়নকরেন। এই সময়েই সর্ব্বশুভকরীনাম্নী একখানি মাসিকপত্রিকা তাঁহারই যত্নে প্রচারিত হইয়াছিল। ঐ পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে তাঁহার রচিত এমত একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যাহা দেখিয়া অনেকে বলিয়াছেন যে, সেরূপ ওজস্বিনী বাঙ্গালারচনা তৎপূর্ব্বে আর কখনই প্রকাশিত হয়নাই। এই সকল কার্য্যের নিমিত্ত বেথুনসাহেব তর্কালঙ্কারের প্রতি যারপরনাই পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন; এবং তর্কালঙ্কারের কোনরূপ উপকার করিবার জন্য সতত সচেষ্ট ছিলেন, কিন্তু তর্কালঙ্কার তেজস্বিতাবশতঃ এই কার্য্যের জন্য কোনরূপ উপকারপ্রাপ্তির প্রত্যাশা করেননাই।

১৭৭২ শকে [১৮৫০ খৃঃঅ] তর্কালঙ্কার মুর্শীদাবাদের জজ পণ্ডিত হইয়া কলিকাতা ত্যাগকরেন এবং ক্রমাগত ছয় বৎসরকাল ঐ কার্য্য করিয়া এই স্থানেই ডেপুটীমাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হয়েন। বড়ই

দুঃখের বিষয় যে, মুর্শীদাবাদ আগমনের পর তিনি গ্রন্থরচনা একবারে ত্যাগকরিয়াছিলেন। কলিকাতায় তাঁহার যে সকল মনোবৃত্তি যেরূপ প্রবল ছিল, মুর্শীদাবাদে তাহা সেরূপ ছিলনা, এই জন্যই সুধীরঞ্জন * রচয়িতা বঙ্গভাষাও ইঙ্গরেজিভাষার পরস্পর বিবাদোপলক্ষে কহিয়াছেন———

"কবির অভাব কিসে দেখিলে আমার। দুইজন আছে দেশ বিখ্যাত কুমার॥
সুকবি সুন্দর মম মদনমোহন। পড়িলে কবিতা তার মুগ্ধ হয় মন॥
প্রাণের ঈশ্বরগুপ্ত প্রভাকরকর। ধরিয়াছে কিবা দৈবশক্তি মনোহর॥
চাহিলে তপনপানে দুনয়ন ধরে। জুড়ায় যুগল আঁখি তার প্রভাকরে॥" (বঙ্গভাষা)
"ভাল আশা সুবদনি! করিয়াছ মনে। বাড়াবে তোমার মান এরা দুই জনে॥
এতদিন তুমি কি গো করোনি শ্রবণ। মদন কবিতা আর করেনা রচন॥
ক্রমে ক্রমে তার যত বাড়িতেছে পদ। তোমায় ভাবিছে মনে বালাই আপদ॥
তোমার ঈশ্বরগুপ্ত কবিতারচক। লোকের হিতের হেতু লেখেনা পুস্তক॥" (ইঙ্গরেজিভাষা)

মুর্শীদাবাদ (বহরম্পুর) ত্যাগকরিয়া তিনি এই জেলারই অন্তর্ব্বর্ত্তী কান্দীনামক স্থানে ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট হইয়া গমন করেন এবং ঐ স্থানেই ১৭৭৯ শকে [১৮৫৮ খৃঃ অঃ] ওলাউঠারোগে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার অনেকগুলি পুত্র ও কন্যা জন্মিয়াছিল। এক্ষণে তিনটী কন্যামাত্র জীবিত আছেন—তাঁহাদেরও কেহ কেহ পৈতৃক কবিত্বশক্তির কিঞ্চিৎ উত্তরাধিকারিণী হইয়াছেন। তর্কালঙ্কার দেশীয় কামিনীদিগের উন্নতিবিধানার্থ বিস্তর ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। বালিকাবিদ্যালয়ে কন্যাপ্রেরণ ও

---

* কৃষ্ণনগরকালেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র গোস্বামীদুর্গাপুরনিবাসী ৺দ্বারকানাথঅধিকারী এই গ্রন্থ প্রণয়নকরেন। ইহাতে গদ্য ও পদ্যে অনেকগুলি নীতিগর্ভপ্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। রচনা বিশুদ্ধ বটে—সকল রূপকগুলিই ভাল না লাগুক, অনেকগুলি বিলক্ষণ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। ১৭৭৭ শকে [১৮৫৫ খৃঃঅঃ] এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। দুঃখের বিষয় গ্রন্থকার কিছু অধিক দিন জীবিত থাকিয়া আর কোন রচনায় হস্তক্ষেপ করিতে পারেননাই—অকালেই কালকবলে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু যাহা করিয়াছেন, তাহাই তাঁহাকে অনেক দিন পর্য্যন্ত সজীব করিয়া রাখিবে।

বিধবাবিবাহের সহায়তাকরণ অপরাধে তাঁহাকে নিজ বাসগ্রামে ৮। ৯ বৎসর সমাজবহিষ্কৃত হইয়া থাকিতে হইয়াছিল।

রসতরঙ্গিণী।—এই গ্রন্থখানি তর্কালঙ্কারের প্রথম রচনা। ইহা আদিরসসংক্রান্ত কতকগুলি সংস্কৃত (অধিকাংশ উদ্ভট) শ্লোকের পদ্য অনুবাদ। অনুবাদকর্ত্তা ঐ অনুবাদেই আপন কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। সংস্কৃতকবিতার ওরূপ সরল ও মধুর অনুবাদ, বোধহয় ভারতচন্দ্র ভিন্ন আর কেহই করিতে পারেননাই। তর্কালঙ্কারের রচিত সকলকবিতা অপেক্ষা ইহাই সমধিক মধুর বোধহয়। কিন্তু ইহার আদ্যোপান্ত নিরবগুণ্ঠন আদিরসময় হওয়ায় সর্ব্ববিধ পাঠকের তৃপ্তিকর হয়না। যাহাহউক আমরা পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ উহার দুইটী সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার অনুবাদ নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম—

"কমলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে শশিকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে।
ইতি বিধি র্বিদধে রমণীমুখং ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ॥"

"নলিনী মলিনী হয় যামিনীর যোগে। দ্বিজরাজ হীনসাজ দিবসের ভাগে॥
ইহা দেখি বিধি কৈল রমণীর মুখ। দিবারাতি সমভাতি দৃষ্টিমাত্রে সুখ॥
অতএব একবারে বিজ্ঞহওয়া ভার। দেখিয়া শুনিয়া হয় নৈপুণ্য সবার॥"

"ইন্দীবরেণ নয়নং মুখ মম্বুজেন কুন্দেন দন্ত মধরং নবপল্লবেন।
অঙ্গানি চম্পকদলৈঃ সবিধায় ধাতা কান্তে কথং ঘটিতবানুপলেন চেতঃ॥"

"নয়নে কেবল, নীল উতপল, মুখে শতদল, দিয়ে গড়িল।
কুন্দে দন্তপাঁতি, রাখিয়াছে গাঁথি, অধরে নবীন, পল্লব দিল॥
শরীর সকল, চম্পকের দল, দিয়ে অবিকল, বিধি রচিল।
তাই ভাবি মনে, ওলো কি কারণে, পাষাণে তব, মন গড়িল॥"

বাসবদত্তা—তর্কালঙ্কারের দ্বিতীয়গ্রন্থ বাসবদত্তা। ১৭৫৮ শকে [১৮৩৬ খৃঃ অঃ] যশোহর জিলার অন্তর্ব্বর্ত্তী নওয়াপাড়া নামক স্থানের জমীদার ৺ কালীকান্ত রায়ের প্রবর্ত্তনায় এই গ্রন্থ রচিত হয়। সুবন্ধু নামা প্রাচীন কবি সংস্কৃত গদ্যে বাসবদত্তা নামে যে এক আখ্যায়িকা রচনাকরেন, এই গ্রন্থ তাহারই স্থূল উপাখ্যানমাত্র লইয়া পয়ারাদি নানা-

বিধ ছন্দে বিরচিত। অনেকের বোধ আছে যে, তর্কালঙ্কার মূলগ্রন্থের সমস্ত ভাব লইয়াই এই কাব্য রচনাকরিয়াছেন—ইহাতে তাঁহার নিজের কবিত্ব কিছুমাত্র নাই। কিন্তু ইহা তাঁহাদের ভ্রম। মূল বাসবদত্তার রচনা আদ্যোপান্ত অনুপ্রাস, শ্লেষ, যমক, উপমা, রূপক, বিরোধ, অসঙ্গতি প্রভৃতি শব্দ ও অর্থালঙ্কারে একবারে পরিপূর্ণ। সংস্কৃতে সে সকল অলঙ্কারে যেরূপ বৈচিত্র্য হয়, বাঙ্গালায় সে বৈচিত্র্য কোনমতেই আনিবার যো নাই। সুতরাং তর্কালঙ্কার সে দিকে হস্তক্ষেপ করেন নাই। তিনি ইহাতে যে সকল রসভাবের যোজনা করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই তাঁহার নিজের; তবে স্থানে স্থানে মূলগ্রন্থ হইতেও কোন কোন ভাব গ্রহণকরাহইয়াছে এই মাত্র। তদ্ভিন্ন তর্কালঙ্কার উপাখ্যানাংশেও মূলগ্রন্থ হইতে অনেক নূতন যোজনা করিয়াছেন।

মূলগ্রন্থের স্থূল বিবরণ এই—মহেন্দ্রনগরে চিন্তামণিনামক রাজার কন্দর্পকেতু নামে এক পুত্র ছিলেন। তিনি একদা স্বপ্নে অপরূপরূপা এক কামিনীকে দর্শনকরিয়া উন্মত্তবৎ হইয়া প্রিয়বন্ধু মকরন্দকে সমভিব্যাহারে গ্রহণপূর্ব্বক ভবন হইতে নির্গত হয়েন, এবং বিন্ধ্যাটবীতে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য এক জম্বুবৃক্ষের তলভাগে রাত্রিযাপন করেন। সেই বৃক্ষের শাখারূঢ় শুক ও শারিকার কথোপকথনশ্রবণে জানিতে পারেন যে, তিনি যে কামিনীকে স্বপ্নে দেখিয়াছেন, তিনি কুসুমপুরের রাজা অনঙ্গশেখরের কন্যা—নাম বাসবদত্তা। বাসবদত্তা স্বয়ম্বরসভায় কাহারও গলে বরমাল্য না দিয়া গৃহে গমনপূর্ব্বক স্বপ্নে কন্দর্পকেতুকে দেখিয়া অধীরা হইয়া তাঁহার অন্বেষণার্থ তমালিকানাম্নী শারিকা দ্বারা পত্রপ্রেরণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে কন্দর্পকেতু ঐ শারিকার নিকট হইতে পত্রগ্রহণ করিয়া উহারই সহিত কুসুমপুরে গমনপূর্ব্বক গোপনে একাকী বাসবদত্তার সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং শ্রবণ করেন যে, বাসবদত্তার পিতা পরদিনই অন্য বরে তাঁহার বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন; এইজন্য উভয়ে পরামর্শ করিয়া রজনীতেই পলায়নপূর্ব্বক সেই

বিন্ধ্যাটবীতে উপস্থিত হইয়া রাজকুমার নিদ্রিত হয়েন। কিন্তু নিদ্রোত্থিত হইয়া বাসবদত্তাকে না দেখিতে পাইয়া প্রায় এক বৎসরকাল বনে বনে কাঁদিয়া বেড়ান। পরিশেষে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া আকাশবাণীশ্রবণে পুনর্ব্বার বিন্ধ্যাটবীতে আগমনপূর্ব্বক প্রস্তরময়ী বাসবদত্তার গাত্রে করস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে পুনরুজ্জীবিতা করেন। অনন্তর, 'বাসবদত্তা লইবার জন্য দুই রাজার যুদ্ধ হয়, তাহাতে মুনির আশ্রমধ্বংস হয়, মুনি আসিয়া সেই ক্রোধে তাঁহাকে পাষাণময়ী হইতে শাপ দেন, এবং প্রিয়করস্পর্শপর্য্যন্ত সেই শাপের অবধি করেন' ইত্যাদি পূর্ব্ব বিবরণ বাসবদত্তার মুখেই শ্রবণ করিয়া রাজকুমার সহসাসমাগত মকরন্দ সমভিব্যাহারে পরমানন্দে গৃহে গমন করেন।

বাঙ্গালা বাসবদত্তায় বিন্ধ্যবাসিনীদর্শন, যোগমায়ার পূজা, ককারাদিক্রমে স্তব, হিরণ্যনগর ও হরিহরদর্শন, কুসুমপুরে সরোবরতীরে রাজকুমারের বিশ্রাম, তথায় ষষ্ঠীপূজোপলক্ষে নাগরিকাদিগের আগমন, বাসবদত্তা বা কামিনীর সহিত কন্দর্পকেতুর বিবাহ প্রভৃতি যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা তর্কালঙ্কারের স্বকপোলকল্পিত। ঐ উপাখ্যানবর্ণনাবসরে তর্কালঙ্কার অনেকস্থলে ভারতচন্দ্রের অনুকরণ ও তাঁহার উদ্ভাবিত ভাবাদি গ্রহণকরিয়াছেন, সত্যবটে; কিন্তু তাহা হইলেও ইঁহাকে সামান্যকবিমধ্যে গণনা করাযায় না। ইঁহার রচনা ভারতচন্দ্রের ন্যায় আদ্যোপান্ত তত সরল ও সুমার্জ্জিত না হউক, পয়ারাদি ছন্দের বিশুদ্ধপ্রণালী সম্পূর্ণরূপ অনুসৃত না হউক, কিন্তু ঐ রচনা যে, অনেকস্থলেই পরমরমণীয় ও অসাধারণ বৈচিত্র্যসংযুক্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ভারত বয়সের যেরূপ পরিপাকাবস্থায় গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন, তর্কালঙ্কার সেরূপ অবস্থায় গ্রন্থরচনা করিলে, বোধহয়, বাসবদত্তা অন্নদামঙ্গলের সমান মধুর হইতেপারিত। বাসবদত্তারচনাসময়ে তর্কালঙ্কারের বয়ঃক্রম ২১ | ২২ বৎসরমাত্র ছিল।

পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি চলিত ছন্দ ছাড়া তর্কালঙ্কার ইহাতে অনুষ্টুপ্,

তোটক, পজ্ঝটিকা, একাবলী, দ্রুতগতি, গজগতি, কুসুমমালিকা, দিগক্ষরা প্রভৃতি অনেক নূতন ছন্দ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এই সকল ছন্দ সংস্কৃতমূলক, কিন্তু তর্কালঙ্কারই তাহার অনেকগুলিকে বাঙ্গালায় প্রথম অবতারিত করিয়াছেন। এতভিন্ন তিনি গ্রন্থমধ্যে ভৈরবী, সিন্ধু, ভয়রোঁ, বেহাগ, মল্লার প্রভৃতি অনেকগুলি রাগরাগিণী এবং ঠেকা, জৎ, ছেপ্‌কা, তিওট, পোস্ত প্রভৃতি নানাবিধ তাল ব্যবহারকরিয়াছেন।

গ্রন্থবাহুল্যভয়ে আমরা পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ বাসবদত্তার অধিক অংশ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। অল্পমাত্র যাহা উদ্ধৃত হইল, ইহা- তেই তাঁহার কবিত্বের পরিচয় হইবে——

কামিনীর সজ্জা।

"হৃদি বিলসে পটুবসনা। কুচকলসে কৃতকসনা॥
স্মর অলসে মৃদুহসনা। তনু উল্লসে মদলসনা॥
জঘনতটে ধৃতরসনা। অধরপুটে স্মিতদশনা॥
জিতবরটা গজগমনা। অরুণঘটা সমচরণা॥
কনকছটা জিনি বরণা। চমরসটা কচরচনা॥
ভণতি যথাগতমতিনা। কবি মদন দ্রুতগতিনা॥"

কামিনীর রূপবর্ণন।

"কুটিল কুন্তলে কিবা বান্ধিয়াছে বেণী। কুণ্ডলী করিয়া যেন কালকুণ্ডলিনী॥
রমণীস্বরূপ মণি সদা রক্ষা করে। তার চোরে অপাঙ্গভঙ্গীর বিষে জারে॥
ভালে ভাল বিলসিত অলকা বিলাসে। মুখপদ্ম মধু আশে অলি আসে পাশে॥
শশাঙ্ক সশঙ্ক হেরি সে মুখসুষমা। ভাবি দিন দিন ক্ষীণ অন্তরে কালিমা॥
ফুলধনু ছাড়ি ধনু দেখিয়া ভ্রূধনু। অভিমানে হরহুতাশনে ত্যজে তনু॥
নাসাবংশ নয়নযুগল মাঝে শোভে। যেন বৈসে শুকপক্ষী ওষ্ঠবিম্ব লোভে॥
কিম্বা নেত্র সুধাসিন্ধু বিভাগের হেতু। তার মধ্যে বুঝি বিধি বান্ধিয়াছে সেতু॥
সুদীর্ঘ নয়ন তাতে রঞ্জিত অঞ্জন। সে চাঞ্চল্য শিখিবারে চঞ্চল খঞ্জন॥
একেত অসহ্য শর কটাক্ষ বিষম। তাহাতে অঞ্জন কটু কালকূটসম॥

কি কহিব অধর অধর করে বিম্ব। অনুমানি ত্রিভুবনে নাহি প্রতিবিম্ব॥
সে বদন বিধু অতি পরমবিভব। অধররাগেতে যেন সন্ধ্যা অনুভব॥
কুন্দ সুকুসুমসম দশনের শোভা। ঈর্ষায় দাড়িম্ববীজ বুঝি শোণ আভা॥
হাস্যমুখী সে যখন মৃদু মৃদু হাসে। পদ্মরাগোপরি কত মুক্তা পরকাশে॥
শোভে ভুজমৃণাল লাবণ্যসরোবরে। পাণিপদ্ম প্রকাশে নখররবিকরে॥

* * * * * * * * * *

সুবলনী মধ্যখানি কি বাখানি তার। আছে কি না আছে অনুমান করা ভার॥

* * * * * * *

নিজ নিপুণত্ব ধাতা জ্ঞাপন করিতে। অপরূপ রূপ তার সৃজিল জগতে॥
তার নিদর্শন দেখ এই বিপরীত। নখচন্দ্রে করে পাদপদ্ম বিকসিত॥
বুঝি মণিনূপুরের করি কলধ্বনি। পঞ্চস্বরে পঞ্চশরে জাগায় সে ধনী॥
সপ্তস্বরাস্বরসম শুনি তার স্বর। বুঝি পিক উহু উহু করে নিরন্তর॥
হেরি হরে হেন মন পুনঃ পাওয়াভার। মদনের মোহ হয় ভাবি রূপ তার॥'

স্বয়ম্বরাগত রাজগণের পূর্ব্বরজনীতে উৎকণ্ঠা।

"সন্ধ্যাসহ বন্ধ্যা আশা হইয়া সত্বরা। নৃপগণে করিতে আইল স্বয়ম্বরা॥
প্রতি নৃপতির প্রতি করিয়া সম্প্রীতি। নিশাযোগে শুভযোগে চলিল সম্প্রতি॥
বাসায় আশায় পেয়ে যতেক ভূপতি। নিদ্রা তন্দ্রা ক্ষুধা প্রতি হইল বিমতি॥
কেবল অসার আশা মনে করি সার। কাটায় সুদীর্ঘ নিশা ভাবিয়া অসার॥
আশা সঙ্গে যত সঙ্গ হয় সঙ্গোপনে। ততই আশার প্রীতি বাড়ে মনে মনে॥
আশার মহিমা সীমা কি কব কথায়। একা সবাকার মন সমান যোগায়!॥"

১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ শিশুশিক্ষা—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কলিকাতার বেথুন সাহেবের বালিকাবিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ এই তিন পুস্তক রচিত হয়। ইহার পূর্ব্বে শিশুদিগের বর্ণশিক্ষা প্রভৃতি প্রথম-হইতেই পুস্তক দ্বারা হইত না—গুরুমহাশয়েরা শিশুদিগের হস্তে প্রথমে খড়ি দিয়া ক খ প্রভৃতি কয়েকটী হল্‌বর্ণ শিখাইতেন। পরে তাল-পত্রে লেখাইয়া সমুদয় হলবর্ণ এবং ক্য ক্ক ক্ষ প্রভৃতি সমুদয় সংযুক্তবর্ণ শিখাইয়া তৎপরে "সিদ্ধি রস্তু" বলিয়া অ আ প্রভৃতি সমুদয় স্বরবর্ণ ও

তদনন্তর হল্‌বর্ণের সহিত তাহাদের যোগ হইলে কিরূপ আকারপরিবর্ত্ত হয়, সে সকল (বানান নামে) শিখাইতেন। এ স্থলে ইহাও উল্লেখকরা আবশ্যক যে, স্বরবর্ণের পূর্ব্বে "সিদ্ধি রস্তু" এই মঙ্গলাচরণসূচক প্রার্থনাবাক্য থাকায় বোধহয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা শিশুদিগকে প্রথমে স্বরবর্ণেরই শিক্ষা দিতেন, কিন্তু শুদ্ধ স্বরবর্ণে অধিক কথা লিখিতে পারাযায় না, অথচ শুদ্ধ হলবর্ণ শিক্ষিত হইলেই তদ্দ্বারা জল, ঘর, পথ, লবণ প্রভৃতি অনেক কথা লিখিতেপারাযায়, এই সুবিধাদর্শনেই, বোধহয়, পরবর্ত্তী শিক্ষকেরা পূর্ব্বরীতির পরিবর্ত্ত করিয়া প্রথমেই ক খ প্রভৃতি হল্‌বর্ণের শিক্ষাপ্রদানের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। স্কুল ভিন্ন পল্লীগ্রামের সমুদয় গুরুমহাশয়ের পাঠশালাতে অদ্যাপি এই প্রথা প্রবল আছে। কলিকাতাতেও এই প্রথাই পূর্ব্বে ছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। এখন্ সকল স্কুলেই ইঙ্গরেজি শিক্ষার অনুকরণে বহি দেখিয়াই শিশুদিগের বর্ণমালাশিক্ষা হয়। তর্কালঙ্কারের পূর্ব্বোক্ত শিশুশিক্ষারচনাই পূর্ব্বপ্রথাবিলোপের মূল বলিতে হইবে। যাহাহউক তৎকালে বালকদিগের পাঠোপযোগী প্রণালীবদ্ধ কোন ভাল পুস্তক ছিল না। তর্কালঙ্কার সেই অভাব মোচনকরিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

১ম ভাগ শিশুশিক্ষায় অ আ প্রভৃতি স্বরবর্ণ, ক খ প্রভৃতি হল্‌বর্ণ, অসংযুক্ত হল্‌বর্ণে স্বরের যোগে যেসকল ক্ষুদ্রক্ষুদ্র পদ ও বাক্য হইতে পারে তাহার উদাহরণ, এবং ২য় ভাগে সংযুক্ত হল্‌বর্ণের ঐরূপ উদাহরণ পরমপাণ্ডিত্য ও কবিত্ব সহকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম ভাগের শেষে অসংযুক্ত হল্‌বর্ণে সরল ও মধুর যে একটী কবিতা রচিত হইয়াছে, সেরূপ কবিতা সামান্যকবির লেখনী হইতে নির্গত হইবার নহে। নিম্নভাগে তাহাও উদ্ধৃত হইল। এক্ষণে ১ম ও ২য় ভাগ শিশুশিক্ষার স্থলে অনেকগুলি ঐরূপ পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় উহার কোনখানিই শিশুশিক্ষার ন্যায় কোমল, মধুর ও শিশুদিগের চিত্তাকর্ষক হয় নাই।

৩য় ভাগ শিশুশিক্ষার ন্যায় শিশুদিগের পাঠোপযোগী উৎকৃষ্ট পুস্তক বোধহয় এপর্য্যন্ত প্রস্তুত হয়নাই। উহার বিষয়গুলিও যেমন সুন্দর, রচনাও তেমনই মধুর। তর্কালঙ্কারের আর কোন গ্রন্থ না থাকিলেও তিনি এই এক শিশুশিক্ষাদ্বারাই এদেশে চিরস্মরণীয় হইতে পারিতেন। এতদ্দেশীয় সমস্ত বিদ্যালয়েই ঐ পুস্তক ব্যবহৃত হইতেছে। পূর্ব্বোল্লিখিত কবিতাটি এই—

"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল। কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল॥
রাখাল গোরুর পাল লয়ে যায় মাঠে। শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে॥
ফুটিল মালতী ফুল সৌরভ ছুটিল। পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল॥
গগনে উঠিল রবি লোহিত বরণ। আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন॥
শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর। পাতায় পাতায় পড়ে নিশীর শিশির॥
উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ। আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ॥"

ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের প্রবোধপ্রভাকরাদি।

ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত মদনমোহনতর্কালঙ্কার অপেক্ষা কয়েকবৎসরের বড় ছিলেন। তিনি ১৭৩১ শকে [১৮০৯ খৃঃ অঃ] ত্রিবেণীর পরপারস্থ কাঁচ্‌রাপাড়া নামক গ্রামে বৈদ্যবংশীয় ৺ হরিনারায়ণ গুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে কোন প্রধান বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন বা বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া বিশেষখ্যাতিপ্রতিপত্তিলাভ তিনি করিতে পারেন নাই। কিন্তু শাস্ত্রে বলে—

"কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তি স্তত্র সুদুর্লভা"

এই কবিত্ব ও শক্তি উভয়ই তাঁহার ছিল, এবং তজ্জন্যই তিনি জনসমাজে তত আদৃত ও তত সম্মানিত হইয়াছিলেন।

বাল্যাবস্থা হইতেই তিনি কবিতারচনার আরম্ভ করিয়াছিলেন। বয়োবৃদ্ধিসহকারে ঐ রচনাশক্তি প্রবল হইয়া দাঁড়াইলে তিনি উহা

প্রকাশের স্থল পাইবার মানসে ১৭৫২ শকের [১৮৩০ খৃঃ অঃ] ১৬ই মাঘ হইতে "সংবাদ প্রভাকর" নামে এক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ঐ পত্র প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে দ্ব্যাহিক ও তৎপরে ১৭৬১ শকের ১লা আষাঢ় হইতে প্রাত্যহিকরূপে বহির্গত হইতে থাকে। ঐ পত্রে গদ্য ও পদ্য দুইই থাকিত, তন্মধ্যে গদ্যের ভাগ অপেক্ষা নানাবিষয়িণী মনোহর কবিতামালাই অধিক। প্রভাকরভিন্ন সাধুরঞ্জন ও পাষণ্ডপীড়ন নামে আরও দুইখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা তাঁহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইত। এই শেষোক্ত পত্রখানির সহিত কিয়দ্দিবসের জন্য ৺ গৌরীশঙ্কর (গুড়গুড়ে) ভট্টাচার্য্যের রসরাজ নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার বিবাদ হওয়ায় উভয়পত্রই পরস্পরের নিতান্ত অশ্লীল কুৎসাবাদে পূর্ণ হইয়া একান্ত অপবিত্র হইয়াছিল। এক্ষণে পাষণ্ডপীড়ন, সাধুরঞ্জন ও রসরাজ এ তিন পত্রিকাই জীবিত নাই।

এই সকল পত্রিকার আয়তন ক্ষুদ্র ; ইহাতে তাঁহার মনোমত বিস্তৃত কাব্যপ্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হইতে স্থান পাইত না, এজন্য তিনি কয়েকবৎসর পরে বিস্তৃত আকারের একখানি মাসিক প্রভাকর প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহা নানাবিধ কবিতাবলীতেই প্রায় সমুদয় পরিপূরিত হইত। এই সময়ে তিনি ভারতচন্দ্র রায়, রামপ্রসাদ, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের জীবনচরিত অনুসন্ধান করিতে বিস্তর যত্ন করিয়াছিলেন এবং যাহা পাইয়াছিলেন, তাহা উক্ত মাসিক প্রভাকরে ক্রমশঃ প্রকাশকরিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেবল ভারতচন্দ্ররায়ের জীবন-চরিত পৃথক্ গ্রন্থরূপে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই সময়ে কলিকাতার ধনিসন্তানেরা পাঁচালী, হাফ্‌আকড়াই প্রভৃতির আমোদে বড় অনুরক্ত হইয়াছিলেন। গুপ্তকবি তাহার কোন না কোন দলে—হয় ছড়া বাঁধিয়া, নয় গীতরচনাকরিয়া, দিতেন। সুতরাং সকল সমাজেই তাঁহার যথেষ্ট সমাদর হইয়াছিল।

ঈশ্বরগুপ্ত আপনার কবিত্বশক্তি কেবল সংবাদপত্রে প্রকাশকরিয়াই

ক্ষান্ত ছিলেন—অনেক দিনপর্য্যন্ত কোন পুস্তকরচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। এই জন্যই সুধীরঞ্জনের ইঙ্গরেজীভাষা আক্ষেপ করিয়াছেন, "তোমার ঈশ্বরগুপ্ত কবিতারচক। লোকের হিতের হেতু লেখেনা পুস্তক।" সুধীরঞ্জনের এই উত্তেজনাতেই হউক, বা যে কারণেই হউক, তিনি শেষাবস্থায় প্রবোধপ্রভাকর, হিতপ্রভাকর, বোধেন্দুবিকাশ ও কলিনাটক নামে চারিখানি পুস্তক রচনাকরিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দুঃখের বিষয় কলিনাটককে সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। ১৭৮০ শকে [১৮৫৮ খৃঃ অঃ] তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৯ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার সন্তান সন্ততি কিছুই হয় নাই। তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্রগুপ্ত অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার পত্রিকাখানি চালাইয়াছিলেন। তাঁহারও মৃত্যু হওয়ায় সম্প্রতি উহা অপর কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক চালিত হইতেছে। কিন্তু এক্ষণে প্রভাকরের আর সে প্রভা নাই—

"সূর্য্যাপায়ে নখলু কমলং পুষ্যতি স্বা মভিখ্যাম্।"

প্রবোধপ্রভাকর———এই গ্রন্থে পিতাপুত্রের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে "প্রাণিতত্ত্বনিরূপণ" প্রসঙ্গে—দুঃখের ক্লেশানুভবেই লোকের সুখান্বেষণে প্রবৃত্তি হয়, লৌকিক উপায়ে দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হয়না, স্বর্গীয় সুখ চিরস্থায়ী নহে, তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা অবিনশ্বর সুখলাভ হয়, নিজ নিজ কর্ম্মানুসারেই জীবের উৎপত্ত্যাদি হয়, সৃষ্টি অনাদি, ঈশ্বর নিত্য ইত্যাদি অনেকগুলি শাস্ত্রীয় মীমাংসা বিনিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার নিজে শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন না; একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সহায়তায় গ্রন্থরচনা করাহইয়াছে। গ্রন্থে গদ্য পদ্য দুইই আছে—গদ্যে যে বিষয় উক্ত হইয়াছে, পদ্যে তাহাই আবার পুনরুক্ত হইয়াছে; সুতরাং গ্রন্থখানি অনর্থক কিছু বড় হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা সহজ, পদ্যগুলিও বেশ সরল। এই গ্রন্থ প্রথমখণ্ডমাত্র। ইহা ১৭৭৯ শকে [১৮৫৭

খৃঃ অঃ] মুদ্রিত হয়। গ্রন্থকার আর কিছুদিন জীবিত থাকিলে ইহার অপরাপর খণ্ডও বহির্গত হইত।

হিতপ্রভাকর——এই গ্রন্থও গদ্যপদ্যময়। ইহাতে গদ্য অপেক্ষা পদ্যের ভাগ অধিক। ১৭৮২ শকে [১৮৬০ খৃঃ অঃ] ইহা প্রথম-মুদ্রিত হয়; তৎকালে গ্রন্থকার জীবিত ছিলেননা। ইহাতে লিখিত 'ভূমিকার' ভাবে বোধহয়, বেথুনসাহেব কলিকাতাবালিকাবিদ্যা-লয়ের পাঠোপযোগী বাঙ্গালাগদ্যগ্রন্থের অভাব দেখিয়া কবিবর ঈশ্বর-গুপ্তকে সরল ও নির্ম্মল ভাষায় তদুপযোগী কয়েকখানি পদ্যপুস্তক লিখিতে অনুরোধকরিয়াছিলেন; তাহাতেই তিনি বিষ্ণুশর্ম্মার কৃত সংস্কৃত হিতোপদেশকে অবলম্বনকরিয়া গদ্য ও পদ্যে এই পুস্তক প্র-ণয়ন করেন। গদ্যের ভাগ তাদৃশ প্রীতিকর নাহউক, কিন্তু পদ্যগুলি অতীব রমণীয় হইয়াছে। মিত্রাক্ষরতার বিশুদ্ধপ্রণালী ইহাতে যতদূর অনুসৃত হইয়াছে, এক অন্নদামঙ্গল ভিন্ন ইহার পূর্ব্বরচিত প্রায় কোন পুস্তকেই ততদূর হয়নাই। গ্রন্থখানি সংস্কৃতের অনুবাদ হউক, কিন্তু কবি তাহাতেও নিজের সামান্য কবিত্ব প্রকাশকরেন নাই। উভয় গ্রন্থ মিলাইয়া দেখিলেই পাঠকগণ বুঝিতেপারিবেন। চতুর্থভাগস্থ সুন্দ ও উপসুন্দ সংক্রান্ত রচনাটী সাধারণকবিত্বপ্রকাশক নহে। ফলতঃ হাস্যরসোদ্দীপক সরল কবিতারচনে ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের ন্যায় সৌভাগ্য-শালী কবি সচরাচর দেখিতেপাওয়াযায়না। কিন্তু এস্থলে ইহাও উল্লেখকরা আবশ্যক যে, পূর্ব্বোক্ত বেথুনসাহেবের অনুরোধক্রমেই যদি কবি এই গ্রন্থরচনা করিয়াথাকেন, তাহাহইলে তিনি কৃতকার্য্য হন নাই। বেথুনসাহেব বোধহয় তাঁহাকে এরূপ গ্রন্থরচনার জন্য অনুরোধ করেন নাই—ইঙ্গরেজিতে যেরূপ ফাষ্ট নম্বর, সেকণ্ড নম্বর পোয়েট্রী প্রভৃতি পুস্তক আছে এবং যাহার অনুকরণে এক্ষণে পদ্যপাঠ, কবিতাকুসুমাঞ্জলি প্রভৃতি পদ্যপুস্তক রচিত হইয়াছে, বোধহয়, তিনি সেইরূপ পুস্তকরচনার নিমিত্তই অনুরোধ করিয়াছিলেন। ফলতঃ হিতপ্রভাকর কোনরূপে

বালকবালিকাদিগের পাঠোপযোগী পুস্তক হয়নাই। ইহার প্রথমে পরমেশ্বরের মহিমবর্ণনপ্রসঙ্গে—

"রে মন! পরম পুরুষের পবিত্র প্রেমপুষ্পের আমোদের আঘ্রাণ একবার নেরে—একবার নে—রে; ওরে মন! ভূতনাথকে একবার দেখ্‌রে—একবার দেখ্—রে; মন রে—মন রে—শোন্‌রে—শোন্—রে; ও মন! ব্রহ্মরসে গল্‌রে—গল্—রে—গল্‌রে;—ওচিত্ত! এই লৌকিক সামান্যরস রাখ্‌রে—রাখ্‌রে—রাখ্‌রে; তাঁর প্রেমরস চাক্‌রে—চাক্‌রে—চাক্‌রে;—তাঁর ভক্তিরস মাখ্‌রে—মাখ্‌রে—মাখ্‌রে; ও মন! তাঁরে ডাক্‌রে—ডাক্‌রে—ডাক্‌রে"—ইত্যাদি যে সকল বাক্যবিন্যাস করিয়াছেন, তাহা বালকবালিকাদিগের পাঠ্য পুস্তকের কথা দূরে থাকুক, এক্ষণকার সংবাদপত্রেও শোভা পায়না। এখন্ ওরূপ রচনাকে লোকে 'জেঠামি' বলে। তাছাড়া প্রবোধপ্রভাকরের ন্যায় ইহারও স্থানে স্থানে একই কথা গদ্য ও পদ্যে দুইবার করিয়া বলাহইয়াছে, সে সকল স্থান পাঠকদিগের বিলক্ষণ বিরক্তিকর হয়। তদ্ভিন্ন হিতোপদেশে যেসকল অশ্লীল উপাখ্যান আছে, তাহারও কয়েকটী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে।

বোধেন্দুবিকাশ———সংস্কৃতপ্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ করিয়া এই গ্রন্থ নাটকাকারেই বিরচিত হইয়াছে। ইহা প্রথমে মাসিক প্রভাকরে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে উহাকে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া পৃথক্ পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিবার পরেই গ্রন্থকারের মৃত্যু হয়। তদীয় ভ্রাতা উহার তিন অঙ্কমাত্র প্রকাশ করিয়াছেন; সমুচিত উৎসাহপ্রাপ্তির অভাবে বোধহয় অপরাংশ মুদ্রিত করিতে পারেন নাই। ইহার অধিকস্থলেই মূলপুস্তকের অপেক্ষা অনেক বাহুল্যবর্ণন আছে এবং সেই সেই স্থলে প্রচুর কবিত্ব-শক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। কাম, রতি, ক্রোধ, হিংসা, লোভ, তৃষ্ণা, কলি, দম্ভ, দিগম্বরসিদ্ধান্ত, সোমসিদ্ধান্ত প্রভৃতির চরিত্রগুলি যে কত

অধিক রমণীয় ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে; তরঙ্গলহরী, রণরঙ্গিণী, শেফালিকা, উন্মাদিনী, পঞ্চাল, প্রভৃতি কবির স্বোদ্ভাবিত নূতন ছন্দগুলি যে কিরূপ রমণীয় হইয়াছে; হিন্দিমিশ্রিত ভজন ও দোহাগুলি যে কি মধুর হইয়াছে; শ্যামাবিষয়ক গীতগুলি যে কিরূপ সুধাবর্ষী হইয়াছে—তাহা লিখিয়া শেষ করাযায়না। ফলতঃ এই পুস্তক খানি পাঠকরিবার সময়ে আমরা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভবকরিয়াছি। স্থলবিশেষে দীর্ঘ দীর্ঘ যে পদ্যগুলি আছে এবং ক্ষপণকাদির সহিত যে অতিরিক্ত মাতলামীটা করা হইয়াছে, তাহা অবশ্যই অপ্রীতিকর বটে, কিন্তু তদতিরিক্ত প্রায় সমুদয় স্থলই পরমপ্রীতিজনক হইয়াছে। ঈশ্বরগুপ্তের গদ্যরচনায়, চেষ্টাকরিয়া অতিরিক্ত অনুপ্রাসযোজনা করিবার যে দোষ সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়, এগ্রন্থে সে দোষের ভাগও অতি কম দেখাগেল। ফলতঃ ঈশ্বরগুপ্তের মহাকবিত্ব সপ্রমাণ করিবার সময়ে এই গ্রন্থখানিকে সাক্ষিস্বরূপ দণ্ডায়মান করাইলেই মোকদ্দমার জয় হইবে সন্দেহনাই। ইহা অতিদুঃখের বিষয় এবং দেশীয় লোকদিগের কলঙ্কের বিষয় যে, উৎসাহপ্রাপ্তির অভাবে এতাদৃশ কবিত্বপূর্ণ উৎকৃষ্টনাটকও সমগ্ররূপে প্রকাশিত হইতে পায় নাই। পাঠগণের প্রদর্শনার্থ ইহার অতি অল্পমাত্র অংশই নিম্নভাগে উদ্ধৃত হইল———

হিংসার উক্তি।—গৌরবিণীচ্ছন্দ।

হ্যাদে দেখি ঘরে ঘরে, সকলেই খায় পরে, সুখে আছে পরস্পরে—আজো এরা মরেনি?
কত সাজে সাজ্ করে, গরবেতে ফেটেমরে, এখনো এদের ঘরে—যম এসে ধরেনি?
এই সব্ জামা জোড়া, এই সব্ গাড়ী ঘোড়া, এসব্ টাকার তোড়া—চোরে কেন হরেনি?
আরে, ওরা ভাগ্যবান্, বাড়িয়াছে বড় মান, গোলাভরা আছে ধান—লক্ষ্মী আজো সরেনি?
মর্ এটা যেন হাতি, দশহাত বুকে ছাতি, করিতেছে মাতামাতি—জ্বরে কেন জ্বরেনি?
হ্যাদে মাগী কাল্লামুখী, ঠিক্‌যেন কচিখুকী, পতিসুখে বড় সুখী—ঠেঁটী কেন পরেনি?
মর্ মর্ ওই ছুঁড়ী, পরেছে সোণার চুড়ী, বেঁকে চলে মেরে তুড়ি—ফুল তবু ঝরেনি!
দেখ্ দেখ্ নিয়ে মিঠে, খেতেছে কি পুলিপিঠে, এখনো এদের ভিটে—ঘুঘু কেন চরেনি!?"

দিগম্বরসিদ্ধান্ত *—ভজন।

"অর্‌হৎ অর্‌হৎ, শির্‌কো জহরৎ, মেরা গুরুজী অরহৎ ;
তোম্ সব্ লোগ্ নিস্তার হোয়েগা, লেহ এহীকা মৎ—
বাবা লেহ এহীকা মৎ।
কোহি জাৎকো না মানো বাবা, না মানো দেবী দেবা ;
এক মন্‌সে অর্হৎজীকো পাঁওমে কর সেবা—
বাবা পাঁওমে কর সেবা।
যব্‌হি যেসা আয়ে মন্‌মে, তেস্‌সে কর ভোগ ;
ছোড়্‌দেও সব্ ধূর্ত্তকো বাৎ, ভুক্কা যাগ যোগ—
বাবা ভুক্কা যাগ যোগ।
আব্‌কি নারী, পর্‌কি নারী, যেক্সে মেলে সঙ্গ ;
নাহি ছোড় দেও, ক্যা খুসী হ্যায়, কামদেও কি রঙ্গ—
বাবা কামদেও কি রঙ্গ।
এসে পাপ এসে পুণ্য এহো ধূর্ত্তকী বাৎ,
মরণ্‌সে সব্ মুক্ত হয় তব্, পাপ যায় কোন্ সাৎ—
বাবা পাপ যায় কোন্ সাৎ।
দিন্ দিন্ দিন্ গাওমে ঢালো, সব হুঁ গঙ্গাজল ;
তবু তেরে কি শোধন হবে, জঠরভরা সব্ মল—
বাবা জঠরভরা সব্ মল।
অর্হৎ মেরা প্রাণ পেয়ারো, অর্হৎ মেরা জান্,
অর্হৎ পাঁওমে প্রণৎ করো সব্, আওর না জানো আন্—
বাবা আওর না জান আন্"।

রাজসী শ্রদ্ধা—গীত।

রাগিণী বেহাগ—তাল এক তালা।

"কেরে বামা—বারিদবরণী ; তরুণী ভালে ধরেছে তরণি ; কাহারো ঘরণী, আসিয়ে ধরণী,
করিছে দনুজ জয়।

---

* অর্হৎ নামা গুরুর শিষ্য—এক প্রকার বৌদ্ধ।

হের হে ভূপ! কি অপরূপ, অনুপরূপ নাহি সরূপ, মদননিধনকরণকারণ চরণশরণ লয় ॥
বামা—হাসিছে ভাসিছে লাজ না বাসিছে, হুহুঙ্কার রবে সকলে শাসিছে, নিকটে আসিছে,
বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ হয় ॥
বামা—টলিছে ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে, সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে, কোপেতে জ্বলিছে,
দনুজ দলিছে, ছলিছে ভুবন ময়।
কেরে—লোলিতরসনা, বিকটদশনা, করিয়ে ঘোষণা, প্রকাশে বাসনা, হোয়ে শবাসনা,
বামা বিবসনা, আসবে মগনা রয়" ॥

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কলিনাটক সমাপ্ত হয় নাই, সুতরাং তদ্বিষয়ে আমরা কিছু বলিতে পারিলাম না। যাহাহউক এই কয়েক গ্রন্থলিখিত ভিন্ন প্রাত্যহিক ও মাসিকপ্রভাকরে তাঁহার রচিত কত কত হাস্যরসোদ্দীপক উৎকৃষ্ট পদ্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সঙ্খ্যা নাই। জামাইষষ্ঠী, অরন্ধন, বড়দিন, পিটেসংক্রান্তি বিষয়ক পদ্যগুলি যখন্ পাঠ করাযায়, তখন্ই নূতনের মত মনকে আমোদিত করে। তাঁহার কোন চরিতাখ্যায়ক যথার্থই লিখিয়াছেন, "স্বভাববর্ণনে যেমন কবিকঙ্কণ, পরমার্থ কালীবিষয়ে যেমন কবিরঞ্জন, আদিরসে যেমন রায়গুণাকর, হাস্যরসে তেমনই ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত অদ্বিতীয় কবি।"

কিয়দ্দিন হইল শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী ও কবিতা্সংগ্রহ' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে পরমানন্দসহকারে গুপ্তকবিসংক্রান্ত অনেক রহস্য অবগত হইতে পারা যায়।

দাশরথিরায়ের পাঁচালী।

১৭২৬ শকে [১৮০৪ খৃঃ অঃ] দাশরথিরায়ের জন্ম হয়। ইহাঁর পিতার নাম ৺দেবীপ্রসাদ রায়। ইহাঁরা রাঢ়ীয়-ব্রাহ্মণ। জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী কাঁটোয়ার সন্নিহিত বাঁদ্‌মুড়া নামক গ্রামে ইহাঁদিগের পৈতৃক বাস। দাশরথিরায় বাল্যকাল হইতে পাটুলির নিকটবর্ত্তী পীলা নামক

গ্রামে নিজ মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেন। তিনি কিতাবতী বাঙ্গালা ও যৎকিঞ্চিৎ ইঙ্গরেজি শিক্ষাকরিয়া মাতুলের সহায়তায় সাকাঁইএর নীলকুঠীতে সামান্য কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে পীলাগ্রামে অক্ষয়কাটানী (অকাবাই) নাম্নী নৃত্যগীতব্যবসায়িনী এক ইতরজাতীয়া কামিনী ছিল। দাশরথির বাল্যকাল হইতেই গীতবাদ্যে সবিশেষ অনুরাগ থাকায় যৌবনে উহার সহিত প্রণয়সঞ্চার হয়। কিছুদিনপরে অকাবাই এক ওস্তাদি কবির দল করে—দাশরথি তাহাতে গীত বাঁধিয়া দিতেন। কবির লড়াইএ গানদ্বারা পরস্পরকে গালাগালী-দেওয়া হইয়াথাকে। তদনুসারে দাশরথি একদা কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দল হইতে অত্যন্ত কটু গালি খাইয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কবির দল ত্যাগকরেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি বিষয়কর্ম্মরহিত হইয়াছিলেন। সুতরাং গ্রামে বসিয়া কার্য্যান্তরাভাবে স্বয়ং ছড়া ও গীত বাঁধিয়া দশজন বয়স্যের সহিত সকের এক পাঁচালীর দল করেন—পরে সেই দলই তাঁহার জীবিকা, সৌভাগ্য ও দেশব্যাপিনী "দাশুরায়" নামখ্যাতির কারণ হইয়া উঠে।

তিনি অনেক বিষয়ের অনেক পালা ও অনেক গীত বাঁধিয়াগিয়াছেন; তাহার কয়েকটী লইয়া বটতলার ছাপাখানায় পাঁচখানি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ কয়েকটী ভিন্ন তাঁহার রচিত আরও অনেক পালা আছে; এমন কি তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে এরূপ অনেকগুলি পালারচনা করিয়াছিলেন, যাহা তিনি নিজেও কখন ব্যবহারকরিতে পান নাই। ১৭৭৯ শকে [১৮৫৭ খৃঃ অঃ] ৫৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র হয় নাই—এক কন্যামাত্র হইয়াছিল; সেটীও অনেকদিন হইল গতাসু হইয়াছে।

দাশুরায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা তিনকড়িরায় এবং তৎপরে তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র কিছুকাল পাঁচালীর দল রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা সকলেই গত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের বংশে ঐ ব্যবসায় রাখিবার এক্ষণে আর কেহই নাই।

যে পাঁচখানি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে প্রভাস, চণ্ডী, লবকুশের যুদ্ধ, মানভঞ্জন প্রভৃতি অনেকগুলি পালা আছে। তদ্ভিন্ন জন্মাষ্টমী, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি তাঁহার রচিত কত পালা আছে, তাহা স্থির বলাযায় না। ঐ সকল পালার ছড়া ও গীতে কবিত্বপরিচায়ক অনেক স্থল আছে। করুণ ও হাস্যরসের উদ্দীপ্তি স্থানে স্থানে এরূপ আছে যে, তাহা শুনিয়া মোহিত হইতে হয়। এক সময়ে ঐ পাঁচালী লোকের দ্বারেদ্বারে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, এবং অদ্যাপি দাশুরায়ের ২।১টী গীত না জানে, এরূপ লোক প্রায় দেখিতে পাওয়াযায়না। রামপ্রসাদীগানের সুরের ন্যায় দাশুরায়েরও গীতের সুরগুলি নূতনরূপ ও সহজ, এজন্য সকলেই উহা গাইতে পারে। কি ইতর কি ভদ্র কি স্ত্রী কি পুরুষ সর্ব্বসাধারণেই ঐসকল গানের পক্ষপাতী। এরূপ সৌভাগ্য সকললোকের ভাগ্যে ঘটে না।

দাশুরায় সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন না, কিন্তু পণ্ডিতের মুখে শুনিয়া এবং অভিধান দেখিয়া অনেক সংস্কৃতশব্দ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ছড়া ও গীতে সেই সকল শব্দাড়ম্বর অনেক দেখিতেপাওয়াযায়। অপভ্রংশ শব্দও ইহাতে অনেক আছে। ছড়াতে পয়ারের ন্যায় অক্ষর পরিমিত নাই—অনিয়মে বেশী ও কম আছে। তদ্ভিন্ন মিত্রাক্ষরতা এত অবিশুদ্ধ যে, তাহা দেখিয়া স্থানে স্থানে কবির প্রতি অশ্রদ্ধা হয়। তা ছাড়া খেঁউড়নামক উপাখ্যানসকল এত জঘন্য ও এত অশ্লীল যে, তাহা দেখিলে দাশুরায়কে ভদ্রসভায় বসিতে দিতে ইচ্ছা হয়না। যাহাহউক আমরা পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ অধিক উদ্ধৃত করিতে পারিলামনা—একটী গীতের উৎকৃষ্ট কিয়দংশমাত্র উদ্ধৃত করিলাম——

গোপীদিগের নিকটে বৈদ্যবেশী কৃষ্ণের উক্তি।

"ধনী! আমি কেবল নিদানে——
বিদ্যা যে প্রকার, বৈদ্যনাথ আমার, বিশেষগুণ সে জানে"।

চারি যুগে মম আয়োজন হয়, একত্রেতে চূর্ণ করি সমুদয়,
গঙ্গাধরচূর্ণ আমারি আলয়, কেবা তুল্য মম গুণে;
অহে ব্রজাঙ্গনা কি কর কৌতুক, আমারি সৃষ্টি করা চতুর্ম্মুখ,
হরি বৈদ্য আমি হরিবারে দুখ, ভ্রমণ করি এ ভুবনে;"

শ্রীযুক্তঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগরের বেতালপঞ্চবিংশতি প্রভৃতি।

আমরা অনেকক্ষণ হইল ইদানীন্তনকালে প্রবেশ করিয়াছি, কিন্তু যাঁহাকে লইয়া ইদানীন্তনকালের এত গৌরব, তাঁহার বিষয়ে এপর্য্যন্ত কিছুই বলাহয়নাই। তিনি—সুগৃহীতনামা শ্রীযুক্তঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগরমহাশয়। এক স্বতন্ত্রপুস্তকে ইহাঁর জীবনচরিত লিখিবার বিষয়ে অনেক দিন হইতে আমাদের অভিলাষ ছিল। কিন্তু নানাকারণে সে অভিলাষ পূর্ণ না হওয়ায় অগত্যা এই সাধারণপুস্তকের মধ্যেই—সুতরাং অবশ্যই সঙ্ক্ষেপে—তাঁহার জীবনচরিত লিখিতে হইল।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর জিলা হুগলীর অন্তর্গত খানাকুলের সন্নিহিত বীরসিংহ (বীরসিঙা) নামক এক সামান্য গ্রামে ১৭৪২ শকের ১২ই আশ্বিন জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয়ের ৭ পুত্র ও ৩ কন্যার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতায় ১০৲ টাকা বেতনে সামান্য কর্ম্ম করিতেন। তৎকালে পল্লীগ্রামস্থ বালকদিগের গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যেরূপ লেখাপড়া হইত, ঈশ্বরচন্দ্রেরও বাল্যকালে সেইরূপ লেখাপড়া হইয়াছিল। ৯ বৎসর বয়ঃক্রমসময়ে তাঁহার পিতা তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া খৃঃ ১৮২৯ অব্দের ১লা জুনে সংস্কৃতকালেজে ভর্ত্তিকরিয়া দেন। অবস্থার ক্ষুণ্ণতাবশতঃ পুত্রের কলিকাতার ব্যয়নির্ব্বাহ করা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে বড় কষ্টকর হইত, সুতরাং তথায় অবস্থান-

কালে অনেকদিনপর্য্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্রকে স্বহস্তে পাক, কদর্য্যস্থানে বাস, সামান্যদ্রব্যভক্ষণ ও অপকৃষ্ট শয্যায় শয়ন, করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশভোগ করিতেহইয়াছিল। এইরূপ ক্লেশভোগ করিয়া তিনি খৃঃ ১৮৪১ শালের নবেম্বরমাসপর্য্যন্ত অর্থাৎ ১২ বৎসর ৬ মাসকাল কালেজে থাকিয়া ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্মৃতি, ন্যায়, বেদান্ত ও সাঙ্খ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, এবং ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে হিন্দু-লা বিষয়ে পরীক্ষা দিয়া প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হয়েন। তৎকালে সংস্কৃতকালেজে ইঙ্গরেজিঅধ্যয়ন করা না করা ছাত্রদিগের ঐচ্ছিক ছিল। নানাবিধ প্রতিবন্ধকবশতঃ কালেজে ঈশ্বরচন্দ্রের ইঙ্গরেজিঅধ্যয়ন অধিক হয়নাই। ৫|৬ মাস কালমাত্র যাহা পড়িয়াছিলেন, কালেজত্যাগ করিবার সময়ে তাহা লোপ পাইয়াছিল।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালকমাত্রেই বাল্যকালে পড়াশুনায় কিছু অনাবিষ্ট থাকে। অল্প পরিশ্রম করিলেই পাঠাভ্যাস হয়, অথচ সহাধ্যায়িবর্গের সমকক্ষ হইতে পারাযায়, এই বুঝিয়া ঈশ্বরচন্দ্র ব্যাকরণ ও সাহিত্য শ্রেণীতে অধিক পরিশ্রম করেন নাই; সমগ্রগ্রন্থ না পড়িয়াও কিসে ভাল পরীক্ষা দিতেপারাযায়, সর্ব্বদা তাহারই ফিকির অনুসন্ধান করিতেন এবং সহাধ্যায়ীদিগের সহিত আমোদপ্রমোদ করিয়াই অধিককাল কাটাইতেন। অনন্তর যখন্ তাঁহার বুদ্ধির কিঞ্চিৎ পরিপাক হইল এবং তিনি অলঙ্কারশ্রেণীতে উঠিয়া কিছু পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন্ তাঁহার বিদ্যা ও গৌরবের পরিসীমা রহিল না। অতঃপর তিনি যখন্ যে শ্রেণীতে থাকিতেন, অবিসম্বাদিতভাবে সেই শ্রেণীর সর্ব্বপ্রধান ছাত্ররূপে পরিগণিত হইতেন এবং সংস্কৃত গদ্য ও সংস্কৃত পদ্য রচনায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া মধ্যেমধ্যে প্রচুর পারিতোষিক পাইতেন। কালেজের অধ্যাপকবর্গ তাঁহার এইরূপ অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি সন্দর্শনে তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি স্নেহকরিতেন এবং কালেজত্যাগ করিবার সময়ে তাঁহার বিদ্যার অনুরূপ হইবে বলিয়া "বিদ্যাসাগর" এই উপাধি তাঁহাকে

দিয়াছিলেন। এই উপাধি সংস্কৃতব্যবসায়ীমাত্রেরই হইতেপারে সত্য, কিন্তু আজি কালি শুদ্ধ "বিদ্যাসাগর" বলিলে——"হরির্যথৈকঃ পুরুষোত্তমঃ স্মৃতো মহেশ্বর স্ত্র্যম্বক এব নাপরঃ" ইত্যাদিবৎ জনসাধারণে কেবল উহাঁকেই প্রায় লক্ষ্য করিয়াথাকে।

বিদ্যাসাগরের, কালেজে অবস্থানসময়ে ফোর্টউইলিয়ম্ কালেজের তৎকালীন সেক্রেটরি কাপ্তেন জি, টি, মার্শেলসাহেব কিয়ৎকালের জন্য সংস্কৃতকালেজের সেক্রেটরি হইয়াছিলেন। ঐ সময় হইতে তিনি বিদ্যাসাগরকে সাতিশয় ভাল বাসিতেন। ফোর্টউইলিয়ম কালেজের প্রধানপণ্ডিতের পদ শূন্য হইলে মার্শেলসাহেব বিনা প্রার্থনায় তাঁহাকে কালেজহইতেই লইয়াগিয়া ৫০ টাকাবেতনে ১৮৪১ খৃঃঅব্দের ডিসেম্বরমাসে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়াদেন। ঐ সময়ে সাহেব তাঁহাকে বলেন যে, ঈশ্বর! তুমি ইঙ্গরেজিশিক্ষা ও বাঙ্গালা পুস্তকরচনা করিতে চেষ্টা কর, নতুবা কাজের লোক হইতে পারিবে না। হিতৈষী সাহেবের এই পরামর্শানুসারে তিনি ঐ সময়ে ইঙ্গরেজী শিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু শিক্ষা দিবার লোকের অভাববশতঃ অচিরেই তাহা ত্যাগ করিতে হয়। মার্শেলসাহেবের জেদ্ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া আবার আরম্ভ করেন, এবং আবার ত্যাগ করিতে হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ অসুবিধাভোগ করিয়াও মধ্যেমধ্যে সামান্যরূপ সাহায্য পাইয়া এবং স্বয়ং যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়া এক্ষণে ইঙ্গরেজিভাষাতে বিশিষ্টরূপ অধিকারলাভ করিয়াছেন।

মার্শেলসাহেব বিদ্যাসাগরের সহিত যত ঘনিষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিলেন, ততই তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র, তেজস্বিতা, উদারতা প্রভৃতি সন্দর্শনে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইতে লাগিলেন। তদবধি সকল বিষয়েই বিদ্যাসাগরের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন এবং তদীয় মতগ্রহণব্যতিরেকে প্রায় কোন কর্ম্ম করিতেন না। ঐ সময়ে ডাক্তার মোএট্সাহেব এডুকেশনকৌন্সিলের সেক্রেটরী ছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে সংস্কৃত-

বিদ্যা ও হিন্দুধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ে কোন কথা জানিবার প্রয়োজন হইলে মার্শেলসাহেবকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেন; মার্শেলসাহেব বিদ্যাসাগরের দ্বারা মৌএট্সাহেবের জিজ্ঞাস্যবিষয়ের মীমাংসা করিয়া লইতেন। এই সূত্রে মৌএটসাহেবের সহিত বিদ্যাসাগরের পরিচয় হয়। তদবধি তিনি বিদ্যাসাগরের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ ও বিশ্বাস করিতেন এবং ক্রমেক্রমে তাঁহার পরমাত্মীয় ও যারপরনাই হিতৈষী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

১৮৪৬ খৃঃঅব্দে সংস্কৃতকালেজের এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরির পদ শূন্য হওয়ায় বেতনের বৈলক্ষণ্য নাথাকিলেও সাহেবেরা বিদ্যাসাগরকেই ঐপদের যথার্থউপযুক্ত বিবেচনাকরিয়া ঐ সালের এপ্রিল মাসে নিযুক্ত করেন। ঐ সময়েই তাঁহাকর্ত্তৃক কালেজের অধ্যয়ন-প্রণালী অনেক সংশোধিত হয়। ইতিপূর্ব্বে ফোর্টউইলিয়মকালেজে অবস্থান সময়ে তত্রত্য সিবিলিয়ান ছাত্রদিগের পাঠ্যপুস্তক কদর্য্যভাষারচিত বাঙ্গালাহিতোপদেশের পরিবর্ত্তে মার্শেলসাহেবের আদেশক্রমে বিদ্যাসাগর 'বসুদেবচরিত' নামে সর্ব্বপ্রথম এক বাঙ্গালাপুস্তক রচনা করেন। গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত না হওয়ায় তাহা মুদ্রিত হয়নাই। কিছুদিন পরে উক্তসাহেব গবর্ণমেণ্টকে সম্মত করিয়া হিন্দি বেতালপঞ্চবিংশতির এবং মার্শমানপ্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাসের উত্তরভাগের বাঙ্গালাঅনুবাদ করিতে বিদ্যাসাগরকে অনুমতি করিয়াছিলেন। তদনুসারে এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে [১৯০৩ সংবৎ] বেতালপঞ্চবিংশতিপুস্তক এবং ইহার পরবৎসরে অর্থাৎ ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে [১৯০৪ সংবৎ] বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশিত হয়। ঐরূপ কার্য্যের উদ্দেশেই ১৮৫০ খৃঃ অব্দে [১৯০৬ সংবৎ] চেম্বর্স বিওগ্রাফী নামক ইঙ্গরেজিপুস্তকহইতে সঙ্কলিত করিয়া জীবনচরিত নামক পুস্তকও বিরচিত হইয়াছে।

সংস্কৃতকালেজে প্রায় এক বৎসর কর্ম্মকরার পর তথাকার তাৎকালিক সেক্রেটরি বাবু রসময়দত্তের সহিত নানাবিষয়ে বিদ্যাসাগরের মতের অনৈক্য হইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর অতি তেজস্বী লোক; তিনি

আপনার মনের মত কাজ হইবে না বুঝিয়া বিরক্ত হইলেন এবং টাকার মায়া ত্যাগকরিয়া কালেজে প্রবিষ্ট হইবার ঠিক্ একবৎসর পরেই অর্থাৎ ১৮৪৭ খৃঃ অব্দের এপ্রিলমাসে কর্ম্মত্যাগ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। তিন মাসের পর সে প্রার্থনা মঞ্জুর হইল।

অতঃপর বিদ্যাসাগর কিয়ৎকালের জন্য বিষয়কর্ম্মশূন্য হইয়া লেখাপড়ার চর্চ্চায় বিশেষতঃ ইঙ্গরেজীর অনুশীলনেই সাতিশয় অভিনিবিষ্ট ছিলেন। অনন্তর ফোর্টউইলিয়ম কালেজের হেড্‌কেরাণীর পদ শূন্য হওয়ায় মার্শেলসাহেবের অনুরোধে ৮০৲ টাকাবেতনে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে স্মরণীয়মামা বেথুনসাহেব শিক্ষাসমাজের সর্ব্বাধ্যক্ষ (প্রেসিডেণ্ট) ছিলেন। মৌএটসাহেব বিদ্যাসাগরের গুণগান করিয়া তাঁহাকে বেথুনসাহেবের নিকট পরিচিত করিয়াদেন। তদবধি বেথুনসাহেব বিদ্যাসাগরকে যথেষ্ট স্নেহ ও সমাদর করিতেন এবং নানাবিষয়ে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া পরম আনন্দিত হইতেন। বেথুনসাহেব কলিকাতায় যে বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপন করেন, বিদ্যাসাগর তাহার একজন প্রধান উদ্যোগী। ১৮৫০ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বরমাসে বেথুনসাহেব উক্ত বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের সমস্তভার তাঁহার উপর প্রদান করিয়াছিলেন। এই বালিকাবিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থই বিদ্যাসাগর ১৮৫১ খৃঃ অব্দে (১৯০৭ সং) 'চেম্বর্স রুডিমেণ্ট্‌স অব নলেজ' অবলম্বন করিয়া চতুর্থভাগ শিশুশিক্ষা বা বোধোদয় নামক পুস্তক রচনাকরেন। যাহা হউক মার্শেল, মৌএট ও বেথুনসাহেব এই তিনজনই বিদ্যাসাগরের যথার্থ মুরব্বী। যাহাতে তাঁহার খ্যাতিপ্রতিপত্তি ও মানসম্ভ্রমের বৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে তিনি জনেই সবিশেষ উদ্যোগী ছিলেন।

মদনমোহনতর্কালঙ্কার মুর্শীদাবাদের জজপণ্ডিত হইয়া যাইলে সংস্কৃতকালেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। মৌএট্‌সাহেব পীড়াপীড়ি করিয়া ১৮৫০ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বরমাসে ৯০৲ টাকাবেতনে

বিদ্যাসাগরকে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়াদিলেন। ঐ নিয়োগকালে এডুকেশন কৌন্সিলের মেম্বরেরা সংস্কৃতকালেজের তাৎকালিক অবস্থা এবং উহা উত্তরকালে কিরূপ হওয়া উচিত? তদ্বিষয়ে এক রিপোর্ট করিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ দিয়াছিলেন। বোধহয় এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই সেক্রেটরী রসময়বাবু কর্ম্মত্যাগ করিলেন। তিনি যেমন ছাড়িলেন, অমনি বিদ্যাসাগর সাহিত্যাধ্যাপকের পদ হইতে তাঁহার পদে ১০০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলেন। ইহার পর একমাস অতীত না হইতেই কৌন্সিলের সাহেবেরা বিদ্যাসাগরের প্রদত্ত রিপোর্ট পাঠকরিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং সংস্কৃতকালেজের সেক্রেটরি ও এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরীর পদ উঠাইয়াদিয়া উভয়বেতনে অর্থাৎ মাসিক ১৫০ টাকাবেতনে প্রিন্সিপালের পদ নূতনসৃষ্ট করিয়া ২১এ জানুয়ারি হইতে বিদ্যাসাগরকেই ঐ পদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। যাহাহউক ইতিপূর্ব্বেই বিদ্যাসাগর যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারই অনুসারে কালেজে সংস্কৃত ও ইঙ্গরেজি উভয় পাঠনারই পরিবর্ত্ত হইল। পূর্ব্বে ইঙ্গরেজি, ছাত্রদিগের ঐচ্ছিক পাঠ ছিল, এক্ষণে উচ্চ কয়েক শ্রেণীতে অবশ্যপাঠ্য হইল। সংস্কৃতেও, নিম্নশ্রেণীতে মুগ্ধবোধব্যাকরণ উঠিয়াগিয়া তৎপরিবর্ত্তে বিদ্যাসাগরকর্ত্তৃক বাঙ্গালাভাষায় রচিত সংস্কৃতব্যাকরণের উপক্রমণিকা, এবং ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ ব্যাকরণকৌমুদী অধ্যাপিত হইতে লাগিল। পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ, হিতোপদেশ, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি হইতে সঙ্কলনপূর্ব্বক যে তিনভাগ ঋজুপাঠ প্রস্তুত হইল, তাহাও উহারই সঙ্গেসঙ্গে পঠিত হইতে লাগিল। এই সময়ে কয়েকজন বুদ্ধিমান্ বালক উপক্রমণিকাহইতে সংস্কৃত আরম্ভকরিয়া লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক উচ্চ উচ্চ শ্রেণীতে উঠিতেলাগিল দেখিয়া, ঐ সকল ভাষাব্যাকরণপাঠের পর সংস্কৃত সিদ্ধান্তকৌমুদীর পাঠনা হইবে, পূর্ব্বে যে এই প্রস্তাব হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে বিদ্যাসাগর আর বড় মনোযোগ করিলেন

না! যাহাহউক বিদ্যাসাগরের প্রবর্ত্তিত নূতনপ্রণালীর সফলতা-সন্দর্শনে এডুকেশন কৌন্সিলের সাহেবেরা তাঁহার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন এবং ১৮৫৪ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি হইতে তাঁহার বেতন ১৫০ হইতে ৩০০ টাকা করিয়াদিলেন। বিদ্যাসাগর সংস্কৃতকালেজের তাৎকালিক নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও ইহারই পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে [১৯১১ সং] কালিদাসপ্রণীত অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের উপাখ্যান অবলম্বনকরিয়া বাঙ্গলাশকুন্তলা রচনাকরেন।

১৮৫১ খৃঃ অব্দে বেথুনসাহেবের মৃত্যু হইলে তৎপ্রতিষ্ঠিত বালিকাবিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয়নির্ব্বাহের ভার গবর্ণর জেনেরেল লর্ড ডালহৌসি স্বহস্তে গ্রহণকরিয়া লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর হেলিডে সাহেবের উপর উহার তত্ত্বাবধানের ভার দেন। এই উপলক্ষে হেলিডেসাহেবের সহিত বিদ্যাসাগরের পরিচয় হয়। পরিচয়দিবসাবধি তিনি বিদ্যাসাগরের প্রতি যথেষ্ট স্নেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে যখন্ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে মফস্বলে বাঙ্গালা ও ইঙ্গরেজি বিদ্যালয় সংস্থাপিতকরা রাজপুরুষদিগের অভিমত হয়, তৎকালে হেলিডে সাহেব বিদ্যাসাগরকে, তাঁহার মতে যেপ্রণালীতে বাঙ্গালাশিক্ষা হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে এক রিপোর্ট দিতে বলেন। তদনুসারে তিনি এক প্রণালী প্রস্তুতকরিয়া সাহেবের নিকট অর্পণ করিলে, সাহেব তাহা মঞ্জুর করিয়া লয়েন, এবং অতিরিক্ত ২০০ টাকা বেতন দিয়া তাঁহাকে এসিষ্টাণ্ট ইন্স্পেক্টরের পদপ্রদানপূর্ব্বক হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, নদীয়া এই চারি জেলায় কতকগুলি বাঙ্গালা মডেলস্কুল স্থাপন করিতে অনুমতি করেন। ঐ সকল আদর্শবিদ্যালয় এবং অপরাপর বাঙ্গালাবিদ্যালয়ের নিমিত্ত উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুতকরিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার অধীনে কলিকাতায় এক নর্ম্মালস্কুল স্থাপিত হয়। এই অবধি তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কালেজ, নর্ম্মালস্কুল, চারিজেলার মডেলস্কুল ও

কলিকাতাস্থ বাঙ্গালাপাঠশালার তত্ত্বাবধানকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহারই যত্ন ও চেষ্টায় হুগলী ও বর্দ্ধমান জিলায় ৪০টীর অধিক বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। মফস্বলে বালিকা-বিদ্যালয়স্থাপনের এই প্রথম সূত্রপাত। এই সকল বিদ্যালয়ের ব্যয় গবর্ণমেণ্ট হইতেই পাওয়াযাইবে, পূর্ব্বে এইরূপ কথা ছিল, কিন্তু পরে তাহা না হওয়ায়, চাঁদাদ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। সেই চাঁদায় তিনি স্বয়ংও কিছু দিতেন এবং লেডিকানিঙ্, সর্ সিসিল বীডন, সর্ উইলিয়ম গ্রে এবং পাইকপাড়ার রাজা ৺প্রতাপনারায়ণসিংহ প্রচুর-পরিমাণে সাহায্যকরিতেন।

অতঃপর বিদ্যাসাগর এক গুরুতর কাণ্ডে ব্যাপৃত হইলেন। পতির মৃত্যুহইলে পুনর্ব্বার বিবাহের প্রথা প্রচলিত নাথাকায় হিন্দুবিধবা-দিগের যেসকল ক্লেশ, যে সকল দুরবস্থা ও যেসকল অনিষ্টসঙ্ঘটনা হইয়া থাকে, তদ্দর্শনে বিদ্যাসাগরের সদয় অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই ব্যথিত থাকিত। তিনি অনেকদিন হইতে ঐ বিষয়ের চিন্তা করিতেছিলেন। শাস্ত্রে যে, বিধবাবিবাহের বিধি আছে, ইহা তাঁহার পূর্ব্বে বোধছিল না। সুতরাং তিনি মনে করিয়াছিলেন, বিধবাবিবাহ যে, বিশুদ্ধযুক্তির সম্পূর্ণ অনু-মোদিত, তদ্বিষয়ে একপ্রবন্ধ লিখিবেন, এবং তাহাতে, মনুপ্রণীত ধর্ম্ম-শাস্ত্রে যেসকল কার্য্য বিহিত ও নিষিদ্ধ আছে, তৎসমুদয়ের উল্লেখ করিয়া দেখাইবেন যে, হিন্দুদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদ উক্ত সংহিতার এত বিধি ও এত নিষেধ আমরা প্রতিপালন করিনা,—যদি অকারণে সেসকল লঙ্ঘন করিয়াও আমাদের জাতিপাত বা অধর্ম্ম নাহয়, তবে এতাদৃশ প্রবলকারণসত্ত্বে বিধবাবিবাহনিষেধরূপ একটী নিয়ম লঙ্ঘন-করিয়া কেন আমরা অধার্ম্মিক বা জাতিচ্যুত হইব ? ইত্যাদি যুক্তি ঐ প্রবন্ধে লিখিত হইত। যাহাহউক, একদা ‘কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ’ পরাশর সংহিতার এই বচনাংশ দর্শনকরিয়া হঠাৎ তাঁহার সমগ্রপরাশর-সংহিতাদর্শনে প্রবৃত্তি জন্মে, এবং পরাশরসংহিতা খুলিয়া দেখেন যে, তাহাতে বিধবাবিবাহবিধায়ক ———

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎস্থ নারীণাং পতি রন্যো বিধীয়তে"॥

এই স্পষ্ট বচন আছে। এই বচন দর্শন করিয়া চিরাভিলষিত বিষয়ের সিদ্ধি হইবে ভাবিয়া বিদ্যাসাগরের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি ঐ বচন ও অন্যান্য প্রমাণ অবলম্বন করিয়া বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনপূর্ব্বক ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে "বিধবাবিবাহ হওয়া উচিত কি না?" এই নামে একখানি পুস্তকপ্রচার করিলেন। এই পুস্তক পাঠ করিয়া হিন্দুসমাজে একবারে হুলস্থুল পড়িয়াগেল। প্রাচীন হিন্দুরা বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক খৃষ্টিয়ান বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন; অনেক ভট্টাচার্য্য মহাশয়, এবং অনেক ধনবান্ লোকে ভট্টাচার্য্যমহাশয়দিগের সাহায্যে, বিধবাবিবাহনিষেধক প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহকরিয়া বিদ্যাসাগরলিখিতপুস্তকের উত্তরস্বরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। কোন কোন পুস্তকে শিষ্টাচারবিরুদ্ধ গালীবর্ষণেরও ত্রুটি ছিলনা। প্রায় সকল সংবাদপত্র হইতেই বিদ্যাসাগরের উপর অনবরত প্রস্তরবৃষ্টি হইতেলাগিল। কিন্তু মহামনা বিদ্যাসাগর অবিকৃতচিত্তে সে সমুদয় সহ্য করিয়া ঐ বৎসরেই বিধবাবিবাহসংক্রান্ত দ্বিতীয় পুস্তক প্রচারকরিলেন। ঐ পুস্তকে এরূপ পাণ্ডিত্য ও এরূপ গাম্ভীর্য্য সহকারে প্রতিপক্ষদিগের প্রদত্ত সর্ব্ববিধ আপত্তির খণ্ডন করিলেন, এরূপ নৈপুণ্যের সহিত শাস্ত্রার্থের মীমাংসা করিলেন ও দুর্বিগাহ শাস্ত্রীয় বিচারসকল এরূপ সরল ও মধুর ভাষায় রচনাকরিয়া জলবৎ সহজ করিয়াদিলেন যে, তাহা পাঠকরিয়া সকলেরই বিদ্যাসাগরকে অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া বোধহইল। যাহাহউক এই দ্বিতীয়পুস্তক বহির্গত হইলে অনেক কুসংস্কারাবিষ্ট লোকেরও মনে, বিধবাবিবাহ যে অশাস্ত্রীয় নহে, ইহা অন্ততঃ অপরিস্ফুটরূপেও প্রতীয়মান হইল। এক্ষণে বিদ্যাসাগর পুস্তকরচনায় নিবৃত্ত হইয়া—কিরূপে বিধবাবিবাহ কার্য্যে পরিণত হইবে, তদর্থ চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগরকৃত কোন কর্ম্মই অঙ্গহীন থাকিবার নহে। পাছে বিধবাবিবাহে উৎপাদিত সন্তানগণের

উত্তরকালে ধনাধিকারবিষয়ে কোনরূপ গোলযোগ হয়, এই জন্য তিনি ঐবিষয়ে এক আইন প্রস্তুত করাইতে উদ্যোগী হইলেন। সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপালী কর্ম্মের উপলক্ষে সর্ জেম্‌স্ কল্‌বিল, জে আর কল্‌বিন, জে পি গ্রাণ্ট, সিসিল বীডন প্রভৃতি বড় বড় সাহেবদিগের নিকটে বিদ্যাসাগর পরিচিত হইয়াছিলেন। ইহাঁরা সকলেই বিদ্যাসাগরকে যথেষ্ট স্নেহ ও সমাদর করিতেন। বিদ্যাসাগর ঐ সকল সাহেবদিগের সাহায্যে এবং ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ৺রামগোপাল ঘোষ, ৺রাজা প্রতাপচন্দ্রসিংহ প্রভৃতি দেশীয় প্রধান প্রধান লোকের উদ্যোগে কলিকাতার বিধিদায়িনী সভাহইতে এই মর্ম্মে এক আইন পাস করাইলেন যে 'বিধবাবিবাহে উৎপাদিত সন্তানেরাও হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ধনাধিকারী হইবে'। এই আইনকে ১৮৫৬ সালের ১৫ আইন কহে।

অনন্তর বিধবাবিবাহের প্রকৃত চেষ্টা হইতে লাগিল। বিধবাবিবাহে কায়মনোবাক্যে সাহায্য করিবেন বলিয়া অনেক প্রধান প্রধান লোকে পার্চমেণ্টে লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে লাগিলেন। ঐ কার্য্যে সাহায্য করিবার অর্থের জন্য চাঁদা হইতে লাগিল এবং মুর্শীদাবাদ জিলার তাৎকালিক জজপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১৭৭৮ শকের ২১এ অগ্রহায়ণ এক বিধবাকামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া দৃষ্টান্তপ্রদর্শন করিলেন। ইহার পর ২।১টী করিয়া বিধবাবিবাহ হইতে লাগিল। যাহাহউক ঐ সময়ে দেশের সকল সমাজেই কেবল বিধবাবিবাহ-সংক্রান্ত কথারই ঘোরতর আন্দোলন হইতে লাগিল, স্থানবিশেষে স্বপক্ষ বিপক্ষদিগের গালাগালি মারামারি প্রভৃতিও আরম্ভ হইল এবং দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের মুখেই বিদ্যাসাগরের নাম প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এই সময়ে পূর্ব্বোল্লিখিত দাশরথিরায় বিধবাবিবাহের একপালা পাঁচালী রচনা করিয়া গাইতে আরম্ভ করিলেন; বিদ্যাসাগর ও বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত নানাবিধ গান পথে—ঘাটে—মাঠে সর্ব্বত্রই শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল; এবং

শান্তিপুরে "বিদ্যাসাগর পেড়ে" নামক একপ্রকার বস্ত্র উঠিল। উহার প্রান্তভাগে নিম্নলিখিত গীতটী সংনিবদ্ধ ছিল——

"সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীব হয়ে।
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে॥
কবে হবে শুভদিন, প্রকাশিবে এ আইন,
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরবে হুকুম—বিধবারমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম;
মনের সুখে থাক্‌ব মোরা মনোমত পতি লয়ে॥
এমন দিন কবে হবে, বৈধব্য যন্ত্রণা যাবে, আভরণ পরিব সবে,
লোকে দেখ্‌বে তাই——আলোচাল কাঁচ্‌কলা মাল্‌সার মুখে দিয়ে ছাই;——
এয়ো হয়ে যাব সবে বরণডালা মাথায় লয়ে॥"

এই সকল বৃহৎ ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়াও বিদ্যাসাগর গ্রন্থরচনায় বিরত হয়েন নাই। ঐ ১৮৫৬ খৃঃ অব্দেই তিনি দুই ভাগ বর্ণপরিচয়, চরিতাবলী, কথামালা, সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব এই ৫ খানি পুস্তক রচনা করেন। প্রথম ৪ খানি মডেল স্কুলের বালকদিগের পাঠার্থ রচিত হয়; ৫ম খানি কলিকাতাস্থ বেথুন সোসাইটী নামক সমাজে পঠিত ও পশ্চাৎ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। এই সময়েই তিনি কিছুকালের জন্য কলিকাতাস্থ তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন, এবং সেইকালে তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায় মহাভারতের উপক্রমণিকাভাগ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়াছিলেন; তাহাই ১৮৬০ খৃঃ অব্দে পুস্তকাকারে প্রচারিত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিদ্যাসাগর বড় তেজস্বী; তিনি সংসারবিদ লোক নহেন। নিজের অভিমত কার্য্য কর্ত্তৃপক্ষেরা অনুমোদন না করিলে তাঁহাদের নিকট হইতে 'ফিকির জুকির' করিয়া কাজ আদায় করিয়া লওয়া বিদ্যাসাগরের কোষ্ঠীতে লেখে নাই। সুতরাং এইরূপে অব্যাহতপ্রভাবে কিছুকাল কর্ম্মকরার পর নানাকারণে তিনি কর্ত্তৃপক্ষের উপর বিরক্ত হইতে লাগিলেন, এবং সেই বিরক্তিনিবন্ধন ১৮৫৮ খৃঃঅব্দে মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতনের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বসিলেন!

কর্ম্ম ত্যাগ করার পর তিনি ১৮৬২ খৃঃ অব্দে সীতার বনবাস ও ব্যাকরণকৌমুদীর চতুর্থভাগ, ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে আখ্যানমঞ্জরী, ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে মল্লিনাথটীকাসহকৃত মেঘদূতের পাঠাদিবিবেক, পীড়িতাবস্থায় বর্দ্ধমানে অবস্থিতিকালে ১৮৭০ খৃঃ অব্দে ভ্রান্তিবিলাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ব্যবহারার্থ ১৮৭১ খৃঃ অব্দে উত্তররামচরিত ও অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের টীকা এবং 'বহু-বিবাহ হওয়া উচিত কি না' এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব এই কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। এই প্রকাশিত পুস্তকগুলি ভিন্ন তাঁহার রচিত আরও অনেকগুলি পুস্তক আছে, তাহা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়নাই। কর্ম্মত্যাগ করার পর অনেক সময়েই তাঁহাকে অস্বাস্থ্যজন্য কষ্ট পাইতে হইয়াছে, তন্নিমিত্তই হউক, অথবা নানাকারণে সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট বহুলোকের সমাগম হয় তন্নিবন্ধন অবকাশাভাবেই হউক, তিনি আশানুরূপ অধিক পুস্তক রচনা করিতে পারেননাই। ঐ লোকসমাগমবিঘ্ননিবারণের জন্য তিনি কখন কখন নির্জ্জন স্থানে গিয়া অবস্থিতি করেন, কিন্তু তথা হইতেও নানাকার্য্যে সর্ব্বদাই কলিকাতায় যাইবার প্রয়োজন হওয়ায় তাঁহার অনেক সময় অনর্থক অতিবাহিত হয়।

এস্থলে অনেকের মনে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, বিদ্যাসাগর কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার কিরূপে চলে?—ইহার উত্তর এই—সরস্বতীর প্রসাদে তাঁহার সে বিষয়ে কোন কষ্ট নাই। কলিকাতার 'সংস্কৃত প্রেস' নামক ছাপাখানা ও স্বরচিতপুস্তকবিক্রয়, এই উভয়ে তাঁহার বার্ষিক যথেষ্ট আয় আছে। অন্য লোক হইলে সেই আয়ে বিলক্ষণ বিষয় করিয়া লইত; কিন্তু বিদ্যাসাগর সে ধাতুর লোক নহেন—তিনি যাহা পান, তাহাই ব্যয় করিয়া ফেলেন। তিনি স্বগ্রামস্থ বিদ্যালয়ের জন্য, ডাক্তারখানার জন্য, বালিকাবিদ্যালয়ের জন্য এবং গ্রামস্থ অনাথ ও নিরুপায় লোকদিগের সাহায্যের জন্য মাসে মাসে বিস্তর টাকা দান করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার নৈমিত্তিক

ব্যয়ও আছে। উদাহরণস্বরূপ তাহার একটার উল্লেখ করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, কয়েক বৎসর হইল তিনি ডাক্তর মহেন্দ্রলাল সরকারের সামাজিক বিজ্ঞানসভায় ১০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন!—দেশের বড় বড় ধনবান্ লোকেরা কয় জন ঐ কার্য্যে অত দান করিতে পারিয়াছেন?—

বিদ্যাসাগরের ৪ কন্যা ও একমাত্র পুত্র। পুত্র শ্রীযুতনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সন ১২৭৭ সালের ২৭এ শ্রাবণ এক বিধবা কন্যার পাণি-গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহে স্বয়ং নির্লিপ্ত থাকিয়া কেবল পরকে মজাইতেছেন, এই কথা পূর্ব্বে যাঁহারা বলিতেন, এক্ষণে নারায়ণের বিধবাবিবাহদ্বারা তাঁহাদের সে মুখ বন্ধ হইয়াছে।

বেতালপঞ্চবিংশতি হইতে বহুবিবাহবিচার পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগরের রচিত বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে যে, ৩০ খানি পুস্তক এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, যথাক্রমে তাহাদের নাম সকল উল্লিখিত হইল। এই সকল পুস্তক দেশমধ্যে অতি বিস্তীর্ণরূপে প্রচলিত। বাঙ্গালা ভাষার প্রতি যাঁহাদের কিছুমাত্র আদর আছে, তাদৃশ কোন পাঠকের নিকটেই বোধ-হয় বিদ্যাসাগররচিত কোন পুস্তকই অপরিজ্ঞাত নাই। অতএব এ সকল পুস্তকের পৃথক্ সমালোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে যে সুশ্রব্য সংস্কৃতশব্দসম্মিষ্ট বাঙ্গালা গদ্যরচনার বিশুদ্ধ রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, বিদ্যাসাগরের বেতালপঞ্চবিংশতিই তাহার মূল কারণ। বেতালপঞ্চ-বিংশতির পূর্ব্বে ওরূপ প্রকৃতির বাঙ্গালারচনা ছিল না। বিদ্যাসাগরই উহার সৃষ্টিকর্ত্তা। উহাঁর বেতালপঞ্চবিংশতিও প্রথম বলিয়া, বোধহয়, সবিশেষ প্রযত্নে বিরচিত হইয়াছে, এই জন্যই উহার রচনা যেরূপ কোমল, মনোহর ও মধুবর্ষিণী হইয়াছে, বিদ্যাসাগরেরও অন্য কোন পুস্তকের রচনা সেরূপ হয়নাই। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ঐ পুস্তক যৎকালে প্রথম প্রচারিত হয়, তৎকালে বিদ্যাসাগরও ভাবিয়াছিলেন যে, দীর্ঘ দীর্ঘ সমাসসমন্বিত রচনা উৎকৃষ্ট বাঙ্গালার উপযোগিনী হইবে।

এই জন্য প্রথমবারে প্রকাশিত পুস্তকের একস্থানে—"উত্তাল তরঙ্গমালা-সঙ্কুল উৎফুল্ল ফেননিচয়চুম্বিত ভয়ঙ্কর তিমি মকর নক্র চক্র ভীষণ স্রোতস্বতীপতি প্রবাহ মধ্য হইতে সহসা এক দিব্য তরু উদ্ভূত হইল" এইরূপ রচনা ছিল। কিন্তু ওরূপ রচনা বাঙ্গালার মধ্যে থাকা উচিত নহে, এই বোধ তাঁহার নিজেরই মনে পরে উদিত হওয়ায় এক্ষণকার সংস্করণে ওরূপ ভাগ সকল পরিত্যক্ত হইয়াছে।

এই বেতালপঞ্চবিংশতি যেমন মধুররচনার, জীবনচরিত সেইরূপ ওজস্বিনী রচনার দৃষ্টান্তস্থল—"উদয়োন্মুখী প্রতিভার নিত্যবিদ্বেষিণী ঈর্ষ্যা তাঁহার অভ্যুদয়াশা ত্বরায় উচ্ছিন্ন করিল" ইত্যাদিরূপ প্রগাঢ়রচনা বোধহয় এপর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালা পুস্তকে দৃষ্ট হয় নাই। দুঃখের বিষয়, বিদ্যাসাগরের হস্ত হইতেও এরূপ প্রগাঢ়রচনা আর বাহির হইল না। বিদ্যাসাগর বাঙ্গালাভাষায় সংস্কৃতব্যাকরণের যে উপক্রমণিকাদি প্রণয়ন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা দেশমধ্যে সাধারণতঃ সংস্কৃতশিক্ষাবিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, বলিতে হইবে। পূর্ব্বে অনেকদিন হইতেই ইঙ্গরেজিভাষায় কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই সংস্কৃত শিখিতে অভিলাষ হইত, কিন্তু উহার দ্বারে যে ভীষণমূর্ত্তি ব্যাকরণ দণ্ডায়মান ছিল, তাহাকে দেখিয়া কেহই নিকটে ঘেঁসিতে পারিতেন না। বিদ্যাসাগর সেই পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে কি পল্লী, কি নগর সর্ব্বত্রই বিদ্যানুশীলনরত কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেই যে, কিছু না কিছু সংস্কৃতের চর্চ্চা করিতেছেন, উপক্রমণিকাদ্বারা ব্যাকরণের দুর্গমপথ পরিষ্কৃত হওয়াই তাহার মূলকারণ। সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠকরিয়া সংস্কৃতগ্রন্থ অধ্যয়নকরিতে হইলে এক্ষণকার সংস্কৃতানুশীলনকারীদিগের মধ্যে কয়জনের ভাগ্যে সংস্কৃত শিক্ষাকরা ঘটিয়া উঠিত? ফলতঃ বিদ্যাসাগরের যদি আর কোন কার্য্যও না থাকিত, তথাপি উপক্রমণিকাদি রচনাদ্বারা সংস্কৃতভাষার পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়ারূপ এই একমাত্র কার্য্যের জন্যও দেশীয় লোকদিগের নিকট তিনি চিরকাল কৃতজ্ঞতার ভাজন হইতেন সন্দেহ নাই।

বিদ্যাসাগররচিত সীতার বনবাসকে অনেকে "কান্নার জোলাপ" কহে। ঐ পুস্তকের প্রথমাংশ ভবভূতিপ্রণীত উত্তরচরিতের প্রায় অবিকল অনুবাদ, কিন্তু অপর সমুদয়ভাগ কেবল নূতনরূপ রচনাই নহে, উহাতে যে কি মধুর, কি চমৎকারজনক ও কি অলৌকিক কাণ্ড সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনীয় নহে। বোধহয় উহাতে এমত একটী পত্রও নাই, যাহা পাঠকরিতে পাষাণের ও হৃদয়দ্রব না হয়। করুণরসের উদ্দীপনে বিদ্যাসাগরের যে, কি অদ্ভুত শক্তি আছে, তাহা এক সীতার বনবাসেই পর্য্যাপ্তরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহাহউক, আমরা ঐ পুস্তকপাঠকরিয়া তৎকালে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, বিদ্যাসাগরের লেখনীই মধুময়ী; উহা হইতে যাহা কিছু নির্গত হয়, তাহাই মধুবর্ষী হইয়া পড়ে। বলিতে কি, সীতার বনবাস পাঠাবসানে বিদ্যাসাগরকে, ঐরূপ কার্য্যে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত তাঁহার স্বনামাঙ্কিত একটী স্বর্ণময়ী লেখনী সোমপ্রকাশসম্পাদকদ্বারা অপ্রকাশ্যভাবে উপহার দিবার জন্য আমাদের বড়ই অভিলাষ হইয়াছিল; লেখনী নির্ম্মাণকরাইবার জন্য অনেক চেষ্টাও করিয়াছিলাম; কিন্তু নানাকারণে তৎকালে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই—ভাবিয়াছিলাম, অপর কোন সুযোগে উহা প্রদানকরিব। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এপর্য্যন্ত তেমন সুযোগ আর ঘটিয়া উঠিল না!

বর্ণপরিচয়, কথামালা, বোধোদয়, চরিতাবলী প্রভৃতি শিশুদিগের পাঠোপযোগী কয়েকখানি পুস্তক বিদ্যাসাগরের নিতান্ত সরলরচনার উদাহরণস্থল। এতাবতা স্পষ্টই প্রকাশ হইতেছে যে, বিদ্যাসাগর কি সরল, কি মধুর, কি ওজস্বিনী—যেরূপ রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহার সর্ব্ববিধ রচনাই লোকে সাতিশয় সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছে এবং সেই সেই বিষয়ে সেই সেই পুস্তককে আদর্শস্বরূপ স্থিরকরিয়া রাখিয়াছে। বিদ্যাসাগরের 'বিধবাবিবাহ' ও 'বহুবিবাহবিচার' নামক পুস্তকদ্বয় সারগর্ভ যুক্তিসমেত রচনার নিকষস্থল। বাঙ্গালা ভাষায় শাস্ত্রীয় বিচার করা এবং

সেই বিচার সরলভাষাসহযোগে সাধারণের হৃদয়ঙ্গমকরিয়া দেওয়া, এ উভয়ই কঠিন ব্যাপার। বিদ্যাসাগর যে কিরূপ পাণ্ডিত্যসহকারে ও কিরূপ চমৎকারিণী প্রণালীতে সেই বিষয়ের সমাধান করিয়াছেন, তাহা সেই সেই গ্রন্থ একবার অধ্যয়ন না করিলে কোন মতেই হৃদয়ঙ্গম হইবার নহে। তন্মধ্যে বহুবিবাহবিচারে উচিতমত গাম্ভীর্য্যরক্ষার কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইয়াছে, একথা অনেকেই কহিয়াথাকেন, কিন্তু বিধবা-বিবাহবিচারে যে, কোন অংশে কিছু ত্রুটি হইয়াছে, তাহা শত্রুরাও বলিতে পারেনা। ফলতঃ এই পুস্তকে বিদ্যাসাগরের বিদ্যা, বুদ্ধি, কৌশল, বহুদর্শিতা, সারগ্রাহিতা, মীমাংসকতা, বিনয় গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি অশেষ গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিতহইয়াছে। আমাদের একজন সুবিজ্ঞ আত্মীয় কহিয়াছিলেন, 'বিধবাবিবাহপুস্তকের শীর্ষস্থ পঙ্ক্তি-গুলি যথা——'পরাশরবচন বিবাহিতাবিষয়—বাগ্দত্তাবিষয় নহে,' ইত্যাদি অক্ষরগুলি ইঙ্গরেজির ইটালিক্ অক্ষরের ন্যায় বাঁকা বাঁকা অক্ষরে মুদ্রিত হইলে ভাল হইত''। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি এইমাত্র উত্তর করেন, "ইঙ্গরেজি জিওমেট্রির প্রতিজ্ঞাগুলি ইটালিক্ অক্ষরে আছে"! তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, জ্যামিতির প্রতিজ্ঞাগুলি যেরূপ অভ্রান্ত, অকাট্য যুক্তিপরম্পরাদ্বারা সপ্রমাণকরাহইয়াছে, বিধবাবিবাহপুস্তকের শীর্ষকস্থ পঙ্ক্তিগুলিও তৎপরবর্ত্তী বিচারের দ্বারা সেইরূপে নিঃসংশয়িতরূপে উপপাদিত হইয়াছে। অতএব উভয় পুস্তকেরই শীর্ষস্থ প্রতিজ্ঞাগুলি একবিধ অক্ষরে মুদ্রিতহওয়া উচিত।

বাঙ্গালারচনায় বিদ্যাসাগরের এইরূপ অসাধারণশক্তিদর্শনেই সুধী-রঞ্জনের বঙ্গভাষা গর্ব্ব করিয়াছেন——

"কি কারণ তোষামোদ করিব সকলে। পিপাসা যাবে না কভু গোষ্পদের জলে॥
বিশেষতঃ বারি বিনে কিছু নাই ডর। একাকী ঈশ্বর মম বিদ্যার সাগর॥
তার যদি জননীর প্রতি থাকে টান। ত্বরায় উঠিবে মম যশের তুফান॥"

বাস্তবিকই বিদ্যাসাগরের দ্বারা বঙ্গভাষার যশের তুফানই উঠিয়াছে।

কেহ কেহ কহেন বিদ্যাসাগরের বাঙ্গালারচনানৈপুণ্যবিষয়ে অদ্বিতীয়তা জন্মিয়াছে সত্য, কিন্তু 'বিদ্যাসাগরের মৌলিকতা (Originality) নাই—অর্থাৎ বিদ্যাসাগর অনুবাদভিন্ন মূলগ্রন্থরচনা করিতে পারেন না'। বিদ্যাসাগররচিত যেসকল পুস্তকের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই কোন না কোন পুস্তকের অনুবাদ, মূলগ্রন্থ তাহাদের মধ্যে অল্পই আছে, এ কথা অযথার্থ নহে। কিন্তু এস্থলে ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, বিদ্যাসাগরের রচনাপ্রণালীর প্রাদুর্ভাবের সময়ই বাঙ্গালাভাষার পক্ষে অন্ধকারাবস্থা হইতে আলোকে প্রবিষ্ট হইবার প্রায় প্রথম উদ্যমকাল; ঐরূপ কালে সকল ভাষাতেই মূলগ্রন্থ অপেক্ষা অনুবাদগ্রন্থই অধিক হইয়া থাকে, ইহা এক সাধারণ নিয়ম। বিদ্যাসাগর সে নিয়মের অনধীন হইতে পারেন নাই—সুতরাং তাঁহাকে মূলগ্রন্থ অপেক্ষা অনুবাদগ্রন্থই অধিক করিতে হইয়াছে। কিন্তু যিনি উপক্রমণিকা, কৌমুদী, বিধবাবিবাহসংক্রান্ত ১ম ও ২য় পুস্তক, সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যবিষয়কপ্রস্তাব, সীতার বনবাস ও বহুবিবাহবিচার রচনাকরিয়াছেন, তাঁহাকে মূলরচনা করিবার শক্তিবিহীন বলা নিতান্ত ধৃষ্টতার কার্য্য হয়।

বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনাপ্রণালী পাঠকদিগের সুবিদিত থাকিলেও আমাদিগের অবলম্বিত রীতিঅনুসারে বিধবাবিবাহ পুস্তকের উপসংহারস্থ শেষঅংশটী নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কতকাল তোমরা মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমাদশয্যায় শয়নকরিয়া থাকিবে? একবার জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে। আর কেন যথেষ্ট হইয়াছে, অতঃপর নিবিষ্টচিত্তে শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য ও যথার্থ মর্ম্ম অনুধাবনে মনোনিবেশ কর এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলেই স্বদেশের কলঙ্ক নিরাকরণকরিতে পারিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তোমরা চির সঞ্চিত কুসংস্কারের যেরূপ বশীভূত হইয়া আছ, দেশাচারের যেরূপ দাস হইয়া আছ, দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া লৌকিকরক্ষাব্রতে যেরূপ দীক্ষিত হইয়া আছ, তাহাতে এরূপ প্রত্যাশা

করিতে পারাযায়না, তোমরা হঠাৎ কুসংস্কারবিসর্জ্জন দেশাচারের আনুগত্যপরিত্যাগ ও সঙ্কল্পিত লৌকিকরক্ষাব্রতের উদ্যাপন করিয়া যথার্থ সৎপথের পথিক হইতে পারিবে। অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তিসকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া আছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থাদর্শনে তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস-হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া কঠিন, এবং ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ, তাহারা দুর্নিবার রিপুবশীভূত হইয়া ব্যভিচারদোষে দূষিত হইলে তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ, ধর্ম্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল লোকলজ্জাভয়ে তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাদের পুনরায় বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্তকরিতে সম্মত নহ। তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণহইয়া যায়, দুঃখ আর দুঃখ বোধ-হয়না, যন্ত্রণা যন্ত্রণা বোধহয়না, দুর্জয় রিপু সকল এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণপ্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ এই অনবধানদোষে সংসারতরুর কি বিষময় ফলভোগ করিতেছ! হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই; কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে!

হা অবলাগণ! তোমারা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারিনা!!।"

৺ অক্ষয়কুমারদত্তপ্রণীত চারুপাঠ প্রভৃতি।

বাঙ্গালা গদ্যরচয়িতাদিগের গুণানুক্রমে নামকরিতে হইলে বিদ্যা-সাগরের পরই ৺ অক্ষয়কুমারদত্তের নামোল্লেখ করিতে হয়। ইনি ১৭৪২ শকের শ্রাবণমাসে জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী 'চুপী' নামক গ্রামে কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺ পীতাম্বর দত্ত।

অক্ষয়কুমার, বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের নিকট সামান্যরূপ বাঙ্গালা লেখা পড়া শিখিয়া কিঞ্চিৎ পারসী অধ্যয়নকরেন। ইহাঁর পিতা কলিকাতা-খিদিরপুরে অবস্থান করিতেন। অক্ষয়কুমার ১০ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে তথায় গমন করিয়া ইঙ্গরেজিশিক্ষার নিমিত্ত অত্যন্ত যত্নবান্ হয়েন এবং ইহার উহার নিকট পড়া বলিয়া লইয়া বাটীতে বসিয়াই ইঙ্গরেজি শিখিতে থাকেন। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে সে অধ্যয়নে বিশেষ কোন ফললাভ হইত না, এজন্য তিনি সর্ব্বদাই ক্ষুন্নমনা থাকিতেন। তাঁহার পিতা এরূপ অবস্থাপন্ন ছিলেন না যে, তাঁহাকে কোন বিদ্যালয়ে রীতিমত পড়াইতে পারেন। যাহা হউক অনন্তর তাঁহার কোন আত্মীয়ের অনুগ্রহে কলিকাতার গৌরমোহন আঢ্যের 'ওরিয়েণ্টল্ সেমিনরি' নামক বিদ্যালয়ে ১৭ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে তিনি অধ্যয়নকরিতে পান এবং দৃঢ়তর অধ্যবসায় ও নিরতিশয় পরিশ্রমসহকারে ২॥০ বৎসর মাত্র অধ্যয়ন করিয়া ইঙ্গরেজি ভাষায় একপ্রকার জ্ঞানলাভ করেন।

অতঃপর তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টার জন্য তাঁহাকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু তিনি বিদ্যালয়ত্যাগ করিয়াও বিদ্যাশিক্ষা ত্যাগ করেন নাই। ঐ অবস্থাতেও স্বয়ং অনুশীলন করিয়া এবং ২।১ জন কৃতবিদ্যলোকের সাহায্য লইয়া সমুদয় ক্ষেত্রতত্ত্ব, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, কোণিক্ সেক্সন্, ফ্যাল্কুলস্ প্রভৃতি গণিত, ঐ গণিতজ্ঞানসাপেক্ষ জ্যোতিষ, মনোবিজ্ঞান ও তৎসহ ইঙ্গরেজি সাহিত্যবিষয়ক প্রধান প্রধান গ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা বিজ্ঞানের অনুশীলনে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ছিল, এক্ষণে ঐ সকল অধ্যয়নদ্বারা সে অনুরাগ কতক দূর চরিতার্থ হইল।

অক্ষয়বাবু অর্থার্জ্জনের চেষ্টারজন্যই বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে বিষয়ে অনেকদিন পর্য্যন্ত বিশেষরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সামান্য আয়ের নিমিত্ত সামান্যকার্য্যেই ব্যাপৃত হইয়া তাঁহাকে

অনেকদিন থাকিতে হইয়াছিল। এই সময়ে, যাহাতে স্বদেশীয়দিগের বিশেষ উপকার হয়, তদ্বিষয়ক প্রবন্ধরচনা করিতে তাঁহার ইচ্ছা জন্মে, কিন্তু ইঙ্গরেজিভাষায় সুনিপুণ হইয়া তদ্ভাষায় গ্রন্থরচনা করিলে বিশেষ ফললাভ হইবে না, ইহা তিনি বুঝিয়া বাঙ্গালারচনার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তদ্বিষয়ে সম্যক্ সমর্থ হইবার জন্য কিঞ্চিৎ সংস্কৃতও শিক্ষাকরিলেন। এই সময়ে বাঙ্গালায় পদ্যরচনারই অধিক প্রাদুর্ভাব ছিল, এই জন্য তিনিও প্রথমে পদ্যরচনা করিতেই আরম্ভ করিয়াছিলেন। অনন্তর প্রভাকরসম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের সহিত আলাপ ও আত্মীয়তা হইলে তাঁহার অনুরোধে গদ্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েন এবং কিয়দ্দিনপর্য্যন্ত নানাবিষয়ক গদ্যময় প্রবন্ধ লিখিয়া প্রভাকরপত্রেই প্রকাশ করেন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই যে তত্ত্ববোধিনীসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ১৭৬৫ শকের [১৮৪৩ খৃঃ অ] ভাদ্রমাসহইতে শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির যত্নে ঐ সভাহইতে 'তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা' নামে এক মাসিকপত্র প্রকাশিত হইতেলাগিল। ইতিপূর্ব্বেই অক্ষয়বাবু তত্ত্ববোধিনীসভার এক সভ্য হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনিই উক্ত পত্রিকার সম্পাদকতাকার্য্যে ব্রতীহইয়া ১৭৭৭ শকপর্য্যন্ত ১২ বৎসরকাল অবাধে ঐ কার্য্য সম্পাদন করেন। ঐ কার্য্যের ভারগ্রহণ করিয়া তিনি যেরূপ যত্ন, যেরূপ পরিশ্রম ও যেরূপ অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনীয় নহে। অক্ষয়বাবু যে উৎকৃষ্ট বাঙ্গালাগদ্যরচনার রীতি আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তত্ত্ববোধিনীপত্রিকাতেই তাহা সম্যক্ প্রকাশিত হয়। দেশের হিতকর, সমাজের সংশোধক, বস্তুতত্ত্বের নির্ণায়ক কত কত জ্ঞানগর্ভ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ যে, তৎকালে ঐ পত্রিকায় প্রকটিত হইয়াছিল, তাহার সঙ্খ্যা নাই। চারুপাঠ ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পুস্তকসকলের অধিকাংশই সর্ব্বপ্রথমে ঐ পত্রেই প্রচারিত হয়। তাঁহার ঐ সকলরচনা পাঠকরিবার জন্য গ্রাহকেরা ব্যগ্র-

ভাবে পত্রিকাপ্রকাশের দিনের প্রতি প্রতীক্ষাকরিয়া থাকিতেন এবং অনেকে তাঁহার উপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া আপন আপন আচার ব্যবহারের সংশোধন করিয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনীপত্রিকাসম্পাদন-দ্বারা অক্ষয়বাবুর আয় কিছু অধিক হইত না, কিন্তু তিনি তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কার্য্যান্তরপরিহারপূর্ব্বক নিয়তই উহার উন্নতিবর্দ্ধনার্থ চেষ্টা করিতেন। ঐ চেষ্টা সফলকরণাশয়ে স্বয়ং নানাবিধ ইঙ্গরেজিগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, ফরাসীভাষা শিক্ষাকরেন, এবং মেডিকালকালেজে গমনকরিয়া দুই বৎসরকাল রসায়ন ও উদ্ভিদশাস্ত্রের উপদেশগ্রহণ করেন। ফলতঃ এই সময়ে তিনি আপনার উন্নতি, বাঙ্গালাভাষার উন্নতি ও পত্রিকার উন্নতিজন্য এতাদৃশ কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার জীবনসহচর ভয়ঙ্কর শিরোরোগের উৎপত্তি হইয়াছিল।

১৮৫৫ খৃঃ অব্দে অক্ষয়বাবু তত্ত্ববোধিনীর কার্য্য একপ্রকার ত্যাগকরিয়া মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতনে কলিকাতানর্ম্মালস্কুলের প্রধানশিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বসঞ্চিত পীড়ার দিন দিন বৃদ্ধি হওয়ায় সে কার্য্যে কোন বিশেষ যোগ্যতাপ্রদর্শন করিতে পারেননাই। ২।৩ বৎসরমাত্র তথায় তিনি ছিলেন কিন্তু তাহারও অধিককাল পীড়াবকাশেই যাপিত হইয়াছিল। ইহা অতীব দুঃখের বিষয় ও দেশের দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, উল্লিখিত পীড়া অক্ষয়বাবুকে একবারে অকর্ম্মণ্য করিয়াফেলিয়াছিল। তিনি নর্ম্মালস্কুল ত্যাগকরিয়া অবিচ্ছেদে পীড়ার যন্ত্রণাভোগ করিতেছিলেন এবং পল্লীগ্রামে অবস্থান করা যুক্তিসিদ্ধ হওয়ায় বালীগ্রামে একটী বাটী করিয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। গত ১৮০৮ শকের ১৪ই জ্যৈষ্ঠে ৬৬ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

অক্ষয়বাবুর রচনানৈপুণ্য দর্শনে সুধীরঞ্জনের বঙ্গভাষা গর্ব্বিতবচনে কহিয়াছেন—

"কালে না পারিবে কিছু করিতে আমার। পেয়েছি কপালগুণে অক্ষয়কুমার॥
তাহার বাসনা সবে শুনিবারে পায়। অক্ষয়যশের মালা পরাইবে মায়॥"

বঙ্গভাষার এ গর্ব্ববাক্য নিষ্ফল হয়নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার প্রিয়পুত্র অকালে ওরূপ রোগগ্রস্ত না হইলে তাঁহার মুখ আরও উজ্জ্বল হইত।

অক্ষয়বাবু তিনভাগ চারুপাঠ, দুইভাগ বাহ্যবস্তুরসহিতমানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার, ধর্ম্মনীতি, পদার্থবিদ্যা ও ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায় এই কয়েকখানি পুস্তকের প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে ১ম ও ২য় ভাগ চারুপাঠে প্রকাশিত প্রস্তাবগুলির মধ্যে কয়েকটী পূর্ব্বে সংবাদ-প্রভাকরে ও কতকগুলি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রচারিত হইয়াছিল, অবশিষ্টগুলি গ্রন্থকার এই পুস্তকের জন্যই নূতন রচনা করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে বিশ্বের নিয়মও বাস্তবপদার্থসংক্রান্ত এরূপ মনোহর ও জ্ঞানপ্রদ বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক রচিত হয় নাই। এই পুস্তক দুইখানি ঐ বিষয়ে যেমন সর্ব্বপ্রথম, তেমনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই দুই পুস্তক পাঠ করিলে যে, কত নূতন বিষয়ের জ্ঞানলাভ হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা-যায়না। গ্রন্থকার ইঙ্গরেজি গ্রন্থহইতেই ঐ সকল বিষয় সঙ্কলন করিয়া-ছেন, সত্যকথা, কিন্তু তাঁহার রচনা দেখিয়া কে বলিতে পারে যে, উহা ইঙ্গরেজির অনুবাদ। বিজ্ঞাপনে স্বীকার না থাকিলে কিয়ৎকাল পরে উহা মূলরচনাই হইয়াযাইত। অক্ষয়বাবুর সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষরূপ অধিকার ছিল না, কিন্তু তাঁহার রচনা দেখিয়া কে বলিতে পারে যে, এসকল রচনা প্রগাঢ় সংস্কৃতজ্ঞের লেখনীহইতে নির্গত হয়নাই? তাঁহার রচনা যেমন সরল, তেমনই মধুর, তেমনই বিশুদ্ধ ও তেমনই জ্ঞানপ্রদ। তিনি অতি দুরূহ বিষয় সকলও চিত্রপ্রদর্শনপূর্ব্বক এমন সরলভাষায় বিবৃত করিয়াছেন যে, পাঠমাত্র সেসকল পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়াযায়। অধিক আর কি বলিব, তাঁহার দুইভাগ চারুপাঠ বাঙ্গালা শিক্ষার্থী বালকদিগের জ্ঞানরত্নের অক্ষয়ভাণ্ডার স্বরূপ।

৩য়ভাগচারুপাঠও ১ম ও ২য় ভাগের সমানই কৃতার্থতালাভ করিয়াছে; জনসমাজে ইহারও আদরের সীমা নাই। তবে এখানি অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ উচ্চ অঙ্গের হইয়াছে। ইহার অন্তর্গত 'স্বপ্নদর্শন' নামক প্রস্তাবগুলিতে কয়েকটী প্রগাঢ়বিষয়ের রূপকবর্ণনা আছে এবং গুরুতর প্রাকৃতিকঘটনা ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু সে সকল স্থলেও, অক্ষয়বাবুর লেখনী যেরূপ সরলতাপাদন করিয়াথাকে, তাহা করিতে ত্রুটি করেনাই। এই পুস্তকের রচনা ও ভাবগাম্ভীর্য্য কিরূপ উপাদেয় হইয়াছে, তাহা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য আমরা পাঠকগণকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা উহার অন্তর্গত 'মিত্রতা' 'জীববিষয়ে পরমেশ্বরের কৌশল ও মহিমা' এবং 'সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিতের সুখের তারতম্য' নামক প্রস্তাব তিনটী অন্ততঃ একবারও পাঠ করেন।

১ম ও ২য় ভাগ বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার এবং ধর্ম্মনীতি এই তিনখানি একরূপ প্রকৃতির পুস্তক। তিনখানিরই প্রস্তাবগুলির এক এক অংশ প্রথমে তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়, পরে সেই সকল একত্র সঙ্কলনপূর্ব্বক স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাদের প্রতিপাদ্যবিষয়ও প্রায় একবিধ। জর্জ কুম্বসাহেব 'কনষ্টিটিউষন্ অব ম্যান' নামক যে এক গ্রন্থরচনা করেন, তাহারই সারসঙ্কলনপূর্ব্বক দুইভাগ বাহ্যবস্তু রচিত হইয়াছে। জগদীশ্বরের নিয়ম পালনকরিলেই সুখ, লঙ্ঘনকরিলেই দুঃখ,—জগদীশ্বরের বিশ্বরাজ্যপালন সংক্রান্ত নিয়ম—কোন্ নিয়মানুসারে চলিলে কিরূপ উপকার ও কোন্ নিয়ম লঙ্ঘনকরিলে কিরূপ অপকার—ইত্যাদি উচ্চ অঙ্গের বিচার ও মীমাংসাসকল ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই সকল নিয়মানুসারে সম্পূর্ণরূপে চলিতে পারিলে সংসারের অনেক দুঃখনিবৃত্তি ও সুখবৃদ্ধি হয়—ইহা স্বীকার করাযাইতে পারে, কিন্তু সে সমুদয় যথোচিতরূপে পালনকরা কাহারও সাধ্য হয় কি না? তাহা সন্দেহস্থল। ধর্ম্মনীতিতেও শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতি

সাধন, দম্পতির পরস্পর ব্যবহার, সন্তানের প্রতি পিতামাতার ও পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য ইত্যাদি অনেক গুরুতর বিষয়ের উপদেশ, বিচার ও মীমাংসা আছে। সে সকল বিষয় অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠকরিলে ধর্ম্মানুরাগ বর্দ্ধিত হয়, মন উন্নত হয়, অনেক কুসংস্কার দূর হয় এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মে দৃঢ়তর আস্থা জন্মে। বাহ্যবস্তুতেও এই সকল বিষয়েরই অনেক উপদেশ আছে; সুতরাং ধর্ম্মনীতি, বাহ্যবস্তুর প্রতিরূপস্বরূপ হইলেও আমাদের দৃষ্টিতে এইখানিই অধিকতর রমণীয় বলিয়া বোধহয়। কারণ ইহাতে তত আড়ম্বর নাই—বাহ্যবস্তু অনর্থক আড়ম্বরে পরিপূর্ণ। রচনাও বাহ্যবস্তু অপেক্ষা ধর্ম্মনীতিতে অধিকতর সুন্দর ও পরিষ্কাররূপে লক্ষিতহয়। অক্ষয়বাবুর প্রায়সকল পুস্তকেই অনেক ইঙ্গরেজি শব্দ বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইয়াছে। সেগুলি সুন্দর হইয়াছে।

অক্ষয়বাবু সকল পুস্তকেই 'পরম কারুণিক' 'পরম পিতা' 'পরাৎপর পরমেশ্বর' 'অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় মহিমা' প্রভৃতির শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। ঈশ্বর ভাল পদার্থ বটেন, তাঁহাকে মনে করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্যও বটে, কিন্তু তালটী পড়িলেই—পাতাটী নড়িলেই—পাখীটী উড়িলেই—অর্থাৎ সকল কার্য্যেই যদি লোককে ঈশ্বরের উপদেশ দেওয়া যায়, তাহাহইলে আমাদের বোধে সে উপদেশ সফল হয়না। ঈশ্বর প্রগাঢ় চিন্তার বিষয়—অমনতর খেলাবার বিষয় নহেন। আমরা জানি, ঘন ঘন উল্লিখিত 'অত্যাশ্চর্য্য' 'অনির্ব্বচনীয়াদি শব্দের উল্লেখ করিয়া এক্ষণে অনেক পাঠকে বিদ্রূপ করিয়াথাকেন—ঈশ্বরানুরাগ প্রকাশ করেননা।

'ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়' নামক পুস্তক দুইখানি অক্ষয়বাবু অল্প দিনমাত্র প্রচারিত করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার শেষ গ্রন্থ। এইচ, এইচ, উইলসন্ সাহেব দুইখানি পারসীক ও কয়েকখানি হিন্দী ও সংস্কৃত পুস্তক অবলম্বনপূর্ব্বক ইঙ্গরেজিভাষায় "রিলিজস্ সেক্ট্স অব

হিণ্ডুস্” নামক যে প্রবন্ধ রচনাকরিয়া এসিয়াটিক্ রিসর্চ নামক পুস্তকাবলীতে প্রকাশকরিয়াছিলেন, প্রথমভাগখানি সেই প্রবন্ধকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহারও অনেকগুলি প্রস্তাব পূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল—সেইগুলির সহিত অপর কতকগুলি নূতন বিষয় সংযোজিত হইয়া এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রারম্ভে ১০৬ পৃষ্ঠে একটী দীর্ঘ উপক্রমণিকার যোজনা করিয়াছেন। ঐ উপক্রমণিকা প্রথমভাগে শেষ হয়নাই—২য় ভাগের ২৮২ পৃষ্ঠে শেষ হইয়াছে। ঐ উপক্রমণিকাটীই এই দুই গ্রন্থের প্রগাঢ় ও সার পদার্থ। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা শব্দবিদ্যার—বিশেষতঃ সংস্কৃতশাস্ত্রের—অনুশীলনদ্বারা লাটিন, গ্রীক, কেল্‌টিক্, টিউটোনিক, লেটিক, স্লাবনিক, হিন্দু, পারসীক প্রভৃতি বিভিন্নবংশীয় বিভিন্নজাতীয়দিগের যে, একভাষিকতা, একজাতিকতা ও একধর্ম্মিকতার সংস্থাপন করিয়াছেন, তদ্বিষয় বহুলপ্রমাণপ্রয়োগ ও উদাহরণসহকারে বিবৃতকরিয়া, কিরূপে হিন্দুদিগের মধ্যে বৈদিক-ধর্ম্মের প্রচলন ও প্রাদুর্ভাব হয়, এবং কিরূপে বৈদিকধর্ম্মের পর পৌরাণিক ও তান্ত্রিকাদি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা অতি বিস্তৃতিপূর্ব্বক বহু বহু প্রমাণসহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং তৎকরণাবসরে সাঙ্খ্য পাতঞ্জল প্রভৃতি ষড়্‌দর্শন, বৌদ্ধধর্ম্ম, অনেক পুরাণ ও উপপুরাণ এবং তন্ত্র প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ মতবাদসকল সঙ্ক্ষেপে ও সুচারুরূপে বিবৃত করিয়াছেন। এই সকল সংস্কৃতাদি প্রমাণ সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে যে প্রত্যেক গ্রন্থই অধ্যয়নকরিতে হইয়াছে, তাহা নহে। প্রফেসর বপ্ মোক্ষমূলর এবং উইলসন্ প্রভৃতির রচিত ইঙ্গরেজি গ্রন্থ হইতে অনেক সঙ্গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাকে অনেক অধ্যয়ন করিতে হইয়াছে, অনেক অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে ও অনেক সংগ্রহ করিতে হইয়াছে এবং সে সঙ্গ্রহকরণেও তাঁহার সামান্য বুদ্ধিমত্তা, সামান্য সারগ্রাহিতা ও সামান্য মীমাংসকতা প্রকাশিত হয়নাই।

উপক্রমণিকার পর, ভারতবর্ষে বৈষ্ণব শৈব শাক্ত সৌর গাণপত্য প্রভৃতি যে সকল উপাসকসম্প্রদায় ও তাহাদের নানাবিধ অবান্তর ভেদ আছে, তাহাদের সকলেরই নির্দ্দেশ ও ইতিবৃত্ত ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল ইতিবৃত্ত অতি সরল ও সুন্দর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ ভারতবর্ষের উপাসক সম্প্রদায় দুইখানি অক্ষয় বাবুর বিদ্যা বুদ্ধি অনুসন্ধিৎসা সারগ্রাহিতা প্রভৃতির উৎকর্ষ বিষয়ে দেদীপ্যমান প্রমাণ।

অক্ষয় বাবু এই পুস্তকে বেদ সংহিতা দর্শন পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র বিষয়ে যেরূপ অভিমতি সকল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা লইয়া বিচার করা আমাদের এ পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে; সুতরাং তদ্বিষয়ে আমরা কিছুই বলিব না, কিন্তু ইহা অবশ্য বলিব যে, তিনি হিন্দু জাতির পরম শ্রদ্ধাস্পদ ও পরম গৌরবস্থল কপিল পতঞ্জলি গোতম ব্যাস বাল্মীকি বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র প্রভৃতি প্রাচীন মহর্ষিগণের প্রতি যথোচিত সম্মানসহকৃত বাক্ প্রয়োগ করেন নাই। অনেক স্থলে তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন ও বিদ্রূপ করিয়াছেন। তিনি বিদেশী গ্রন্থকারদিগের নামোল্লেখ সময়ে "শ্রীমান্ লেসেন" "শ্রীমান্ উইলসন্" "শ্রীমান্ বেকন" "শ্রীমান্ ম-মূলর" "শ্রীমান্ কোম্‌ত" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতির কেহই তাঁহার নিকটে 'শ্রীমান্' শব্দ প্রয়োগের পাত্র হন নাই! হিন্দুদ্বেষী ইঙ্গরেজোপাসক কোন নব্য যুবকের লেখায় এরূপ থাকিলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু প্রবীণ বিজ্ঞ লেখক অক্ষয় বাবুর লেখনী হইতে তাদৃশ বাক্য সকল বহির্গত হওয়ায় কেবল যে আমরাই অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি, তাহা নহে, সমস্ত হিন্দু সমাজের যে কেহ ইহা পাঠ করিবেন, বোধহয়, তিনিই দুঃখিত হইবেন।

মাইকেলমধুসূদনদত্তের শর্ম্মিষ্ঠানাটকপ্রভৃতি।

মাইকেল মধুসূদনদত্ত অনেকের মতে বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান কবি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। অনুমান ১৭৫০ শকে জিলা যশোহরের অন্তর্ব্বর্ত্তী সাগরদাঁড়ি নামক গ্রামে কায়স্থকুলে মধুসূদনদত্তের জন্ম হয়। ইহাঁর পিতা ৺রাজনারায়ণদত্ত কলিকাতা সদর দেওয়ানি আদালতে ওকালতী করিতেন। মধুসূদন তাঁহারই নিকট অবস্থানপূর্ব্বক কলিকাতার হিন্দুকালেজে ইঙ্গরেজি অধ্যয়ন করিয়া বিলক্ষণ কৃতবিদ্য হয়েন এবং ১৬|১৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালেই জাতীয়ধর্ম্মকে অসার বোধকরিয়া খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বনকরেন। ইনি পিতার একমাত্র পুত্র, সুতরাং অন্ধের যষ্টির ন্যায় জীবনের অবলম্বন ছিলেন। বৃদ্ধবয়সে সেই অবলম্বনচ্যুত হইয়া দত্তমহাশয় সংসারকে যে, কিরূপ অন্ধকারময় দেখিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনকরা বাহুল্য। তিনি ওরূপ অবস্থাতেও মায়াত্যাগ করিতে না পারিয়া ৪বৎসর পর্য্যন্ত খরচ পত্র দিয়া পুত্রকে বিষপ্ কালেজে অধ্যয়নকরাইয়াছিলেন। অনন্তর মাইকেল কিছুকালের জন্য বঙ্গদেশ ত্যাগকরিয়া মাদ্রাজে অবস্থান করেন এবং তথায় বিদ্যাবিষয়ে বিলক্ষণ খ্যাতিপ্রতিপত্তিলাভ করিয়া ইউরোপীয় পত্নীসমভিব্যাহারে এদেশে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দের পর অবধি বাঙ্গালাগ্রন্থরচনা করিতে ইহাঁর প্রবৃত্তি জন্মে এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনাকরেন। অনন্তর আইনশিক্ষার অভিলাষে ইঙ্গলণ্ডযাত্রা করেন এবং তথায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। কলিকাতায় হাইকোর্টে বারিষ্টরের কার্য্য করিতে করিতেই ১৮৭৩ খৃঃ অব্দের ২৯এ জুনে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

তিনি প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শর্ম্মিষ্ঠানাটক, পদ্মাবতী নাটক, তিলোত্তমাসম্ভব, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ, মেঘনাদবধ, ব্রজাঙ্গনা, কৃষ্ণকুমারীনাটক, বীরাঙ্গনা, চতুর্দশপদী কবিতা-

বলী ও হেক্টরবধ এই ১১ খানি কাব্যগ্রন্থের রচনা করিয়াছেন। এত-গুলি গ্রন্থের তন্ন তন্ন করিয়া সমালোচনাকরা সাধারণ কথা নহে, এবং করিলেও আমাদের এ ক্ষুদ্রগ্রন্থে তাহার স্থানসমাবেশ হওয়া অসম্ভব, এজন্য সে চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া স্থূলরূপে কিঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

শর্ম্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী, কবিবর এই তিনখানি নাটক রচনাকরিয়াছেন, তন্মধ্যে শর্ম্মিষ্ঠাই তাঁহার প্রথম চেষ্টার ফল। চন্দ্র-বংশীয় রাজা যযাতি, শুক্রাচার্য্যদুহিতা দেবযানী ও দৈত্যরাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা সংক্রান্ত যে উপাখ্যান মহাভারতে বর্ণিত আছে, তাহাই অব-লম্বন করিয়া এই নাটক রচিত হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকের রীতি এই যে, উহাতে নাটকীয়পাত্রেরা একবারে প্রবিষ্ট হয় না। উহার প্রথমে প্রস্তাবনা নামে একটী প্রকরণ থাকে—সেই প্রকরণে সূত্রধার, নট, নটী বা বিদূষক সমবেত হইয়া আপনাদের নিজ নিজ কথাপ্রসঙ্গে নাটকীয় বস্তুর অবতারণা করে—তৎপরে সেই সূত্রে নাটকীয় পাত্র আসিয়া রঙ্গস্থলে উপস্থিত হয়। এক্ষণকার চলিতযাত্রার বাসুদেবী, কালুয়া ভুলুয়া, মেথরাণী বা ভিস্তীওয়ালার কাণ্ড যেরূপ, সংস্কৃতনাটকের প্রস্তাবনাও সেইরূপ। তবে চলিতযাত্রাওয়ালারা সহৃদয়তার অভাবে বাসুদেবী প্রভৃতির সহিত প্রধানযাত্রার কোন সম্বন্ধই রাখিতে পারে না, কিন্তু সংস্কৃতনাটকে তাহা হয় না—প্রস্তাবনার সহিত মূল নাট-কের বিলক্ষণ সম্বন্ধ থাকে এবং সেই সম্বন্ধ স্থানবিশেষে যে, কিরূপ রমণীয় হয়—যাঁহারা শকুন্তলা, রত্নাবলী, বেণীসংহার ও মুদ্রারাক্ষস নামক সংস্কৃতনাটকের প্রস্তাবনা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন। ইঙ্গরেজি নাটক এরূপে আরব্ধ হয় না—উহাতে প্রস্তাবনা নাই—রঙ্গস্থলে একবারেই নাটকীয় পাত্র প্রবিষ্ট হয়। বাঙ্গালাভাষায় যে সকল নাটকরচনা হইয়াছে ও হই-তেছে, তাহাতে গ্রন্থকারের রুচিঅনুসারে ঐ দুইরূপ প্রণালীই অনু-

সৃত হইয়াথাকে। এইজন্য আমরা ঐ দুইরূপ নাটককে পৃথক্‌রূপে বুঝাইবার অভিপ্রায়ে "সংস্কৃতধরণী" ও "ইঙ্গরেজিধরণী" এই দুইটী পৃথক্‌ নাম দিলাম। ইতিপূর্ব্বে কুলীনকুলসর্ব্বস্ব প্রভৃতি যে সকল নাটক রচিত হইয়াছে, তাহার রচয়িতারা সংস্কৃতজ্ঞলোক—সুতরাং সে সকলে সংস্কৃতধরণ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মাইকেলমহাশয়ের নাটক ইঙ্গরেজিধরণ ত্যাগকরিয়া যে, সংস্কৃতধরণী হইবে, তাহা সম্ভব নহে। শর্ম্মিষ্ঠা প্রভৃতি তাঁহার সকল নাটকই ইঙ্গরেজিধরণে আরব্ধ হইয়াছে। এই নাটকে শর্ম্মিষ্ঠার সুশীলতা, দেবযানীর উগ্রভাব ও বিদূষকের পরিহাসরসিকতা উৎকৃষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে—তবে রাজা দেবযানীলাভে গদ্গদভাবে তাদৃশ আনন্দপ্রকাশ করিয়াও পরক্ষণেই যে আবার শর্ম্মিষ্ঠারপ্রতি সানুরাগ নয়নপাত করিয়াছেন, তাহা পবিত্রপ্রণয়ের উপযুক্ত কার্য্য হয় নাই। আর বিদূষক ও নটী সংক্রান্ত কাণ্ডও বিলক্ষণ বিরক্তিকর।

পদ্মাবতী নাটকের উপাখ্যানটী কবির স্বকপোলকল্পিত। ইহার স্থূল বিবরণ এই যে, বিদর্ভনগরাধিপতি রাজা ইন্দ্রনীল মৃগয়ার্থ বিন্ধ্যপর্ব্বতে উপস্থিত হইলে, দৈবক্রমে ইন্দ্রাণী শচী, যক্ষরাজপত্নী মুরজা ও কামকান্তা রতি তথায় গিয়া উপস্থিত হয়েন। নারদ তাঁহাদিগকে তথায় দেখিয়া কন্দল বাধাইবার অভিলাষে একটী স্বর্ণপদ্ম প্রদানপূর্ব্বক কহেন যে, "তোমাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী, তিনিই ইহা গ্রহণ করুন।" অনন্তর তাঁহারা আপন আপন সৌন্দর্য্যের জন্য পরস্পর বিলক্ষণ বিবাদ করিয়া পরিশেষে রাজা ইন্দ্রনীলকে মধ্যস্থ মানেন। ইন্দ্রনীল রতিকে সর্ব্বপ্রধান সুন্দরী বলিয়া দেওয়ায় শচী ও মুরজা ক্রুদ্ধ হইয়া যান এবং রতি প্রসন্না হইয়া মাহেশ্বরীপুরীপতির কন্যা অলৌকিকরূপসম্পন্না পদ্মাবতীর সহিত ইন্দ্রনীলের বিবাহ দিয়া দেন। বিবাহের পর শচী ও মুরজার কোপে উভয়কেই বিস্তর ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল, পরে রতিদেবীর অনুকূলতায় সে সকল ক্লেশ

দূর হয়।—স্বর্ণপদ্ম লইয়া রূপগর্ব্বিত দেবীগণের বিবাদের উপাখ্যানটী নূতন নহে। ট্রয়নগরের রাজপুত্র পারিসকে মধ্যস্থ মানিয়া এথেনা, জুনো ও বিনস্ দেবীর স্বর্ণআপেলসংক্রান্ত সৌন্দর্য্যবিবাদমীমাংসার যে বিবরণ প্রাচীন গ্রীকদিগের ধর্ম্মবিবরণে প্রসিদ্ধ আছে, উহা তাহা হইতেই গৃহীত। তথাপি কবি উহাকে বাঙ্গালায় অতি মনোরমরূপে অবতারিত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন এই পুস্তকে বিশেষ প্রশংসা বা অপ্রশংসার বিষয় কিছুই দেখিতে পাওয়াযায়না। সংস্কৃতনাটকের অনুকরণে ইহারও আদ্যোপান্তে বিদূষকের সংসর্গ আছে। তদ্ভিন্ন মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রমে পদ্মাবতীর সহিত রাজার মিলনাদি, মরীচিসকাশে শকুন্তলাসহ দুষ্মন্তের মিলনের অনুকৃতি বলিয়াই বোধহয়। ফলতঃ শকুন্তলাপাঠের পরই যে, কবি এই নাটকরচনা করিয়াছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি স্পষ্টপ্রমাণ লক্ষিত হয়। এই নাটকের মধ্যে অনেকগুলি গীত দৃষ্ট হইল। পদ্যগুলি নূতনপ্রকার—অর্থাৎ অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দে রচিত। বাঙ্গালা পয়ারের প্রতিঅর্দ্ধের শেষ অক্ষরে মিল থাকে, এইজন্য উহাকে মিত্রাক্ষরছন্দ বলাযায়—অমিত্রাক্ষরে সেরূপ মিল নাই। এই ছন্দ ইঙ্গরেজির মিল্টন্ প্রভৃতির গ্রন্থে বহুসমাদৃত, বাঙ্গালায় কেহই এ পর্য্যন্ত উহার অনুকরণ করেননাই—মাইকেলই উহার সৃষ্টিকর্ত্তা বা প্রবর্ত্তয়িতা, এবং পদ্মাবতীনাটকই উহার প্রথম প্রয়োগস্থল।

কৃষ্ণকুমারী নাটকের উপাখ্যানটী কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক মূল লইয়া রচিত। বোধহয়, রঙ্গলালবন্দ্যোপাধ্যায়ের "পদ্মিনী উপাখ্যান" পাঠকরিয়াই কবির, ঐরূপ উপাখ্যানে নাটকরচনা করিবার, প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। জয়পুরপতি জগৎসিংহ ও মরুদেশাধিপ মানসিংহ ইহাঁরা উভয়েই উদয়পুরাধিপতির দুহিতা কৃষ্ণকুমারীরপ্রতি আসক্ত হইয়া উদয়পুরের প্রতিকূলে ঘোরতর সমরানল প্রজ্জ্বলিতকরিলে রাজা তন্নির্ব্বাপণে আপনাকে অসমর্থ বোধকরিয়া সর্ব্ববিবাদের মূলীভূত আপন আত্মজার প্রাণবিনাশে কৃতসংকল্প হয়েন এবং কৃষ্ণকুমারী তাহা জানিতে

পারিয়া আত্মহত্যাদ্বারা সকল দিক্ বজায় রাখেন—ইহাই এই গ্রন্থের স্থূলমর্ম্ম। আমরা পুস্তকখানি পাঠকরিয়া পরম প্রীত হইলাম, বিশেষতঃ ধনদাসের লোভ ও ধূর্ত্ততা এবং মদনিকার চাতুরীবর্ণন বড়ই সুকৌশলসম্পন্ন বলিয়া বোধ হইল। এই নাটকের কোন কোন অংশে কিছু কিছু দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণকুমারীকে হত্যাকরিবার পরামর্শে রাজা ও রাজভ্রাতার বিলাপ এবং আত্মহত্যাকরণসময়ে কৃষ্ণকুমারীর চিরবিদায়গ্রহণ পাঠকরিয়া আমাদের নয়ন এরূপ অশ্রুপ্লুত হইল যে, কোন বিষয়ই আর দৃষ্টিগোচর হইল না।

সকল সংস্কৃত নাটকেরই উপসংহার শুভান্ত হয়—অশুভান্ত বর্ণন সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের মতে নিষিদ্ধ। কিন্তু ইঙ্গরেজিকাব্যে অশুভান্ত ঘটনা অনেক দেখিতেপাওয়াযায়, এবং সেইগুলিই আবার তজ্জাতীয় কাব্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট। ওরূপ বর্ণনাপাঠ পূর্ব্বে আমাদের ভাল লাগিত না। কিন্তু বোধহয় কালভেদে বা অবস্থাভেদে রুচিভেদ হইয়াথাকে—সুতরাং আমাদেরও রুচি কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—এজন্য এখন্ আমরা বুঝিতেপারি যে, করুণরসের উদ্দীপনকরাই যেখানে প্রধান উদ্দেশ্য, সেখানে অশুভান্তঘটনার বর্ণনদ্বারা সে রস যেরূপ উদ্দীপ্ত হয়—অন্য কোনরূপে সেরূপ হইতে পারে না। আরও আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদিগের আদিকাব্য রামায়ণ, সীতার পাতালপ্রবেশরূপ অশুভান্ত ঘটনাতেই পর্য্যবসিত। অথচ তাহা কোন আলঙ্কারিকেই অযুক্ত বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং কৃষ্ণকুমারীনাটক অশুভান্ত বলিয়া আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি বোধ হইল না।

‘একেই কি বলে সভ্যতা?’ ও ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।’ এ দুইখানি প্রহসন—অর্থাৎ হাস্যরসোদ্দীপক ক্ষুদ্র অভিনেয় পুস্তক। ইহার প্রথমখানি কলিকাতাস্থ এক নববাবুর, সভা করিয়া জ্ঞানবৃদ্ধি করিবার ছলে, সুরাপানাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। আমাদিগের বিবেচনায় এরূপপ্রকৃতির যতগুলি পুস্তক হইয়াছে, তন্মধ্যে এইখানি

সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাদ্বারা কলিকাতাবাসী অনেক নববাবুর চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, এবং সেই চিত্রগুলি যে, কিরূপ যথাযথ ও হাস্যরসোদ্দীপক হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ একবার পাঠকরিয়া দেখিবেন। সারজন্ ও বাবাজীর বৃত্তান্ত, জ্ঞানতরঙ্গিণীসভায় বক্তৃতা, সুরাপান ও খেমটার নাচ, কুলবালাদিগের তাসখেলা, সুরামত্ত নববাবুর প্রলাপশ্রবণে জননীর শঙ্কা প্রভৃতি বর্ণিত সমস্ত ঘটনাগুলিই যেন আমাদের চক্ষুর উপর নৃত্য করিতেছে। এক্ষণকার বাবুরা যে, কিরূপ ইঙ্গরেজিমিশ্রিত বাঙ্গালাভাষা ব্যবহারকরিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাও ইহাতে প্রচুররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ, একজন পল্লীগ্রামস্থ বৃদ্ধ জমীদারের লম্পটতাবর্ণনসম্পৃক্ত। মাইকেলমধুসূদনদত্ত এমন সুসামাজিক লোক হইয়াও কি জন্য যে, এরূপ অসঙ্গত ও জঘন্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলামনা। আমাদের বোধ আছে, গোঁড়া হিন্দুরা অপরাপর অপকর্ম্মে রত হইলেও জাতিভ্রংশকর যবনীসংসর্গে কখনই ওরূপ ব্যগ্র হয়েননা। ঐ কাণ্ড যৌবনের উদ্রেক সময়ে হইলেও কথঞ্চিৎ সম্ভব হইত—এ তাহা নহে—প্রাচীন অবস্থায়! যে দোষ সমাজমধ্যে বহুলপ্রচার হইয়াউঠে, পরিহাসচ্ছলে তদ্দোষাক্রান্ত ব্যক্তিবিশেষের দুরবস্থাদি প্রদর্শনপূর্ব্বক সেই দোষের হেয়তাবোধসম্পাদনই প্রহসনরচনার উদ্দেশ্য। কিন্তু পল্লীগ্রামস্থ জমীদারদিগের মধ্যে গ্রন্থকারের বর্ণিতরূপ ভক্তপ্রসাদ কয়জন আছেন?—কৈ পাঠকগণ! ওরূপ জমীদার সচরাচর দেখিতে পান কি?—ফলতঃ এই পুস্তকখানি পল্লীগ্রামস্থ জমীদারদিগের না হইয়া গ্রন্থকারেরই কলঙ্কস্বরূপ হইয়াছে।

মাইকেলের নাটকসমালোচনার এই প্রসঙ্গেই আমাদিগকে আর একটী কথার উল্লেখ করিতে হইতেছে। এক্ষণে দেখিতে পাওয়াযায় যে, অনেকেই নাটকীয় অঙ্ক সকলের প্রথমে 'প্রথম গর্ভাঙ্ক' 'দ্বিতীয়

গর্ভাঙ্ক' ইত্যাদি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা বিলক্ষণ বুঝিয়া-দেখিলাম যে, সেইগুলি সেই সেই অঙ্কের অবান্তর ভাগ। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ঐ সকল 'গর্ভাঙ্ক' শব্দদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত নহে। কারণ সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা গর্ভাঙ্ক শব্দের অন্যরূপ অর্থের বোধনার্থ লক্ষণ করিয়াছেন—সাহিত্যদর্পণকার লেখেন যে, অঙ্কের মধ্যেই রঙ্গদ্বার, প্রস্তাবনা, বীজ ও ফলোৎপত্তিসমেত যে, অপর এক অঙ্ক প্রবিষ্ট হয়, তাহাকেই গর্ভাঙ্ক বলাযায় *। এতদুক্তলক্ষণ গর্ভাঙ্কের সহিত এক্ষণকার নাটকরচয়িতাদিগের গর্ভাঙ্কের একতা হয়না।

তিলোত্তমাসম্ভব ও মেঘনাদবধ এই দুই খানি কাব্য আদ্যোপান্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। কাব্যরচনার প্রারম্ভ দুইরূপে হইয়া থাকে—একরূপ এই যে, উপাখ্যানের মূল হইতে আরম্ভ করা ;—দ্বিতীয় রূপ, কোন এক মধ্যস্থল হইতে আরম্ভকরিয়া ক্রমে সমুদয় বিবরণ প্রকাশকরা। এই দ্বিতীয় পদ্ধতি ইউরোপীয় কাব্যে সর্ব্বদা অনুসৃত হইয়াথাকে। গ্রীক্‌কবি হোমরের ইলিয়াড্ রচনাই বোধহয় উহার মূল। সংস্কৃতেও যে, এই সমধিককৌতূহলজনিকা পদ্ধতির প্রচলন নাই, একথা বলাযায়না—সংস্কৃত নাটকমাত্রেই, দশকুমারচরিতনামক আখ্যায়িকায় এবং বিশেষ বিবেচনাকরিয়া দেখিলে রামায়ণ ও মহাভারতেও কিয়ৎ-পরিমাণে এই পদ্ধতিরই অনুসরণ দেখিতে পাওয়াযাইবে। যাহা হউক, এক্ষণে অনেকে ইহাকে ইঙ্গরেজিপদ্ধতি বোধকরেন, এই জন্য আমরাও উহার নাম ইঙ্গরেজিপদ্ধতি রাখিলাম। তিলোত্তমাসম্ভব ও মেঘনাদবধ উভয় কাব্যই এই ইঙ্গরেজিপদ্ধতিক্রমে আরব্ধ হইয়াছে। সুন্দ ও উপসুন্দ নামক অসুরদ্বয়ের উপদ্রবে উৎপীড়িত সুরগণ তিলোত্তমানাম্নী

* অঙ্ক প্রস্তাবাদ্যার্গর্ভাঙ্কমাহ। অঙ্কোদরপ্রবিষ্টো যো রঙ্গদ্বারামুখাদিমান্। অঙ্কোঽপরঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সবীজঃ ফলবানপি॥—যথা বালরামায়ণে রাবণংপ্রতি কঞ্চুকী "শ্রবণৈঃ পেয়মনেকৈ দৃশ্যংদীর্ঘৈশ্চ লোচনৈর্ব্বহুভিঃ। ভবদর্থমিব নিবদ্ধং নাট্যংসীতাস্বয়ম্বরণং"। ইত্যাদিনা বিরচিতঃ সীতাস্বয়ম্বরো নাম গর্ভাঙ্কঃ॥ ১২৭ পৃ।

অপরূপরূপা এক সুরসুন্দরীর সৃষ্টি করেন—দৈত্যদ্বয় তাহার রূপলাবণ্যে মোহিতহইয়া প্রত্যেকেই তাহাকে আপন প্রণয়িনী করিবার জন্য বিবাদ করে এবং সেই বিবাদে পরস্পর পরস্পরের কর্ত্তৃক হত হয়,—এই ভারতীয় উপাখ্যান অবলম্বনকরিয়াই তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য বিরচিত হইয়াছে। ইহা ৪টী সর্গে বিভক্ত। এই পুস্তক প্রথমে বহির্গত হইলে আমরা আগ্রহ সহকারে পাঠকরিতে প্রবৃত্ত হই, কিন্তু মিষ্টবোধ না হওয়ায় ত্যাগ করি। কিছু দিন পরে কাহারও কাহারও মুখে ইহার প্রশংসা বাদ শুনিয়া আবার ইহা পড়িতে প্রবৃত্ত হই, কিন্তু আবার ত্যাগ করি; এইরূপ ২|৩ বার করিয়াও গ্রন্থখানি একবারও আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে পারিনাই। আমরা প্রথমে ইহা পাঠকরিতে পারিনাই, বলিয়া কেহ এরূপ বুঝিবেন না যে, তিলোত্তমা রসবতী নহেন;—ইহাতে উৎকৃষ্ট রস আছে, কিন্তু সেই রস কর্ণের অনভ্যস্ত কর্কশায়মান নূতন ছন্দ, দুরান্বয়, 'ভূষেন' 'অস্থিরি' 'কাম্ভিল' 'কেলিনু' প্রভৃতি মাইকেলি নূতনবিধ ক্রিয়া-পদ, ব্যাকরণদোষ প্রভৃতি কণ্টকাবৃত কঠিন ত্বকে এরূপ আচ্ছাদিত যে, তাহা ভেদকরিয়া স্বাদগ্রহ করিতে সকলের পক্ষে পরিশ্রম পোষায় না।

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রতিপাদ্য নামের দ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছে। এই কাব্য বীররসাশ্রিত এবং ইহা ৯ সর্গে বিভক্ত। গ্রন্থকার বীরবাহুর পতন হইতে গ্রন্থারম্ভ করিয়াও উপাখ্যানের সম্পূর্ণতাসম্পাদনার্থ প্রসঙ্গক্রমে রামায়ণের বহুল অংশ ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বর্ণিত বিষয়গুলি যে, সমুদয়ই বাল্মীকি হইতে গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও নহে; কবিতাজননী অসাধারণী কল্পনাশক্তির বলে কবি, কত কত নূতন বিষয়েরও সৃষ্টি করিয়াছেন। মেঘনাদবিষয়ে বাক্‌প্রয়োগ করা বড় সহজ কথা নহে। বাঙ্গালাবিনোদীদিগের মধ্যে এক্ষণে দুইটী বিশেষ দল হইয়াছে—এক দলের লোকে মেঘনাদের অতি প্রশংসাকারী,—ইঙ্গরেজীতে কৃতবিদ্যগণই এই দলে অধিক। ইহাঁদের মধ্যে অনেকে

এরূপ আছেন যে, তাঁহারা মাইকেলের লেখা 'ম'—বলিলেই ঘুসী উঁচাইয়া আইসেন; 'ধ' পর্য্যন্ত বলিবার অপেক্ষা রাখেন না! আর এক দল না বুঝিয়াও অনর্থক নিন্দা করেন। আমরা এই দুই দলের নাম 'গোঁড়া' ও 'নিন্দক' রাখিলাম—আমরা স্বয়ং কপাটি খেলার ঘোলষাঁড়ের ন্যায় উভয়দলেই থাকিব। সুতরাং দুইদলের নিকটই আমাদের অপরাধ মার্জ্জনীয় হইবে।

মেঘনাদবধ মাইকেলসাগরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন। ইহাতে কবি কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, সহৃদয়তা ও কল্পনাশক্তির এক শেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা যে কবির তিলোত্তমা পাঠকরিতে বিরক্ত হইয়াছিলাম, সেই কবির সেই ছন্দোগ্রথিতই মেঘনাদ যে, কত আনন্দের সহিত পাঠকরিয়াছি তাহা বলিতে পারিনা। সেতুদ্বারা বদ্ধ মহাসমুদ্রদর্শনে রাবণের উক্তি, পুত্রশোকাতুরা চিত্রাঙ্গদার রাবণসমীপে খেদ, ইন্দ্রজিতের রণসজ্জা, পতিদর্শনার্থ মেঘনাদপ্রিয়া প্রমীলার বহির্গমন, অশোকবনে সরমার নিকট সীতার পূর্ব্বপরিচয়দান, শ্রীরামের যমপুরীদর্শন প্রভৃতি বর্ণনাগুলি পাঠকরিলে মনোমধ্যে দুঃখ শোক উৎসাহ বিস্ময় প্রভৃতি ভাবের কিরূপ আবির্ভাব হয়, তাহা বর্ণনীয় নহে। বাঙ্গালায় বীররসাশ্রিত কাব্যের উচিতরূপ সদ্ভাববিরহ এই এক মেঘনাদ দ্বারা অনেক অংশে পূরিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক কবি পৃথিবীস্থ বস্তুর বর্ণন করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন, ইনি তাহা হয়েন নাই; ইনি কল্পনাদেবীর অক্লান্তপক্ষের উপর আরোহণ করিয়া স্বর্গ—মর্ত্ত্য—পাতাল—কোথাও বিচরণ করিতে ক্রটি করেন নাই। ইনি এই কাব্যের আত্মস্বরূপ রসটীকে যেরূপ বীরপুরুষ করিয়াছেন, তাহার পরিচ্ছদস্বরূপ রচনাটীকেও সেইরূপ ওজস্বিনী করিয়া দিয়াছেন। এই সকল গুণগ্রাম থাকায় মেঘনাদবধ একটী উৎকৃষ্ট কাব্য মধ্যে গণ্য হইয়াছে। একজন কৃতবিদ্য কবি মেঘনাদের টীকা করিয়াছেন, এবং আর একজন ইহার একখানি সমালোচনা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন সংবাদপত্রে

ইহার গুণদোষব্যাখ্যা লইয়া যে, কত বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহা কবি ও কাব্যের পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা নহে।

মেঘনাদ এইরূপ গুণশালী ও সৌভাগ্যসম্পন্ন হইলেও নির্দ্দোষ নহে। তিলোত্তমাসম্ভবের কবিতায় দূরান্বয় ও ব্যাকরণদোষ যত দেখিতে পাওয়াগিয়াছে, ইহাতে তত দেখাযায়না সত্য বটে; কিন্তু দানিমু, চেতনিলা, অস্থিরিলা প্রভৃতি চক্ষুঃশূলস্বরূপ নূতন ক্রিয়াপদের কিছুমাত্র ন্যূনতা নাই। তাছাড়া, 'দ্বিরদরদনির্ম্মিত' 'মরি, কিবা' 'হায়রে যেমতি' ইত্যাদি কতকগুলি কথার এত শ্রাদ্ধ হইয়াছে যে, সে গুলি দেখিলে হাস্যসম্বরণ করিতে পারাযায়না। উপমা, রূপক, উৎ-প্রেক্ষা, নিদর্শনা প্রভৃতি অনেক অলঙ্কার অনেকস্থলে উৎকৃষ্টরূপে সম্বদ্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু এমত অনেকস্থলও আছে, যেখানে সেইং অলঙ্কার-গুলি অতি কষ্টে বুঝিয়া লইতে হয়। ২ | ৩টী কথাদ্বারা উৎকৃষ্ট কবিরা যে সকল অলঙ্কার নির্ম্মিত করিয়া থাকেন, মেঘনাদে সেগুলি প্রস্তুত করিতে কখন কখন দুই তিন পঙ্‌ক্তিও লাগিয়াছে। মাইকেলের আর একটী দোষ এই, তিনি বোধহয়, অভিধান দেখিয়া অপ্রচলিত কঠিন কঠিন শব্দ বাহির করিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহার রচনাও দুর্ব্বোধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কবির রচনায় যেরূপ কোমল ও সর্ব্বদা প্রচলিত শব্দের প্রয়োগদ্বারা প্রাঞ্জলতা, মনোহারিতা, চিত্তাকর্ষকতা ও মধুরতা জন্মিয়া থাকে, ইহাতে তাহার কিছুই হয়নাই।

এস্থলে আর একটী বিষয়ের বিচার করা আবশ্যক হইতেছে। কেহ কেহ কহেন যে, 'মেঘনাদবধ যে, এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে, অমিত্রাক্ষর ছন্দই তাহার প্রধান কারণ; মিত্রাক্ষর ছন্দে দুই পঙ্‌ক্তিতেই সমুদয় ভাব শেষ করিতে হয়, সুতরাং বীররসের অনুরূপ ওজস্বিনী রচনা ইহাতে স্থান পায়না—এদিকে অমিত্রাক্ষরে ভাবপ্রকাশার্থ যতদূর ইচ্ছা, ততদূর যাওয়া যাইতে পারে, সুতরাং আয়তনের স্বল্পতাবশতঃ ক্ষোভ পাইতে হয়না'—ইত্যাদি। একথা আমরা সম্পূর্ণরূপ অস্বীকার করিনা কিন্তু

ইহাও বলি যে, যখন্ কাশীরাম, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, রঙ্গলাল, ঈশ্বরগুপ্ত প্রভৃতি কবিগণ মিত্রাক্ষরতা রক্ষাকরিয়াও বীররসবর্ণনে অসমর্থ হয়েন নাই, তখন্ ইনিও চেষ্টা করিলে যে, অসমর্থ হইতেন, তাহা বোধহয়না। আমাদের বোধহয়, ইনি একটা নূতনরূপ কাণ্ড করিয়া "উৎপৎস্য-তেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা কোলোহ্যয়ং নিরবধির্ব্বিপুলাচ পৃথ্বী" ভবভূতির এই গর্ব্ববাক্য স্বয়ং প্রয়োগ করিবার বাসনারই বশবর্ত্তী হইয়া এই অমিত্রাক্ষর ছন্দে গ্রন্থরচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং ইঙ্গরেজির অনুকরণপ্রিয় আমাদের কৃতবিদ্যদলও মিল্টনের ছন্দের অনুকরণ বাঙ্গালায় প্রবর্ত্তিত হইল, দেখিয়া আহ্লাদে ঐ প্রণালীর গোঁড়া হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু কবি যতই গর্ব্ব করুন এবং কৃতবিদ্য দল তাঁহার যতই সমর্থন করুন—অসঙ্কুচিতমনে বলিতে হইলে আমরা অবশ্য বলিব যে, অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দ আমাদের অথবা একটী বিশেষ দলভিন্ন দেশের কাহারও প্রিয় হয়নাই। আমরা মেঘনাদবধের যে, ওরূপ মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিলাম, তাহা ছন্দের গুণে নহে—কবিত্বের গুণে। ওরূপ অসাধারণ কবিত্বের প্রশংসা না করিয়া কে থাকিতে পারে?

মাইকেলের রচনা ও ছন্দের বিষয়ে দেশের লোকের যে কিরূপ অভিপ্রায়, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পদ্যটীতে অনেক প্রকাশিত হইবে।

"ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য।"

ফণিণ-বাহন সাধু অনুগ্রহনিয়া
প্রদান সুপুচ্ছ মোরে—দাও চিত্রিবারে
কিম্বিধ কৌশলবলে শকুন্ত—দুর্জ্জয়—
পললাশী বজ্রনখ-আশুগতি আসি
গন্ধগন্ধা ছুচ্ছুন্দরী সতীরে হানিল?
কিরূপে কাঁপিল ধনী নখর-প্রহারে,
যাদঃপতি-রোধঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে।
অর্ক আরুহের তলে বিভ্রন্ত গমনে—
(অন্তরীক্ষ-অব্ধে যথা কলম্বলাঞ্ছিত,
সু আশুগ-ইরম্মদ গমে সন্ সনে)
চতুষ্পাদ ছুচ্ছুন্দরী মর্ম্মরিয়া পাতা,
অটছে একদা, পুচ্ছ পুষ্পগুচ্ছ-সম
নড়িছে পশ্চাৎভাগে। হায়রে যেমতি
সুশ্যামল বঙ্গগৃহে কন্যার শরদে,
বিশ্বপ্রসূ-বিশ্বম্ভরা দশভূজা কাছে,—
(আভীশ-আত্মজা যিনি গজেন্দ্রাস্যমাতা)

বাজেন চামর লয়ে ঋত্বিক্ মণ্ডলী।
কিম্বা যথা ঘটিকাযন্ত্রের দোলদণ্ড
ঘন মুহুর্মুহুঃ দোলে। অথবা যেমতি
মধু-ঋতু-সমাগমে আর্য্যাস্কজালয়ে—
(বিষ্ণু-পরায়ণ যাঁরা) বিচিত্র দোলনে—
দারু-বিনির্ম্মিত-দোলে রমেশ হরষে।
কিম্বা যথা আর্ককলা নেড়া শীর্ষে নড়ে,
বাদেন মুরজ যবে হরিসঙ্কীর্ত্তনে।
সুবিরল তনুরুহে তনু আবরিত,
শোভে যথা ইন্দ্রলুপ্ত-কীট-ক্ষত মৌলি।
কিম্বা যথা বীতরুহ দ্বিরদশরীর।
লম্বোদর-বাহন মুষিক-বপুঃ-সম
তব সুকুমার কান্তি নবনী-গঞ্জিত।
চারুপাদ চতুষ্টয় গমনসময়ে
কি সুন্দর বিলোকিতে! হায়রে যেমতি
চতুর্দ্দণ্ড সহযোগে চালায় নাবিক
ক্রীড়াতরী। প্রতিপদে নখর পঞ্চম
অতি ক্ষুদ্র, সহকার-সম্ভূত কীটাণু
যথা, তাহে তির্য্যগতা সূক্ষ্মতা কিয়তী!
(বেতস দ্রুমের কিম্বা সূচ্যগ্র তনিষ্ঠ
তথা ন্যুজ আকর্ষাগ্র ভাগ সমতুল)
সুদীর্ঘ মস্তক, যথ্যমিত্রাস্য যেমতি—
কিন্তু অগ্রভাগ সূক্ষ্ম। তীক্ষ্ণ রদরাজী
শ্রেণীদ্বয়ে ব্যবস্থিত বক্ত্র-অভ্যন্তরে।
মৌক্তিক প্রলম্বপ্রায় শোভে ঝলমলে,
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত-প্রসাধন্যুপম
সে দশন-আবলি, সুষমা কিসুন্দর!
ত্রপিষ্ঠা-তরুণাম্বক-তুল্য নেত্রযুগ;
উন্মীলিত কিম্বা মুকুলিত বোধাতীত।
সুকোমল মধ্যাহ্নার্ক—মরীচি নিকর
অসহ্য সে দৃশে;—হায় ত্বিষাম্পতি তেজঃ
দিবাভীত-নেত্র যথা নাপারে সহিতে।
পদ্মগন্ধে! বপুগন্ধে দিক্ আমোদিত
করিয়া গমিছ কোথা? তোমার সৌরভে
দ্রাক্ষাত্মজা শীধুসতী শুক বলি মানে;
দাস-রাজ-তনয়া-সুরভিগন্ধি তব
শরীর-সুরভি যদি লভিতেন কভু,
পরিবরতিয়া স্বীয় পদ্মগন্ধা নাম
লইতেন পূতিগন্ধা-আখ্যান বিবাদে
(বিসর্জ্জি প্রতিমা যথা দশমী দিবসে)।
মুন্যষভ পরাশর জীবিত থাকিলে,
সত্যবতী ত্যজি পাণি পীড়িতেন তব।
জগতের হিতহেতু মলাদন করি
পেয়েছ সুগন্ধ; যথা ব্যোমকেশ শূলী
অজর-শিবার্থ তীব্র বিষ অশনিলা।
নিরমিতে, ভামিনি! কি সূতিকা-আগার
শৈবালাহরণ জন্য অট ইতস্ততঃ?
পর্ণশালা বিরচিতে সৌমিত্রি-কেশরী—
মহেষ্বাস—উর্ম্মিলা-বিলাসী অটবীতে
আহরিলা পত্রচয় যথা ত্রেতাযুগে।
যাও, ধনী, যাও চলি বসুধা-গহ্বরে
ত্বরিত, নতুবা নাশ করিবে বায়সে।
হায়রে গরাসে যথা আশী-বিষ ক্রূর
মণ্ডূকেরে; সৈংহিকেয় অথবা যেমতি
পৌর্ণমাসী অন্তে গ্রাসে অত্রাক্ষি সম্ভবে;
কিম্বা মিত্রবর্গ যশ হরে মধু যথা।

ইতি ছুচ্ছুন্দরীবধে কাব্যে প্রস্তাবনা
নাম প্রথমসর্গ সমাপ্ত *।"

* ১২৭৪ শালের ১২ই আশ্বিনের অমৃতবাজার পত্রিকাহইতে উদ্ধৃত।

বীরাঙ্গণা কাব্য—এখানিও অমিত্রাক্ষরছন্দোনিবদ্ধ। শকুন্তলা, তারা, রুক্মিণী, কেকয়ী প্রভৃতি ১১ জন অঙ্গনার দুষ্মন্ত, সোম, দ্বারকানাথ, দশরথ প্রভৃতি নিজ নিজ প্রিয়তমগণের নিকট লিখিত ১১ খানি পত্রিকা লইয়া এই কাব্য বিরচিত। এই খানির রচনা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ প্রাঞ্জল;—কবিত্ব ইহাতেও যে, প্রচুর পরিমাণে আছে, তাহা বলা বাহুল্য। তিলোত্তমা ও মেঘনাদের ছন্দে যতিভঙ্গের যে সকল দোষ আছে, ইহাতে তাহাও অপেক্ষাকৃত কম। সে যাহাহউক, এস্থলে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, বৃহস্পতিপত্নী তারা, বৃহস্পতিশিষ্য সোমের প্রতি অনুরক্তা হইয়া এক পত্র লিখিয়াছে; গুরুপত্নীগমন আমাদের শাস্ত্রানুসারে মহাপাতকের মধ্যে গণ্য;—শিষ্যের সহিত গুরুপত্নীর মাতৃত্বসম্বন্ধ—যে সেই সম্বন্ধ লঙ্ঘনপূর্ব্বক পুত্রসম শিষ্যের প্রতি পাপানুরাগে মত্ত হইয়া তাদৃশ নির্লজ্জভাবে পত্র লিখিতে পারিয়াছে, কবি সেই কামোন্মত্তা পাপীয়সীকে কোন্ মুখে 'বীরাঙ্গণা' বলিয়া ডাকিলেন? এবং কোন্ লজ্জায় পতিব্রতাপতাকা শকুন্তলা ও রুক্মিণীর সহিত একাসনে উপবেশন করাইলেন?—ছিছি! লজ্জার কথা!!

ব্রজাঙ্গনা কাব্যের এক সর্গমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা কৃষ্ণবিরহাতুরা রাধিকার বিলাপস্বরূপ কয়েকটী গীত। রচনা বেশ কোমল ও মধুর বোধ হইল। মাইকেলীক্রিয়ার ভাগ ইহাতে অতি অল্পই আছে। কবি ইহাতে কৃত্তিবাস কবিকঙ্কণাদির ন্যায় নিজের কবিত্বপ্রখ্যাপিকা ভণিতিও দিয়াছেন যথা——

মধু—যার মধুধ্বনি—কহে কেন কাঁদ, ধনি,
ভুলিতে পারে কি তোমা শ্রীমধুসূদন?॥

চতুর্দ্দশপদী কবিতালী—কবি যৎকালে ইউরোপে গমন করিয়া ফরাসীস্ দেশস্থ ভরসেল্‌স্ নগরে অবস্থান করেন, তৎকালে এই কাব্য রচিত হয়। কবির স্বহস্তলিখিত ইহার উপক্রমভাগ লিথোগ্রাফে মুদ্রিত

হইয়াছে—তদ্দ্বারা তাঁহার হস্তলিপিদর্শনেচ্ছুগণ পরিতৃপ্ত হইবেন। মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভয়বিধ ছন্দের চতুর্দ্দশ পঙ্‌ক্তিতে একশতটী পৃথক্ পৃথক্ বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। মাইকেলের যে সকল প্রধান গুণ ও প্রধান দোষ আছে, সমুদয়ই ইহাতে সমভাবে লক্ষিত হইল। আমরা নিম্নভাগে উহার প্রথম প্রবন্ধটী উদ্ধৃত করিলাম——

হে বঙ্গ। ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা সবে, (অবোধ আমি !) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি]
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি ;—
কেলিনু শৈবলে, ভুলি কমল-কানন !
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে ;—
"ওরে বাছা, গৃহে তব রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি অজ্ঞান তুই ! যারে ফিরি ঘরে !"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃভাষারূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে ॥

হেক্টরবধ,—এখানি মাইকেলের গদ্য কাব্য। তিনি বিখ্যাতনামা হোমরের রচিত ইলিয়াড্‌নামক কাব্য গ্রীক্ ভাষায় পাঠ করিয়া তাহারই উপাখ্যান বাঙ্গালায় লিখিয়াছেন। ইহাতে কবিত্ব প্রভৃতি যাহা কিছু সার পদার্থ আছে, তাহার অধিকাংশই, বোধহয়, মূলকবির—অতএব তদ্বিষয়ে কোন কথাই বক্তব্য নাই—তবে সেই সকল কবিত্বাদি মাইকেল কিরূপ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই এস্থলে বিচার্য্য। আমরা সেই বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া অতীব দুঃখসহকারে কহিতেছি যে, তিনি এই পুস্তকখানির রচনাবিষয়ে কিছুমাত্র কৃতকার্য্যহইতে

পারেননাই। মাইকেল নাটক ও পদ্য রচনাকরিয়া যে কিছু খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, সেই তাঁহার ভাল ছিল। তিনি আবার গদ্যকাব্যরচনায় হস্তক্ষেপ করিতে গেলেন কেন? এই কাব্যরচনায় না আছে চাতুর্য্য, না আছে লালিত্য, না আছে পাণ্ডিত্য। এই রচনায় ব্যাকরণকে পদদলিত করাই যেন রচয়িতার অভীষ্ট ছিল বোধহয়—নচেৎ রিপুন্দম, সিঞ্চন, বিপদার্ণব, মহামহা অক্ষৌহিণী, ব্যক্ততাব্যক্তার্থে, মনান্তর, তুষ্ণীভাবে, হে দেবকুলেন্দ্রদুহিতে! পতিবিরহকাতরা কলত্রবৃন্দ, ইত্যাদি ভূরি ভূরি ভয়ঙ্কর ব্যাকরণদোষ কি জন্য পদে পদে থাকিবে? একজন সংস্কৃতজ্ঞ লোক দ্বারা শোধন করিয়া লইলেই চলিতে পারিত। রণযূথ, মরামর, শুনকদ্বয় প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের অর্থ কোষকারদিগেরও অগম্য। কোন কোন বাক্যের অন্বয় ও অর্থবোধই হয়না। 'পিতলপদ, কুঞ্চিত-কাঞ্চন-কেশর-মণ্ডিত আশুগতি অশ্বসমূহে' ইত্যাদি বাক্য পাঠকরিলে 'শবপোড়ান' 'মড়াদাহ' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ হাস্যাস্পদ বাক্যের কথা মনে আইসে। ৩য় পত্রস্থ 'আমাদের দুষ্মন্তপুত্র পুরুর ন্যায় ইনিও" ইত্যাদি বাক্য পাঠকরিয়া রচয়িতার মহাভারতাভিজ্ঞতাদর্শনে পাঠকেরা অবাক্ হইয়াথাকেন! নির্ম্মিতেছ, প্রদানিবে, উত্তরিলেন——ইত্যাদি তাঁহার প্রিয় ক্রিয়াপদ সকল পদ্যমধ্যে যদিও কথঞ্চিৎ সহ্য হইয়াছিল, গদ্যেও তাহা কে সহ্য করিবে?

যাহাহউক এই সামান্য অকিঞ্চিৎকর পুস্তকের সমালোচনায় আর অনর্থক সময়ক্ষেপকরা কর্ত্তব্য নহে, আর একটী কথা বলিয়াই নিবৃত্ত হইব। মাইকেলসাহেব এই পুস্তকখানি শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন এবং সেই উৎসর্গপত্রিকামধ্যে লিখিয়াছেন "মহাকাব্যরচয়িতাকুলের মধ্যে ইলিয়াস্ রচয়িতা কবি যে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ, ইহা সকলেই জানেন। আমাদিগের রামায়ণ ও মহাভারত রামচন্দ্রের ও পঞ্চপাণ্ডবের জীবনচরিতমাত্র। তবে কুমারসম্ভব, শিশুপালবধ, কিরাতার্জ্জুনীয়, ও নৈষধ ইত্যাদি কাব্য উক্তপা-

খণ্ডের অলঙ্কারশাস্ত্রগুরু অরিস্তাতালীসের মতে মহাকাব্য বটে, কিন্তু ঈলিয়াসের নিকট এ সকল কাব্য কোথায়”—কিন্তু আমরা গ্রিফিথ্, ট্যালবয়হুইলার, ওয়েষ্ট মিনিষ্টর রিবিউ-লেখক প্রভৃতি অনেক বিলাতী সাহেবের নিকট ঈলিয়াড ও রামায়ণ মহাভারতাদির যশ তুল্যরূপে শুনিয়াছি—কোন সাহেবের মুখে ঈলিয়াডের নিকট রামায়ণমহাভারতাদি কোথায় লাগে? এরূপ কথা শুনি নাই। যিনি তাদৃশ নূতন কথা শুনাইতে পারিয়াছেন, তিনি রামায়ণ ও মহাভারতকে রাম ও যুধিষ্ঠিরাদির জীবনচরিতমাত্রও না বলিয়া “একঠো রেণ্ডীকা ওয়াস্তে কেজিয়া, আউর, থোড়া জমীন্‌কা ওয়াস্তে কেজিয়া” এই কথা যে, বলেন নাই, সেই আমাদের পরম ভাগ্য!।

শ্রীযুক্তভূদেবমুখোপাধ্যায়কৃত সফলস্বপ্নাদি।

শ্রীযুক্তভূদেবমুখোপাধ্যায় ১৭৪৭ শকের ২রা ফাল্গুনে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ৺বিশ্বনাথতর্কভূষণমহাশয় একজন গণনীয় অধ্যাপক ছিলেন। তিনি থানাকুল কৃষ্ণনগরপ্রদেশ হইতে পৈতৃকধাম উঠাইয়া কলিকাতার মাণিকতলাতে বাটী করিয়াছিলেন। সুতরাং কলিকাতাই ভূদেবের জন্মভূমি। ভূদেব ৮ম বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে কলিকাতা সংস্কৃতকালেজে প্রবিষ্ট হন এবং ৩ বৎসর তথায় অবস্থানপূর্ব্বক মুগ্ধবোধব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। অনন্তর তিনি সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া ইঙ্গরেজী পড়িতে অভিলাষী হয়েন, এবং ২ বৎসর অন্যান্য স্কুলে থাকিয়া শেষ ৬ বৎসর হিন্দুকালেজে অধ্যয়ন করেন। এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি একজন অত্যুৎকৃষ্ট ছাত্রমধ্যে পরিগণিত ছিলেন—প্রতিবর্ষে পারিতোষিক ও যথাকালে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলেন।

ঐ সময়ে হিন্দুকালেজের ছাত্রদেয় বেতন ৫৲ টাকা ছিল। উচ্চ-

শিক্ষার জন্য মাসিক এই ব্যয়ও তৎকালে লোকে গুরুতর বোধ করিত —এই জন্য ধনিসন্তান ব্যতিরেকে সাধারণ গৃহস্থসন্তানেরা হিন্দুকালেজে প্রায় অধ্যয়নকরিতে পারিত না। তৎকালে তর্কভূষণ মহাশয়ের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তিনি যে, পুত্রকে হিন্দুকালেজে পড়াইতে পারেন, তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তিনি বড় বুদ্ধিমান্ ও দূরদর্শী ছিলেন। অতএব বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, ভালরূপে ইঙ্গরেজি না শিখিলে উন্নতির কোন উপায় নাই। এইজন্য তিনি সহস্র ক্লেশ পাইয়াও পুত্রের অধ্যয়নব্যয় যোগাইতে কাতর হয়েন নাই।

কালেজে অধ্যয়নকরিবার সময়ে ভূদেববাবু যেরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে কালেজের প্রিন্সিপাল, এডুকেশনকৌন্সিলের অধ্যক্ষ কেম্‌রেন্ সাহেব প্রভৃতি বড় বড় সাহেব তাঁহার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, সুতরাং তৎকালে তিনি বিষয়কর্ম্মের জন্য প্রার্থী হইলে অবশ্যই কোন উচ্চপদে নিযুক্ত হইতে পারিতেন, কিন্তু তখন্ তাঁহার সেদিকে প্রবৃত্তি ছিল না—তিনি মিশনরিদিগের ন্যায় নানা স্থানে বিদ্যালয়স্থাপন করিয়া দেশের সর্ব্বত্র বিদ্যাপ্রচার করিবেন, এই এক নূতন আমোদে মত্ত হইলেন এবং তদনুসারে কয়েকজন বান্ধবের সহিত শেয়াখালা, চন্দননগর, শ্রীপুর প্রভৃতি কয়েকস্থানে স্কুল-স্থাপন করিয়া স্বয়ং সেই সকল স্কুলের অধ্যাপকতাকার্য্যসম্পাদনপূর্ব্বক কয়েক বৎসর অতিবাহিতকরিলেন। কিন্তু যেরূপ অর্থ ও লোকবলে মিশনরীরা স্কুলস্থাপনাদিকার্য্যে কৃতকার্য্য হয়েন, এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের সে সকল কিছুই ছিল না। কেবল মন ছিল, কিন্তু সংসারে শুদ্ধ এক মনের বলেই সকলকার্য্য সাধিত হয় না। সুতরাং কয়েক বৎসর পরেই তাঁহাকে সে আমোদ ত্যাগ করিয়া জীবিকার জন্য উপায়ান্তরের চেষ্টা দেখিতে হইল এবং মাসিক ৫০ টাকা বেতনে কলিকাতা মাদ্রাসা কালেজের ইঙ্গরেজি ২য় শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইলেন। এস্থানে ভূদেববাবুকে অধিকদিন থাকিতে হয় নাই। দশ মাস পরেই সাহেবেরা

তাঁহাকে মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে হাবড়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড্ মাষ্টার করিয়াদিলেন।

ভূদেববাবুর দ্বারা হাবড়া স্কুলের অনেক উন্নতি হয়। তাঁহার সময়ে অনেকগুলি ছাত্র জুনিয়র স্কলার্সিপ পরীক্ষায় অত্যুৎকৃষ্টরূপে উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কালেজে গমন করে। সুতরাং সত্বরেই একজন অত্যুৎকৃষ্ট শিক্ষক বলিয়া তাঁহার যশঃ সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ হয়। ঐ সময়ে হজ্‌সন প্রাট্ সাহেব হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট এবং উক্ত স্কুলের সেক্রেটর ছিলেন। তিনি হাবড়া স্কুলের রীতি নীতি শিক্ষাপ্রণালী প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়া ভূদেববাবুর প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং ভূদেববাবুকে একজন বড় উপযুক্ত লোক বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যখন্ দক্ষিণবাঙ্গালার স্কুলইন্‌স্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হয়েন, তৎকালে ভূদেববাবুর নিকট কর্ত্তব্যবিষয়ে অনেক পরামর্শ গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই বাঙ্গালাভাষার প্রতি ভূদেববাবুর বিশেষ অনুরাগ ছিল, এক্ষণে সেই অনুরাগ প্রাট্‌সাহেবের প্রোৎসাহনায় উদ্দীপিত হইল, এবং তিনি বাঙ্গালাভাষায় 'শিক্ষাবিধায়ক' নামে এক পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিতকরিলেন। তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসও ঐ সময়ে লিখিত হয়। অতঃপর হুগলীতে একটী বাঙ্গালা নর্ম্মালবিদ্যালয় স্থাপন করার প্রয়োজন উপস্থিত হওয়ায় ভূদেববাবু মাসিক ৩০০ টাকা বেতনে ১৮৫৬ খৃঃ অব্দের ৬ই জুন তারিখে উক্ত বিদ্যালয়ের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টরূপে নিযুক্ত হইয়া আইসেন।

ভূদেববাবু একরূপ কাজ অধিকদিন ভাল বাসেন না—সর্ব্বদাই নূতন কার্য্যে ক্ষমতাপ্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করেন। হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের কার্য্যও তাঁহার পক্ষে নূতন হইল। এই কার্য্য পাইয়া কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত তিনি যে, কিরূপ যত্ন, কিরূপ পরিশ্রম ও কিরূপ অভিনিবেশের সহিত অধ্যাপনাদি সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা বলিবার নহে। তাঁহার সময়ে হুগলী নর্ম্মালস্কুলের যে অতিশয় উন্নতি হইয়া-

ছিল, তাহা বোধহয় অনেকে অবগত আছেন। এই সময়ে ছাত্রদিগের পাঠের নিমিত্ত বাঙ্গালাভাষায় অধিক পুস্তক ছিল না, ভূদেববাবু ঐ বিদ্যালয়ের কার্য্যসম্পাদনপ্রসঙ্গেই অনেকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক রচনা-করেন, তন্মধ্যে প্রাকৃতিকবিজ্ঞান ১ম ও ২য় খণ্ড, পুরাবৃত্তসার, ইঙ্গলণ্ডের ইতিহাস, রোমের ইতিহাস ও ইউক্লিডের ৩ অধ্যায় জ্যামিতি মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসও ঐ সময়ে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল।

হুগলী নর্ম্মালের কার্য্যসম্পাদনাবসরে ভূদেববাবু কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন যে, ১৮৬২ খৃঃ অব্দের জুন মাসে যখন্ মেড্‌লিকট্ সাহেব প্রতিনিধি স্কুল ইন্‌স্পেক্টর হয়েন, তখন্ কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ভূদেববাবুকে ৪০০৲ টাকা বেতনে তাঁহার সহকারিরূপে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। মেড্‌লিকটের ন্যায় উদারপ্রকৃতি সাহেব অতি কম দেখিতে পাওয়াযায়। তিনি কয়েকমাস মাত্র ভূদেববাবুর সহিত কর্ম্ম করিয়া এরূপ প্রীত হইলেন যে, কিসে তাঁহাকে উন্নত করিয়া তুলিবেন, স্বতঃ পরতঃ তাহার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর গ্রাণ্ট সাহেব প্রজাসাধারণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য বার্ষিক ৩০৲ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত সে টাকা ব্যয়িত হয়নাই। এক্ষণে মেড্‌লিকট্ সাহেব ভূদেববাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া যথোচিতরূপে সেই টাকার বিনিয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কয়েকটী গুরুট্রেনিংস্কুল ও তদধীন গ্রাম্যপাঠশালা সমুদয় স্থাপিত করিলেন। ভূদেববাবুই উহার একপ্রকার সৃষ্টিকর্ত্তা; এজন্য ঐ নূতনপ্রণালী বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর ও যশোহর এই তিন জেলায় প্রচলিত করিবার নিমিত্ত ১৮৬৩ খৃঃ অব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ভূদেববাবুকেই, এডিসনল্ ইন্‌স্পেক্টর নামক নূতনপদের সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে নিযুক্ত করিলেন। একাজও ভূদেববাবুর নূতন কাজ হইল, অতএব ইহাতেও তিনি যারপর নাই পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করি-

লেন। তিনি অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের সন্তান, এই জন্যই বোধহয় অনেক বিষয়েই প্রাচীন প্রণালীর প্রতি বিশেষ ভক্তি-সম্পন্ন। সেই ভক্তি-বশতই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পাঠশালা সকলে অধিকাংশ প্রাচীন-প্রণালী অনুসারেই শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। যাহাহউক, কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এই প্রণালীর সফলতাসন্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং অপরাপর জেলাতেও ইহার বিস্তার আরম্ভ করিলেন। এই এডিসনাল ইন্‌স্পেক্ট-রের অবস্থাতেই ভূদেববাবু ১৮৬৪ খৃঃ অব্দের মে মাস হইতে ৶০ আনা মূল্যে শিক্ষাদর্পণ নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারকরিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঐ পত্রিকা কয়েক বৎসর উত্তমরূপে চলিতে-ছিল। উহা তাঁহার কনিষ্ঠপুত্রের নামে ছিল; শোক ও পরিতাপের বিষয় যে, ১৮৬৯ খৃঃ অব্দের মে মাসে তাঁহাকে ঐ পুত্রটীর সহিত পত্রিকাখানিকেও বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে!

ভূদেববাবু বিলক্ষণ সুবুদ্ধি, সুচতুর, দূরদর্শী ও উচ্চাশয়সম্পন্ন লোক। তাঁহার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলস্থিত এবং পঞ্জাবপ্রদেশীয় শিক্ষাপ্রণালীসম্বন্ধীয় ইঙ্গরেজী রিপোর্ট তাঁহার উৎকৃষ্ট ক্ষমতার স্পষ্ট উদাহরণ হইয়া আছে। তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঐ সকল প্রদেশীয় বিদ্যালয়পরিদর্শনে প্রেরিত হইয়া স্বল্পকালমধ্যে তত্রত্য শিক্ষাপ্রণালীর দোষ গুণ সমস্ত বুঝিয়া তন্ন তন্ন করিয়া তাহার যেরূপ বিচার করিয়াছেন এবং কাহারও প্রতি কোন দোষারোপ না করিয়াও যেরূপে আপন মত বজায় করিয়াছেন, তাহা দেখিলেই তাঁহার কার্য্যপ্রণালী কিরূপ, তাহা কতক বুঝিতে পারা যায়। যাহাহউক, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীনকার্য্যকুশলতাসন্দর্শনে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বড়ই প্রীত হইলেন এবং শিক্ষাসংক্রান্ত উচ্চ শ্রেণীর সাহেব কর্ম্মচারী-দিগের বার্ষিক বৃদ্ধিসহ উচ্চবেতনসম্বলিত যে শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে, ইহাঁকেও তাহার এক শ্রেণীতে নিবিষ্ট করিলেন। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাকে ঐ পুরস্কার প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন তাহা নহে। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাস হইতে নর্থ সেণ্টাল নামক নূতন ডিবিজনের ইন্‌-

রেজি বাঙ্গালা সমস্ত বিদ্যালয়ের ভারপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে ডিবিজনাল্ ইন্‌স্পেক্টর করিয়াদিলেন। ইহার কিয়দ্দিনপরে ক্রমে ক্রমে শিক্ষাবিভাগের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে তিনি অধিরূঢ় হয়েন।

হুগলীনর্ম্মালে অবস্থান সময়ে ভূদেববাবু চুঁচুড়ায় বাটী করিয়াছিলেন। অনেকদিন সেই বাটীতেই অবস্থানপূর্ব্বক বাঙ্গালার পশ্চিম বিভাগ ও বিহার প্রদেশের ইন্‌স্পেক্টরী কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। বিহারে স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ভাল ছিল না। তিনি ঐস্থানে ইন্‌স্পেক্টর থাকিবার সময়ে বাঙ্গালা ভাষার স্কুলপাঠ্য ভাল ভাল অনেক পুস্তক হিন্দিতে অনুবাদ করাইয়া ঐ বিষয়ে ঐ দেশের যেরূপ উপকার করিয়াছেন, তাহা কাহারও বিস্মৃত হইবার যোনাই। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দের ১লা ডিসেম্বর হইতে যে এডুকেশন গেজেট নামক সংবাদপত্র তাঁহার হস্তে আসিয়াছে, তাহাও ঐ স্থান হইতেই নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে ভূদেববাবু মহারাণীর নিকট হইতে C. I. E. (কম্পানিয়ন টু ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার) নামক সম্ভ্রমসূচক উপাধি প্রাপ্ত হয়েন এবং ১৮৮২ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর সাহেবের বিধিদায়িনী সভার (লেজিস্ লেটিব কৌন্সিলের) এক জন সভ্য (মেম্বর) নিযুক্ত হইয়াছিলেন ; তন্নিবন্ধন তাঁহার নামের পূর্ব্বে "অনরেবল" এই উপাধি যোজিত হইয়াছিল। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দের জুনমাসে তিনি পেন্সন লইয়াছেন। ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে "পুষ্পাঞ্জলি" এবং কিছু দিন পরে, "পারিবারিকপ্রবন্ধ" নামক পুস্তক প্রকাশিত করেন।

শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব—ভূদেববাবুর হস্ত হইতে যে যে পুস্তক প্রকাশিতহইয়াছে, যথাস্থলে সে সকলের নাম উল্লিখিত হইল। তন্মধ্যে শিক্ষাবিধায়ক তাঁহার প্রথম উদ্যমের ফল। অপর কেহই ইতিপূর্ব্বে ঐ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেননাই, সুতরাং ঐ পুস্তকই বাঙ্গালাভাষায় শিক্ষাপ্রণালীসংক্রান্ত প্রথম পুস্তক। উহাতে শিক্ষাসংক্রান্ত অনেক গুলি উৎকৃষ্ট উপদেশ আছে। তদনুসারে চলিলে, শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই অনেক

উপকার হইতে পারে, সত্য বটে, কিন্তু গ্রন্থকার শিক্ষকদিগকে একবারে ধনস্পৃহাশূন্য হইয়া কেবল প্রীতিবশতঃ শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করিবার যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, সংসারীব্যক্তির পক্ষে সেরূপ উপদেশানুসারে কার্য্যকরা বড় কঠিন। তিনি যৌবনাবস্থায় স্বয়ং ঐ প্রকার উদ্যম করিয়া স্থানে স্থানে বিদ্যালয়সংস্থাপন করিতে গিয়াছিলেন, সত্য—কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

ভূদেববাবুর দ্বিতীয় পুস্তকেব নাম ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইহা "সফলস্বপ্ন" ও "অঙ্গুরীয় বিনিময়" এই দুই ভাগে বিভক্ত। দুইটী ভিন্ন ভিন্ন উপাখ্যানে ঐ দুই ভাগ বিরচিতহইয়াছে। গল্পচ্ছলে প্রকৃত ইতি-বৃত্তের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উপদেশদিবার অভিপ্রায়েই এই গ্রন্থ লিখিত হয়। "রোমান্স অব্ হিষ্টরি" নামক ইঙ্গরেজিগ্রন্থই ইহার আদর্শ। সফলস্বপ্নের উপাখ্যানটী ঐ পুস্তক হইতেই সঙ্গৃহীত। ঐ উপাখ্যান অতি ক্ষুদ্র, তাহাতেও চাতুর্য্য বা কৌশল তাদৃশ কিছুই নাই। গজনন্ নগরা-ধিপতি সবক্তাজীন্ প্রথমে দাস ছিলেন, এই প্রকৃত ইতিবৃত্তাংশটী একটী ক্ষুদ্র উপাখ্যানের সহিত পাওয়াযায়। ফলতঃ এই ভাগের উপর আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই।

অঙ্গুরীয় বিনিময়েরও কিয়দংশ উক্ত রোমান্স অব্ হিষ্টরি নামক পুস্তক হইতে সঙ্গৃহীতহইয়াছে, কিন্তু উহার অবশিষ্ট ভাগ গ্রন্থকারের স্বকপোলকল্পিত। গ্রন্থের স্থূলবিবরণ এই, মহারাষ্ট্রপতি শিবজী দিল্লির বাদসাহ আরঙ্গেবের কন্যা রোসিনারাকে পর্ব্বতপথ হইতে অপহরণ-করিয়া কিয়দ্দিবস নিজ দুর্গে স্থাপন করেন। তথায় শিবজীর গুণগ্রামে রোসিনারা বশীভূত হইলে উভয়ের প্রণয়সঞ্চার ও বিবাহের প্রস্তাব হয়। ইতিমধ্যে মোগল সেনাপতি ঐ দুর্গ অধিকার করিয়া রোসি-নারাকে পিতৃসদনে প্রেরণকরিলে রোসিনারা পিতার নিকট শিবজীর ভূয়সীপ্রশংসা করেন। বাদসাহ, কন্যার মুখে শত্রুর প্রশংসা শ্রবণে কুপিতহইয়া কারাবদ্ধ নিজপিতা সাজেহানের নিকটতাঁহাকে প্রেরণ-

করেন। এদিকে শিবজী পুনর্ব্বার নিজ দুর্গ অধিকার করিয়া মোগল-দিগের সহিত কয়েক বার যুদ্ধ করেন এবং যুদ্ধে জয়লাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া বাদসাহের হিন্দু সেনাপতি রাজা জয়সিংহের সহিত একাকী সাক্ষাৎ করেন। জয়সিংহ বাদসাহের সহিত তাঁহার সন্ধিবন্ধন করিয়া দিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহাকে বাদসাহের আর এক জন শত্রুর সহিত যুদ্ধকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন। সেই যুদ্ধের পর শিবজী দিল্লীগমন করিলে ধূর্ত্ত আরঙ্গেব তাঁহার সম্মান না করিয়া বরং কিঞ্চিৎ অপমান, এবং প্রকারান্তরে তাঁহাকে কারাবদ্ধ, করেন। শিবজী কৌশলক্রমে তথাহইতে পলায়ন করিয়া যান। রোসিনারা বরাবর শিবজীর প্রতি সমান আসক্ত ছিলেন। শিবজী প্রস্থানের পূর্ব্বে রোসিনারাকেও সমভিব্যাহারে করিয়া লইয়া যাইবার সমুদয় উপায় করিয়া নিজ এক অঙ্গুরীয়ের সহিত এক বারবনিতাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রোসিনারা যদিও মনে মনে শিবজীকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তথাপি উক্ত বারবনিতার সহিত অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইয়া আসিবার সুযোগসত্ত্বেও; তিনি শিবজীর ভার্য্যা হইলে, স্বজাতীয়দিগের নিকট শিবজীর যেরূপ অপদস্থ হইবার সম্ভাবনা, তৎসমস্ত অনুধাবন করিয়া, আসিলেন না, কিন্তু শিবজীর অঙ্গুরীয়ের সহিত নিজ অঙ্গুরীয়বিনিময় করিয়া এক পত্রদ্বারা প্রাণপ্রিয়তমের নিকট মনের সমুদয় কথা লিখিয়া পাঠাইলেন।

এই উপন্যাসমধ্যে প্রকৃত ইতিবৃত্ত কতটুকু আছে, তাহা ইতিহাসবিদেরা বুঝিয়া লইবেন। যাহাহউক ভূদেববাবু এই উপন্যাসবর্ণনপ্রসঙ্গে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অস্ত্র শস্ত্র, সেনা, দিল্লীনগর, তত্রত্য রাজভবন, সাজেহানের দুরবস্থা ও তাঁহার নির্ম্মিত ময়ূরতক্ত নামক সিংহাসন প্রভৃতি অনেক ঐতিহাসিক পদার্থের যথাযথ বর্ণন করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন শিবজীর স্বদেশহিতৈষিতা, সাহসিকতা ও ধূর্ত্ততা, তাঁহার প্রতি রোসিনারার অকৃত্রিম অনুরাগ ও তাদৃশ অনুরাগসত্ত্বেও শিবজীর সহিত মিলিত না

হইয়া নিজের সাংসারিক সমুদয় সুখে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক অবস্থিতি, আরঙ্গেবের ধূর্ত্ততা, কুটিলতা, বিশ্বাসঘাতকতা, রামদাসস্বামীর স্বদেশহিতৈষিতা এবং শিষ্যবাৎসল্য প্রভৃতি বিষয়ের যে সকল চিত্র করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে; বিশেষতঃ জয়সিংহের সহিত শিবজীর সাক্ষাৎকার ও বক্তৃতা এবং আরঙ্গেবের সহিত তাঁহার সন্দর্শন ও কথোপকথন আরও বিস্ময়কর ও বহুল বিষয়ের উপদেশজনক হইয়াছে। বাদসাহের জন্মতিথির বিবরণ প্রভৃতি যে যে বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই ইতিহাসমূলক। শিবজী বর্ণজ্ঞানশূন্য ছিলেন বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে, ইহাতে কৌশলক্রমে তাহারও রক্ষাকরা হইয়াছে। ফলকথা অঙ্গুরীয়বিনিময়খানি এইরূপ প্রকৃতির পুস্তকমধ্যে উৎকৃষ্ট পুস্তক। পুস্তকের ভাষাটী আরও কিঞ্চিৎ প্রসাদগুণবিশিষ্ট, সরল ও মাধুর্য্যসম্পন্ন হইলে ইহা আরও অপূর্ব্ব পদার্থ হইয়া দাঁড়াইত।

ভূদেববাবু ইঙ্গরেজি নবেলের পদ্ধতিতেই যে, ইহার উপাখ্যান আরম্ভ করিয়াছেন, একথা বলা বাহুল্য। এস্থলে আর একটী কথার উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে—যৎকালে এই অঙ্গুরীয়বিনিময় রচিত হয়, তখন্ পদ্মিনীউপাখ্যান বল, কর্ম্মদেবী বল, দুর্গেশনন্দিনীই বা বল, ঐতিহাসিক-উপন্যাসনামক কোন গ্রন্থ বাঙ্গালায় রচিত হয় নাই; অতএব ঐ বিষয়ে যে, বাঙ্গালাগ্রন্থকারদিগের দৃষ্টি পড়িয়াছে ও প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, ভূদেববাবুই তাহার মূল। এক্ষণে ঐরূপ প্রকৃতির গ্রন্থরচয়িতারা যে, সকলেই সকল বিষয়ে ভূদেববাবুর অনুকরণ করিয়াছেন, একথা আমরা বলি না, কিন্তু সকলেই যে, ভূদেববাবু হইতেই উহার প্রথম স্বাদগ্রহ করিয়াছেন, একথা অবশ্য বলিব।

ভূদেববাবু পুরাবৃত্তসার, ইঙ্গলণ্ড ও রোমের ইতিহাস, ১ম ও ২য় ভাগ প্রাকৃতিকবিজ্ঞান ও ইউক্লিডের কিয়দংশ যে, রচনাকরিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা বিদ্যার্থীদিগের যথেষ্ট উপকার হইতেছে, একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু সে সকল পুস্তকের সমালোচনাকরা এ প্রস্তাবের

তত উদ্দেশ্য নহে। তবে এই একটী কথা বলা আবশ্যক যে, ইউক্লিড ভিন্ন তাঁহার বিরচিত কোন পুস্তক অপর গ্রন্থের ঠিক্ অনুবাদ নহে। তিনি গ্রন্থান্তর হইতে বস্তু সমাহরণপূর্ব্বক স্বয়ং রচনাকরিয়াছেন। তাঁহার ঐ সকল পুস্তকের বিষয়ে কোন কথা না বলা হইলেও তিনি এক্ষণে যে এডুকেশন গেজেটনামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সম্পাদকতা করিতেছেন, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা অবশ্যকর্ত্তব্য। ভূদেববাবুই প্রথমে হড্‌সন্‌প্রাট্ সাহেবকে এডুকেশন গেজেট পত্র প্রকাশ করিবার পরামর্শ দেন। যখন্ সেই পরামর্শ দেন, তখন্ সোমপ্রকাশ অথবা অন্য কোন তাদৃশ সংবাদপত্র বাঙ্গালায় জন্মে নাই। পরে প্রাট্ সাহেবের চেষ্টায় ১৮৫৬ খৃঃ অব্দের ৬ই জুলাই হইতে এডুকেশন গেজেটপত্র প্রকাশিত হয়। তখন্ উহার সম্পাদক ওব্রাইন্ স্মিথ নামক একজন পাদরী সাহেব ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে ঐ পত্রের জন্য প্রথমে মাসিক ৭৫৲ টাকা, পরে ১৫০৲ টাকা, অনন্তর ৩০০৲ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত হয়। কয়েক বৎসরপরে স্মিথ সাহেব স্বদেশ গমনোন্মুখ হইয়া বৃত্তিসহ ঐ পত্রের স্বত্ব গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। গবর্ণমেণ্ট বাবু প্যারীচরণ সরকারকে ঐ ৩০০৲ টাকা দিয়া উক্ত পত্রের সম্পাদক এবং মেনেজর নিযুক্ত করেন। ১৮৬৮ খৃঃঅব্দের ৭ই মে ইষ্টারন্ বেঙ্গল রেলগাড়ীতে শ্যামনগরে যে দুর্ঘটনা ঘটে, তৎসংক্রান্ত কয়েকটী প্রবন্ধ ঐ পত্রে প্রকাশিত হওয়ায় সম্পাদকের সহিত গবর্ণমেণ্টের মনোমালিন্য জন্মে, এবং তজ্জন্য প্যারীবাবু ঐ সম্পাদকতা ত্যাগকরেন। অনন্তর ডিরেক্টর এট্‌কিন্‌সন্ সাহেবের এবং ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর গ্রে সাহেবের একান্ত অনুরোধ উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া ভূদেববাবু ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বরমাস হইতে এডুকেশন গেজেট স্বহস্তে লইয়াছেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের ভৃতিভুক্ সম্পাদক হন নাই—নিজে ঐ পত্রের সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হইয়াছেন। এখন্ গবর্ণমেণ্ট উহার সাহায্যার্থ যাহা কিছু করিতেছেন, ইচ্ছাকরিলে তাহার অন্যথা করিতে পারেন, কিন্তু

কাগজের স্বত্ব আর প্রত্যাহরণ করিতে পারেননা। এক্ষণে উক্ত এডুকেশনগেজেট কিরূপ চলিতেছে? একথার উত্তরে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। সংবাদপত্রের ভদ্রাভদ্রতাবিচার গ্রাহকসঙ্খ্যার উপরে দৃষ্টিপাত করিলেই কতকদূর মীমাংসিত হইতে পারে। ভূদেববাবু যৎকালে ঐ পত্র প্রাপ্ত হয়েন, তখন্ উহার মূল্য-প্রদাতা গ্রাহক ২৮৯ ছিল, এক্ষণে (১৮৮৭ খৃঃ অব্দে) প্রায় ৮০০ হইয়াছে।

পুষ্পাঞ্জলি—স্বদেশানুরাগকে বেদব্যাসরূপে এবং জ্ঞানসঞ্চয়কে মার্কণ্ডেয়রূপে রূপিত করিয়া তাঁহাদিগের কথোপকথনচ্ছলে দেবীরূপে বর্ণিতা পৃথিবীর (ভারতবর্ষের) পৌরাণিক, আধুনিক, শাস্ত্রীয়, লৌকিক বিবিধ বিষয়ের বর্ণন করাই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। গ্রন্থকার তাহা করিবার সময়ে আপনার চিন্তাশীলতা, বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিমত্তা, বহুবিষয়জ্ঞতা, স্বদেশহিতৈষিতা প্রভৃতি গুণের বিলক্ষণ প্রখ্যাপন করিয়াছেন। বিশিষ্টরূপ অভিনিবেশ সহকারে তাঁহার পুস্তক পাঠ করিলে ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় অশাস্ত্রীয় অনেক তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়, কিন্তু ঐ সকল তত্ত্ব এতই নিগূঢ় যে, অনেকেই তাহার মর্ম্মোদ্‌ভেদ করিতে পারেন না।

পারিবারিক প্রবন্ধ—এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়, নাম দ্বারাই প্রকাশিত হইতেছে। হিন্দুদিগের পরিবারসংক্রান্ত যত কিছু বিষয় আছে, তাহার অনেকগুলি—যথা বাল্যবিবাহ, দাম্পত্যপ্রণয়, উদ্বাহ সংস্কার, স্ত্রীশিক্ষা, গহনাগড়ান, গৃহিণীপনা, সতীধর্ম্ম, সৌভাগ্যগর্ব্ব, দম্পতীকলহ, চাকরপ্রতিপালন, পরিচ্ছন্নতা, কৃত্রিমস্বজনতা, কুটুম্বতা, জ্ঞাতিত্ব, অতিথিসেবা, পশ্বাদিপালন;—পিতামহ, পিতামাতা, পুত্রকন্যা, পুত্রবধূ, নিরপত্যতা, গৃহশূন্যতা, দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ, বহুবিবাহ, ধর্ম্মচর্য্যা, অপত্যপালন, সন্তানের শিক্ষা প্রভৃতি—এই পুস্তকে সবিস্তর বিবৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক পারিবারিক প্রবন্ধ সময়ে সময়ে এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়; সে সকলও সময়ে গ্রন্থবদ্ধ হইবে,

এরূপ সম্ভাবনা। ভূদেববাবু একজন বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্, বহুদর্শী ও প্রাচীন সম্পন্ন গৃহস্থ। তাঁহার এই দীর্ঘকালের ভূয়োদর্শন-সমুত্থ পারিবারিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত উক্তিসকল অনেকের পক্ষেই যে, সবিশেষ উপদেশপ্রদ হইবে, তাহা উল্লেখ করাই বাহুল্য। আমরা এ পুস্তকের গুণ দোষের বিষয়ে আর কিছু না বলিয়া এইমাত্র বলিব যে, কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই পারিবারিক প্রবন্ধখানি একবার আদ্যোপান্ত পাঠকরা কর্ত্তব্য—আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, পরিশ্রম বিফল হইবে না।

পদ্মিনীউপাখ্যান-কর্ম্মদেবী ও শূরসুন্দরী প্রভৃতি।

এই ৩ খানি পদ্যময় কাব্য খিদিরপুরে কৃতনিবাস রঙ্গলাল-বন্দ্যোপাধ্যায়কর্ত্তৃক প্রণীত। ইনি ১৭৪৮ শকে কাল্নার সন্নিহিত বাকুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺ রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রঙ্গলাল বাল্যাবস্থায় মিশনরিস্কুলে বাঙ্গালাভাষা শিক্ষাকরিয়া কিয়ৎকাল হুগলী কালেজে ইঙ্গরেজি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শারীরিক পীড়ানিবন্ধন বিদ্যালয়ে অধিকদূর শিক্ষা করিতেপারেননাই, কিন্তু বিদ্যালয় ত্যাগকরিয়া স্বয়ং অনুশীলনদ্বারা ইঙ্গরেজি কাব্যশাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। কৈশোরাবস্থা হইতেই বাঙ্গালাকবিতারচনায় ইহাঁর বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল, তজ্জন্য সর্ব্বদাই কবিতারচনা করিয়া প্রভাকরাদি সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতেন। বোধহয় প্রভাকরসম্পাদক কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহবাসে তাঁহার রচনাশক্তি অনেক মার্জ্জিত হইয়াছিল। যাহাহউক বাঙ্গালারচনাবিষয়ে নৈপুণ্য থাকায় তিনি অতি অল্প বয়সেই কয়েকখানি বাঙ্গালা পত্রিকার সম্পাদকতা ও সহকারিসম্পাদকতা করিয়া

প্রতিষ্ঠালাভ করেন। পরে ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে পূর্ব্বোল্লিখিত এডুকেশন-গেজেট প্রচারিত হইলে তৎসম্পাদক ওব্রাইন স্মিথ্ সাহেবের সহকারী হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত উক্ত পত্রের কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ঐ পত্রে তাঁহার গদ্য পদ্য উভয়বিধ রচনাই প্রকাশিত হইত। তাঁহার গদ্য সকলের প্রীতিপ্রদ না হউক—পদ্য অনেকেই আদরপূর্ব্বক পাঠ করিতেন। এই সময়েই অর্থাৎ ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে তাঁহাকর্ত্তৃক 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' রচিত হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরেই রাজপুরুষেরা তাঁহাকে প্রথমে ইন্‌কমট্যাক্সের আসেসরী ও পরে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী পদে নিযুক্ত করেন। তিনি অনেক দিন ঐ কার্য্যে ব্রতীছিলেন। গত ১৮৮৭ খৃঃঅব্দের ১৩ই মে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত গুরুতর কার্য্যভারসত্ত্বেও আবাল্যপরিচিত কবিতারচনাকে তিনি বিস্মৃতহন নাই—ঐ অবস্থাতেও ১৮৬২ খৃঃ অব্দে কর্ম্মদেবী ও ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে শূরসুন্দরী নামক কাব্যের প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ ৩ খানি কাব্য ভিন্ন "বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ" ও "শরীরসাধনী-বিদ্যার গুণোৎকীর্ত্তন" নামে আরও ২ খানি পদ্যগ্রন্থ তাঁহার রচিত আছে। তিনি সংস্কৃত কুমারসম্ভব কাব্যেরও পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

পদ্মিনী উপাখ্যান—দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীন রাজপুতানান্তর্গত চিতোরের অধিপতি ভীমসিংহের মহিষী অপরূপরূপা পদ্মিনীর রূপ গুণের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অপহরণ করিবার মানসে সসৈন্যে চিতোর আক্রমণকরেন; এই উপলক্ষে কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া রাজপুত ও পাঠানদিগের ঘোরতর সংগ্রাম হইলে পর অবশেষে পাঠানদিগের জয় ও চিতোরনগরের ধ্বংস হয়, পদ্মিনী ধর্ম্মলোপভয়ে অগ্নিপ্রবেশ করেন এবং ভীমসিংহও রণশায়ী হয়েন—এই উপাখ্যান অবলম্বনকরিয়া এই কাব্য বিরচিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে যেমন কতক বাস্তব ও কতক অবাস্তব ঘটনার বর্ণন থাকে, ইহাতেও

তাহাই আছে। কবি, স্থানে স্থানে ইঙ্গরেজী কাব্যগ্রন্থ হইতে অনেক ভাবসঙ্কলন করিয়াছেন, ইহা বিজ্ঞাপনের মধ্যে স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং তদুল্লেখে আমাদের আর প্রয়োজন নাই। যাহাহউক তিনি যে, বর্ত্তমানকালিক কৃতবিদ্যদিগের রুচির অনুরূপ বিশুদ্ধপ্রণালীতে কাব্যরচনার মানস করিয়াছিলেন, তাঁহার সে মানস সফল হইয়াছে। পদ্মিনী উপাখ্যান বীর ও করুণরস-প্রধানক গ্রন্থ; ইহাতে নায়ক নায়িকার অন্যোন্যানুরাগসূচক অনেক কথোপকথন বর্ণিত আছে, কিন্তু কোথাও নিরবগুণ্ঠন আদিরস অবতারিত হয়নাই। পদ্মিনীর রূপ, তাঁহার দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব বাদসাহকে প্রদর্শন, ভীমসিংহের বন্ধন, ছলপ্রয়োগপূর্ব্বক পদ্মিনীকর্ত্তৃক তাঁহার উদ্ধারসাধন, সেনাগণের যুদ্ধ, ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি সমরকরণার্থ ভীমসিংহের উৎসাহবাক্য, পদ্মিনীর অগ্নিপ্রবেশ, রাজপুত নর নারীগণের তেজস্বিভাব, কালমাহাত্ম্য প্রভৃতি সমুদয়গুলিই উৎকৃষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণিতবিষয়ের অনেক স্থানেই সুকবির হস্তচিহ্ন স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারাযায়। ফলতঃ পদ্মিনী উপাখ্যান বিশুদ্ধপ্রণালীতে রচিত একখানি উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার পূর্ব্বে এরূপ পদ্যকাব্য বোধহয় আর কেহই রচনাকরেননাই।

এই গ্রন্থে চলিতছন্দঃ পয়ার ও ত্রিপদী ভিন্ন ভঙ্গত্রিপদী, একাবলী, মালঝাঁপ, ভুজঙ্গপ্রয়াত ও আরও কয়েকটী নূতনবিধ ছন্দঃ প্রযুক্ত হইয়াছে। ২।৪টী স্থল ভিন্ন ছন্দের যতিভঙ্গ কুত্রাপি হয়নাই। মিত্রাক্ষরতার বিশুদ্ধ নিয়ম প্রায় সর্ব্বত্রই রক্ষিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থসংক্রান্ত কয়েকটী বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে; তাহা পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে—স্নানার্থ আগত ব্রাহ্মণের মুখে অত বড় প্রকাণ্ড উপাখ্যান তখনই শ্রবণকরিতে বসা পথিকের পক্ষে উচিত হয়নাই; ব্রাহ্মণের স্নানাহারের পর গল্প আরম্ভ করিলে ভাল হইত। কবি ঐ ব্রাহ্মণের মুখেই সমুদয় উপাখ্যান বর্ণনকরিয়াছেন সত্য, কিন্তু

মধ্যে মধ্যে অসামাজিক লোকের ন্যায় বক্তার মুখ বন্ধকরিয়া নিজেও দু কথা বলিয়া লইয়াছেন—যথা—

"সরোরুহে হেরিলে খঞ্জন,—অধিপতি হয় সেই জন।
নৃপ হয়ে দেখে যেই, কি লাভকরিবে সেই, ভেবে দেখ হে ভাবুকগণ!"॥
"একি বিপরীত ভাব জলে অগ্নি জ্বলে।
কবি কহে বিজলী চমকে মেঘ দলে॥" ইত্যাদি

এগুলি আমাদিগের ভাল লাগে না। গ্রন্থোল্লিখিত পাত্রের উক্তির মধ্যে কবির নিজের উক্তি থাকিলে বর্ণনার বৈচিত্র্যভঙ্গ হয়। ভারতচন্দ্র প্রভৃতি প্রধান কবিরাও মধ্যে মধ্যে সেরূপ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেগুলি এক এক সন্দর্ভের শেষে থাকায় তত দোষাবহ হয়নাই; উপরি উদ্ধৃত শ্লোকগুলি সন্দর্ভের মধ্যভাগেই প্রদত্ত হইয়াছে।—আলাউদ্দীন পদ্মিনীর জন্য উন্মত্তবৎ হইয়াছিলেন, কিন্তু চিতোরের দুর্গে প্রবেশকরিয়া অন্বেষণ করিয়াও যখন্ পদ্মিনীকে দেখিতে না পাইলেন, তখন্ পদ্মিনী কোথায় গেল? তাহার অনুসন্ধান করিলেননা!—পদ্মিনীর জন্য খেদ করিলেন না—পদ্মিনী প্রাপ্ত না হওয়ায় এত ধন, এত সৈন্য ও এত সময়ের ধ্বংস যে অনর্থক হইল, তাহা ভাবিয়া নির্ব্বিঘ্নমনে একবারও আক্ষেপ করিলেন না!—করিলে ভাল হইত। ঐ সমুদয় ভিন্ন কোন কোন স্থলের দুর্ব্বোধতা, কতকগুলি শব্দের অবাচকতা ও স্থলবিশেষে ব্যাকরণাশুদ্ধিপ্রভৃতি আরও কতকগুলি দোষ এ গ্রন্থে আছে, তাহা সামান্যবোধে উপেক্ষিত হইল। ফলকথা আমরা একবার বলিয়াছি, আবার বলিতেছি যে, ঐ সকল দোষসত্বেও পদ্মিনীউপাখ্যান একখানি মনোরম গ্রন্থ হইয়াছে। পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ নিম্নভাগে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল, তৎপাঠেই গ্রন্থকারের কবিত্ব অনেক অংশে বোঝা যাইবে।

ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহ বাক্য।

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,—কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্বশৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,—কে পরিবে পায়?

কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,—নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ সুখ তায় হে,—স্বর্গ সুখ তায়।
এ কথা যখন্ হয় মানসে উদয় হে,—মানসে উদয়।
পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয়তনয় হে,—ক্ষত্রিয় তনয়।
তখনি জ্বলিয়া উঠে হৃদয়নিলয় হে,—হৃদয়নিলয়।
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে,—বিলম্ব কি সয়?
অই শুন! অই শুন! ভেরীর আওয়াজ্ হে,—ভেরীর আওয়াজ্।
সাজ্ সাজ্ সাজ্ বলে সাজ্ সাজ্ সাজ্ হে,—সাজ্ সাজ্ সাজ্" ॥ ইত্যাদি

অগ্নিপ্রবেশকালে সহচরীদিগেরপ্রতি পদ্মিনীর।
উৎসাহ বাক্য।

"এসো এসো সহচরীগণ!—এসো সহচরীগণ! হুতাশনগ্রাসে করি জীবন অর্পণ ॥
ধর সবে মনোহর বেশ,—বাঁধ বিনাইয়ে কেশ; চলহ অমরাবতী করিব প্রবেশ ॥
ওরে সখি! আজ্‌রে সুদিন,—ঘটিয়াছে ভাগ্যাধীন; শুধিব জীবনদানে পতিপ্রেম ঋণ ॥
আজ অতি সুখের দিবস,— পাব সুখ মোক্ষ যশ; বিবাহের দিন নহে এরূপ সরস ॥
পরিণয় প্রমোদ উৎসবে,—ভেবে দেখ দেখি সবে; পতি যে পদার্থ কিবা কে জানিতে তবে?
সবে তবে ছিলেলো বালিকা,—যথা মুদিতা মালিকা।
অলি যে আনন্দদাতা জানে কি কলিকা?
সকলেতে জেনেছ এখন,—পতি অতি প্রাণধন;
যার জন্যে যুবতীর জীবন যৌবন ॥
হেন ধন নিধন অন্তরে,—এই ছার কলেবরে;
রাখিবে এ ছার প্রাণ আর কার তরে?
বিশেষতঃ যবনের ঠাঁই—কোনরূপে রক্ষা নাই;
ভাবিলে ভাবীর দশা মনে ভয় পাই ॥
সতীত্ব সকল ধর্ম্মসার,—যার পর নাহি আর;
যুগে যুগে ক্ষত্রিয়ের এই ব্যবহার ॥
অতএব এস লো সকলে,—গিয়ে প্রবেশি অনলে।
যথা পতি তথা গতি লোকে যেন বলে" ॥ ইত্যাদি

উপসংহারে।

"করাল কালের কাণ্ড, যেন সদাক্রীড়াভাণ্ড, এ ব্রহ্মাণ্ড আয়ত্ত তাহার।
কি মহৎ কিবা ক্ষুদ্র, কি ব্রাহ্মণ কিবা শূদ্র, তার কাছে সব একাকার॥
সিংহাসন অধিষ্ঠাতা, শিরোপরে হেমছাতা, ধাতা প্রায় প্রতাপ যাঁহার।
তাঁহার যেরূপ গতি, অন্নদাস ছন্নমতি, মরণেতে তারো সে প্রকার॥"
"কালের নাহিক বোধ, নাহি মানে উপরোধ, বড়সুখে বড়রূপে বাদী।
সুখপুষ্প যথা ফুটে, অতিবেগে তথা ছুটে, কট মট বিকট নিনাদি॥
কিবা চারুরূপধর, কিবা বহুধনেশ্বর, কিবা যুবা নানাগুণধর।
কালের সুভোগ্য সব, হয় তার মহোৎসব, পেলে হেন খাদ্যপরিকর॥"
"হাঁরেরে নিষাদ কাল! একি তোর কর্ম্মজাল, শোভা নারাখিবি ভববনে।
যথা কিছু দেখ ভাল, না ঠাহর ক্ষণকাল, জালে বদ্ধ কর সেইক্ষণে॥
ওরে ও কৃষককাল, কি কর্যিছে তব হাল? জঞ্জাল জঙ্গল বৃদ্ধি পায়।
উত্তম বাছের বাছ, ফলপ্রদ যেই গাছ, অনায়াসে উপাড়িয়ে যায়॥
সুকৃষক যেই হয়, পরিপক্ক শস্যচয়, সে করে ছেদন সুসময়।
তুই কাল নিদারুণ, নাস্তি জ্ঞান গুণাগুণ, কাটিছ তরুণ শস্যচয়॥
ধিক্ কাল কালামুখ! ভারতের কোন সুখ, না রাখিলি ভুবনভিতর।
কোথা সব ধনুর্দ্ধর, কোথা সব বীরবর, সব খেয়ে ভরিলি উদর!॥"

কর্ম্মদেবী ও শূরসুন্দরী—ঔরিণ্টপতির দুহিতা কর্ম্মদেবী যশল্মীরাধিপতির পুত্র সাধুর শৌর্য্য, বীর্য্য ও রূপে বিমোহিত হইয়া রাঠোররাজপুত্র অরণ্যকমলের সহিত পিতৃকৃত সম্বন্ধ ভঙ্গকরিয়া তাঁহাকে বরমাল্য প্রদান করেন, এই সূত্রে সংগ্রাম উপস্থিত হইলে অরণ্যকমলের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে সাধু হত হয়েন; কর্ম্মদেবী পতির মৃত্যুর পর স্বহস্তে আপনার একবাহু ছেদনকরিয়া পিতৃকুলকবির নিকট পাঠাইয়া দেন, এবং অপরবাহু নিজ শ্বশুরকে দেখাইবার জন্য ছিন্ন করিতে ভ্রাতাকে অনুরোধ করেন। যেখানে এইকাণ্ড সজ্ঘটিত হয়, তথায় 'কর্ম্মসরোবর' নামে এক সরোবর নিখাত হইয়াছে—এই উপাখ্যান অবলম্বনকরিয়া কর্ম্মদেবী রচিত হইয়াছে। শূরসুন্দরীর মূল মর্ম্ম এই—দিল্লীশ্বর আক্বর

সাহ, নিজশ্যালক মানসিংহের অপমানকারী উদয়পুরের রাণার উপর কুপিত হইয়া যুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করেন, এবং তাঁহার কুলে কলঙ্কদিবার মানসে দিল্লীর অন্তঃপুরে রমণীদিগের নৌরোজানামক সকের বাজার স্থাপনপূর্ব্বক তথায় উক্ত রাণার ভ্রাতৃকন্যা পৃথ্বীরায়পত্নীকে কৌশলে আনয়নকরিয়া তাঁহার সতীধর্ম্মনাশের চেষ্টা করেন। শূরসুন্দরী আক্রমণসময়ে তরবারিদ্বারা বাদশাহকে বিনাশকরিতে উদ্যত হওয়ায় তিনি ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া ‘ আর কথনও কোন রাজপুতমহিলাকে অন্তঃপুরে আনিবেন না” এতদ্বিষয়ে এক স্বীকৃতিপত্র লিখিয়া দেন।

এই দুই পুস্তকেই রাজপূতরমণীদিগের সাহস, তেজস্বিতা, পতিভক্তি ও সতীধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। কর্ম্মদেবী ও শূরসুন্দরী উভয়ের চরিত্রই ওজস্বী, উদার ও অতি নির্ম্মলরূপে চিত্রিত হইয়াছে। সাধুর মৃত্যুর পর ভ্রাতার নিকট কর্ম্মদেবীর বক্তৃতা ও আক্রমণোদ্যত বাদসাহের বক্ষে পদাঘাত করিয়া শূরসুন্দরীর তিরস্কারবাক্য যে, কিরূপ সুন্দর হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ পাঠকরিয়া দেখিবেন। পদ্মিনীউপাখ্যানের ন্যায় এই দুইখানিও বিশুদ্ধ কাব্য হইয়াছে; ইহাদের কোনস্থলেই অশ্লীলতার গন্ধ নাই। কবি প্রসঙ্গক্রমে রাজপূতজাতি ও দিল্লীর বাদসাহদিগের নানাবিষয়সংক্রান্ত যে সমস্ত বর্ণনাকরিয়াছেন, তৎপাঠে ঐতিহাসিক বহুল জ্ঞানলাভ হয়। তদ্ভিন্ন তিনি কাবুলী মেওয়া, আম্র, কাঁঠাল, আনারস প্রভৃতি দেশীয় ফল, ঢাকাই মস্‌লিন, কাশ্মীরীশাল প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যের চিত্তাকর্ষকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ফলতঃ কর্ম্মদেবী ও শূরসুন্দরী পদ্মিনীর ন্যায় পাঠকের তত মনোহরণ করিতে না পারুক, কিন্তু এ দুইখানিও যে, উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক কাব্য হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

স্নানার্থ আগত ব্রাহ্মণের মুখে পদ্মিনীর বৃহৎ উপাখ্যানশ্রবণের যে অযুক্ততা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি, কর্ম্মদেবীতে ব্রাহ্মণকে মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম দেওয়ায় সে দোষ পরিহৃত হইয়াছে; শূরসুন্দরীতে তাদৃশ

দোষের সঙ্ঘটনই হয় নাই। কিন্তু এই শেষ পুস্তকে বাদসাহ ও যোধাবাইকে অনর্থক কতকগুলা ছাই ভস্ম মাখান হইয়াছে। তাঁহাদিগকে যোগী ও যোগিনী সাজাইবার কোন প্রয়োজনই ছিলনা। তদ্ভিন্ন পদ্মিনীউপাখ্যানে আর আর যে সকল দোষগুণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, এ উভয়েও সে সকল বর্ত্তমান আছে; তন্মধ্যে ব্যাকরণদোষ পদ্মিনীউপাখ্যান অপেক্ষা এই দুই পুস্তকে কিছু অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইল। পুনঃসংস্করণে সে দোষগুলি সংশোধিত হইলে এ দুইখানি পুস্তক আরও মনোরম হইবে।

পদ্মিনীউপাখ্যানের ন্যায় ইহাতেও পয়ার ত্রিপদী ভিন্ন, তাহাদেরই রূপান্তরস্বরূপ নানাবিধ নূতন ছন্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে ভগবতীর স্তোত্রে সংস্কৃতানুকারক—

"নিশুম্ভ শুম্ভঘাতিনি! প্রচণ্ড চণ্ডপাতিনি!
প্রশান্ত দান্তপালিনি! প্রসীদ মুণ্ডমালিনি!"

এই প্রমাণিকাচ্ছন্দটী উপযুক্ত স্থলে অর্পিত হওয়ায় বড় মধুর হইয়াছে।

পতিব্রতোপাখ্যান—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব—নবনাটক। রুক্মিণীহরণ প্রভৃতি।

কলিকাতার দক্ষিণ হরিনাভি গ্রামনিবাসী ৺রামধন শিরোমণি মহাশয়ের পুত্র ৺রামনারায়ণতর্করত্ন উপরি উল্লিখিত গ্রন্থগুলির প্রণয়নকর্ত্তা। ১৭৪৫ শকে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি প্রথমে চতুষ্পাঠীতে কিয়ৎকাল সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিয়া পরিশেষে কলিকাতা সংস্কৃতকালেজে প্রবিষ্ট হন, এবং তথায় পাঠ সমাপন করিবার দুই বৎসর পরে ঐ বিদ্যালয়েরই অন্যতম শিক্ষকতাপদ লাভকরেন। অনেকদিন পর্য্যন্ত

তিনি ঐ কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। পরে যথাসময়ে পেন্সন লইয়া ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে পরলোকগমন করিয়াছেন।

তর্করত্ন পঠদ্দশাতেই ১৮৫২ খৃঃ অব্দে পতিব্রতোপাখ্যান এবং কালেজ-ত্যাগ করিবার এক বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে কুলীনকুল-সর্ব্বস্বের রচনা করেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে রত্নাবলী, বেণীসংহার, শকুন্তলা, নবনাটক, মালতীমাধব ও রুক্মিণীহরণ নামক ৬ খানি নাটক প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম দুইখানি পারিতোষিকগ্রন্থ—অর্থাৎ রঙ্গপুরের ভূম্যধিকারী ৺কালীচন্দ্ররায় চৌধুরী মহাশয় পতিব্রতো-পাখ্যান নামক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচয়িতাকে এবং কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নামক উৎকৃষ্ট নাটক রচয়িতাকে ৫০ টাকা করিয়া পারিতোষিক দিবেন, সংবাদপত্রে এইরূপ দুইটী বিজ্ঞাপন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দিয়াছিলেন। তদনুসারে তর্করত্ন ঐ দুই প্রবন্ধ লেখেন এবং উহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়ায় নির্দ্ধারিত পারিতোষিক লাভ করেন। ঐ দুই পুস্তক এবং নবনাটক এই ৩ খানি তর্করত্নের স্বকপোলকল্পিত বস্তুদ্বারা গ্রথিত;—রুক্মিণী-হরণের উপাখ্যানটী মাত্র পুরাণ হইতে সঙ্কলিত, কিন্তু নাটক নিজের রচিত; তদ্ভিন্ন অপরনাটকগুলি সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত। এতদ্ভিন্ন তিনি আরও ২।১খানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এপর্য্যন্ত মুদ্রিত হয়নাই।

পতিব্রতোপাখ্যানে পতিব্রতা রমণীদিগের স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যবিষয়ে নানাবিধ উপদেশ, উদ্ধৃত পুরাণাদির বচনদ্বারা সে সকলের সমর্থন এবং সতী ও অসতীদিগের অনেকরূপ উপাখ্যানাদি আছে। এরূপ গ্রন্থের সমালোচনা করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে।

তর্করত্নের অপর পারিতোষিক গ্রন্থ—কুলীনকুলসর্ব্বস্বনাটক। গ্রন্থ-কার নিজেই বিজ্ঞাপনমধ্যে ইহার প্রকৃত পরিচয় দিয়াছেন। যথা "এই নাটক ছয়ভাগে বিভক্ত। প্রথমে কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাগণের বিবাহানুষ্ঠান; ২য়ে ঘটকের কপট ব্যবহারসূচক রহস্যজনক

নানাপ্রস্তাব; ৩য়ে কুলকামিনীগণের আচার ব্যবহার; ৪র্থে শুক্রবিক্রয়ীর দোষোদ্ঘোষণ; ৫মে নানারহস্য ও বিরহিপঞ্চাননের বিয়োগপরিদেবন; ৬ষ্ঠে বিবাহনির্ব্বাহ। এই রীতিক্রমে এই নাটক রচিত হইয়াছে। ইহা কেবল রহস্যজনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠকরিয়া তাৎপর্য্যগ্রহণ করিলে কৃত্রিম কৌলীন্যপ্রথায় বঙ্গদেশের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা সম্যক্ অবগত হওয়া যাইতে পারে"। —এ কথা সত্যই বটে; কুলীনকুলসর্ব্বস্ব অভিনিবিবিষ্টচিত্তে পাঠকরিলে বল্লালপ্রতিষ্ঠিত কৌলীন্যের বিষময় ফল সকল নয়নাগ্রে যেন নৃত্য করিতেথাকে। তর্করত্ন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ নহেন—বৈদিক; তাঁহার দ্বারা রাঢ়ীয় কুলপ্রথার এতদূর উদ্ঘাটন হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয়। ঐ সকল বিষয়ের বর্ণনাবসরেও তিনি সামান্য কবিত্ব ও সামান্য রসিকত্ব প্রদর্শন করেন নাই। অনৃতাচার্য্যের চরিত, রসিকা নাপ্তিনীর সহিত দেবলের রহস্য, কুলকুমারীর খেদ, মহাকুলীন অধর্ম্মরুচির সহিত তৎপুত্র উত্তমের কথোপকথন, গর্ভবতী হরির মার কন্যা হইবার জন্য পুরোহিতসমীপে স্বস্ত্যয়নকরণপ্রার্থনা, বৈদিকব্রাহ্মণের ফলার, অভব্য চন্দ্রের বিবরণ প্রভৃতি সকল স্থলগুলিই অতি উত্তম ও চিত্তাকর্ষকরূপে বর্ণিত হইয়াছে। স্ত্রীজাতি, বালক, বালিকা ও ভৃত্যের ভাষাগুলিও অনেক স্থলেই সুন্দররূপে অনুকৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার বড় পরিহাসরসিক;—সে পরিহাসরসিকতা সর্ব্বস্থলেই প্রচুরপরিমাণে বিস্তারিত করাহইয়াছে। বোধ হইতেছে, কুলীনকুলসর্ব্বস্বের পূর্ব্বে বাঙ্গালা কোন নাটক রচিত হয় নাই; ইহাই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালানাটক। তর্করত্ন সর্ব্বপ্রথমেই ওরূপ উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিতে পারিয়াছেন, এ বিষয়ে অনেকে সংশয় করেন—তাঁহারা কহেন, 'ঐ নাটক তর্করত্নের রচিত নহে, তদীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রসিদ্ধ কবি ৺প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত—তর্করত্নের নামদিয়া প্রকাশিত' ইত্যাদি—ইহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় যেরূপ অসামান্য কবি ছিলেন, তাহাতে তাঁহার

লেখনী হইতে ওরূপ পুস্তক নির্গত হওয়া বিচিত্র কথা নহে, কিন্তু উক্ত নাটকপ্রকাশের পর যদি তর্করত্ন একবারে তুষ্ণীভূত হইতেন—আর কোন রচনা না করিতেন, তাহা হইলে ঐ সন্দেহ সঙ্গত হইত। কিন্তু যখন্ দেখাযাইতেছে যে, বিদ্যাসাগরমহাশয়ের মৃত্যুর পরও তর্করত্ন ক্রমে ক্রমে ছয়খানি নাটক রচনাকরিলেন এবং 'নাটুকে রামনারায়ণ' বলিয়া—তাঁহার খ্যাতি হইল, তখন্ আর ওরূপ সন্দেহ করা কোন মতে যুক্তিসিদ্ধ নহে।

তর্করত্ন সংস্কৃতজ্ঞ লোক, সুতরাং সংস্কৃতনাটকের রীত্যনুসারে নান্দী ও প্রস্তাবনার পর নাটক আরম্ভকরিয়াছেন, কিন্তু সংস্কৃতে "কার্য্য-নির্ব্বহণেঽদ্ভুতম্" এই এক যে প্রধান নিয়ম আছে, তাহা রক্ষাকরিতে পারেননাই। ফলতঃ কুলীন-কুলসর্ব্বস্বের উপাখ্যানাংশে কিছু বৈচিত্র্য নাই। তর্করত্ন বড় শ্লেষোক্তিপ্রিয়; তাঁহার শ্লেষবচনসকল অনেক-স্থলেই প্রীতিপ্রদ হইয়াছে, কিন্তু কোন কোন স্থলে নিতান্ত অতিরিক্ত হওয়ায় বিরক্তিকরও হইয়াছে। তদ্ভিন্ন তিনি বাঙ্গালার মধ্যে মধ্যে যে সকল স্ব-রচিত সংস্কৃতশ্লোক বিন্যস্তকরিয়া তাহার বাঙ্গালা অর্থ করিয়া দিয়াছেন, সেস্থলে কেবল সেই বাঙ্গালাগুলি থাকিলেই সুসঙ্গত হইত। যাহাহউক, যখন্ কুলীনকুলসর্ব্বস্ব বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম নাটক, তখন্ উহার সহস্র গুরুতর দোষ থাকিলেও মার্জ্জনীয় হইত—আমাদের উল্লিখিত দোষ সকল ত সামান্য। আমরা নিজেও বামন জাতি, এই জন্য পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ কুলীন কুলসর্ব্বস্ব হইতে অপর কোন অংশ উদ্ধৃত না করিয়া উত্তম মধ্যম ও অধম তিন প্রকার ফলারের লক্ষণগুলিই নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম——

"ঘিয়ে ভাজা তপ্তলুচি, দু-চারি আদার কুচি, কচুরি তাহাতে খানদুই।
ছক্কা আর শাকভাজা, মতিচূর বঁদে খাজা, ফলারের জোগাড় বড়ই॥
নিখুতি জিলাপী গজা, ছানাবড়া বড় মজা, শুনে সক্ সক্ করে নোলা।
হরেক রকম মণ্ডা, যদি দেয় গণ্ডা গণ্ডা, যত খাই তত হয় তোলা॥

খুরি পুরি ক্ষীর তায়, চাহিলে অধিক পায়, কাতারি কাটিয়ে শুকো দই।
অনন্তর বামহাতে, দক্ষিণা পানের সাতে, উত্তম ফলার তাকে কই॥"
"সরুচিঁড়ে শুকোদই, মর্ত্তমান ফাকা খই, খাসা মণ্ডা পাতপোরা হয়।
মধ্যম ফলার তবে, বৈদিকব্রাহ্মণে কবে, দক্ষিণাটা ইহাতেও রয়॥"
"গুমো চিঁড়ে জলো দই, তিত গুড় ধেনো খই, পেটভরা যদি নাহি হয়।
রৌদ্দুরেতে মাথা ফাটে, হাতদিয়েপাত চাটে, অধম ফলার তাকে কয়॥"

নবনাটক—জোড়াসাঁকো নাট্যশালাকমিটীকর্ত্তৃক আদিষ্টহইয়া তর্করত্ন বহুবিবাহবিষয়ক এই নবনাটক প্রণয়নকরেন। গবেশবাবুনামক একজন জমীদার স্ত্রীপুত্রসত্ত্বেও অধিক বয়সে পুনর্ব্বার বিবাহ করেন, তাঁহার নবপ্রণয়িনীর উৎপীড়নে প্রথমাপত্নীর গর্ভজপুত্র দেশত্যাগীহন, বিষয়বিভব নষ্ট হয়, পূর্ব্বপত্নী যন্ত্রণা সহিতে না পারিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণ-ত্যাগকরেন এবং তিনি নিজেও নবপত্নীদত্ত বশীকরণ ঔষধসেবনের গুণে অপ্রতিবিধেয় রোগে আক্রান্ত হইয়া গতাসু হয়েন—এই সামান্য উপাখ্যান অবলম্বনকরিয়া এই নাটক রচিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে বহুবিবাহের দোষপ্রতিপাদক অপরাপরবিষয়ও ইহাতে বর্ণিত আছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রন্থকার পরিহাস ও শ্লেষোক্তিপ্রিয়—সেই পরিহাস ও শ্লেষ চিত্ততোষ, নাগর, রসময়ী গোওয়ালিনী ও দন্তা-চার্য্যের চরিতে বিলক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ নাগরের ইঙ্গরেজি-শব্দ-সম্বলিত কথোপকথনটী এমনই সুন্দর হইয়াছে যে, তাহা পাঠ করিবামাত্র ঐরূপ কতকগুলি নাগর আমাদের চক্ষুর উপর আসিয়া উপস্থিত হন। তর্করত্ন, নাগরের কোন বেশভূষা দেন নাই—পরা-মর্শ জিজ্ঞাসাকরিলে আমরা দাড়ী, ছড়ি, চস্‌মা, মাথার মধ্যস্থলে স্ত্রীলো-কের মত সিঁতে প্রভৃতি দিয়া তাঁহাকে সাজাইয়াদিতে বলিতাম!

নবনাটকে পরিহাসোদ্দীপক অনেক প্রসঙ্গ থাকিলেও ইহা করুণ-রসোত্তর গ্রন্থ। সুবোধের অলীক মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে সাবিত্রীর মূর্চ্ছা; তাঁহার উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ; গবেশের রোগ, অনুতাপ ও মৃত্যু; বিদেশ

হইতে প্রত্যাগত হইবামাত্র মাতৃপিতৃবিয়োগের, বিশেষতঃ উদ্বন্ধনে মাতার প্রাণত্যাগের, সংবাদশ্রবণে সুবোধের বিলাপ ও মূর্চ্ছাদি পাঠ করিবার সময়ে বোধহয় কেহই অনর্গল অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে-পারেননা। তর্করত্ন ঐ সকলস্থলে করুণরসের প্রচুররূপে উদ্দীপ্তি করিয়াছেন, এবং ঐ রসেই গ্রন্থের সমাপন হইয়াছে। কুলীনকুলসর্ব্বস্বে গান ছিলনা, ইহাতে কয়েকটী গানও আছে—সেগুলিও অতি মধুর হইয়াছে। অভিনীত হইবার উদ্দেশেই এই নাটক রচিত হয়, সুতরাং ইহা কয়েকবার অভিনীত হইয়াছিল, একথা বলা বাহুল্য।

রুক্মিণীহরণ নাটক—এই নাটকের উপাখ্যান পৌরাণিক। গ্রন্থকার সে অংশে আর কোন বৈচিত্র্যসম্পাদন করিতেপারেননাই; তবে তোতলা দরিদ্র ব্রাহ্মণ ধনদাস ও দেবর্ষি নারদের কথোপকথনে অনেক পরিহাসরসিকতা প্রকাশকরিয়াছেন, কিন্তু 'ধনদাস' নামটী ব্রাহ্মণোচিত হয়নাই। তর্করত্ন ইঙ্গরেজি নাটকরচয়িতাদিগের অনুকরণে ইহাতে নান্দীপ্রস্তাবনাদি কিছুই দেন নাই, তাহাতে কথা নাই; কিন্তু তিনি সংস্কৃতজ্ঞ হইয়া কিরূপে এই নাটকে ও পূর্ব্বোক্ত নবনাটকে 'গর্ভাঙ্ক এই নামে প্রকরণবন্ধ করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতেপারিলামনা। সংস্কৃত পারিভাষিক 'গর্ভাঙ্ক' শব্দে যাহা বুঝায়, তাহা আমরা পূর্ব্বে (২১৬পৃষ্ঠে) উল্লেখ করিয়াছি। গর্ভাঙ্ক শব্দের সেই অর্থ ত্যাগকরিয়া অপর অর্থে প্রয়োগকরা তর্করত্নের পক্ষে উচিত হয়নাই।

তর্করত্নের আর আর নাটকগুলি সংস্কৃতহইতে অনুবাদিত। তবে সে সকল অনুবাদ অবিকল নহে। আধুনিক নিয়মানুসারে অভিনয়োপযোগী করিবার নিমিত্ত তাহাদের রসভাবাদির অনেক পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও সন্নিবেশন করা হইয়াছে। সে পরিবর্ত্তাদি অনেক স্থলে মন্দ হয়নাই। ইহাঁর রচিত সকল নাটকই স্থানে স্থানে অভিনীত হইয়াছে। তর্করত্নের অনেক পুস্তকেই রাজ শ্রীযুক্তযতীন্দ্রমোহন-

ঠাকুরমহাশয়ের নামসংযোগ দর্শনকরিতেছি; অতএব বোধ হইতেছে যে, তিনিই ঐ সকল গ্রন্থপ্রণয়নের উৎসাহদাতা। সুতরাং বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজ তাঁহার নিকট অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

নীলদর্পণ—নবীনতপস্বিনী প্রভৃতি।

জিলা কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত চৌবেড়া নামক গ্রামনিবাসী ৺দীনবন্ধু-মিত্র নীলদর্পণ, নবীনতপস্বিনীনাটক প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থের প্রণয়ন করিয়াছেন। ১৭৫১ শকে ইঁহার জন্ম হয়;—পিতার নাম কালাচাঁদ মিত্র। দীনবন্ধু প্রথমে হুগলীকালেজে ও পরে কলিকাতা হিন্দু-কালেজে অধ্যয়ন করিয়া ইঙ্গরেজিতে বিলক্ষণ কৃতবিদ্য এবং শেষোক্ত কালেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্ররূপে গণনীয় হইয়া ছাত্রবৃত্ত্যাদিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি কালেজ ত্যাগকরিয়া প্রথমে ডাক মুন্সীর কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। কিয়ৎকাল সেই কার্য্য সম্পাদনকরিলে পর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির গুরুতা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে ইন্‌স্পেক্‌টিং পোষ্ট-মাষ্টারী অর্থাৎ ডাকঘরের তত্ত্বাবধায়কতাপদে নিযুক্ত করেন। তদবধি শেষ পর্য্যন্ত তিনি সেই কার্য্যেই নিযুক্ত ছিলেন; এবং ক্রমশই তাঁহার পদবৃদ্ধি হইয়াছিল; এবং কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহার কার্য্যকুশলতাদর্শনে অতীব প্রীত হইয়া সম্মানসূচক 'রায়বাহাদুর' উপাধি তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দের ১লা নবেম্বরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

দীনবন্ধুবাবু সর্ব্বপ্রথমে ১৮৬০ খৃঃ অব্দে নীলদর্পণ নাটক প্রকাশ-করেন। উক্ত নাটকে রচয়িতার নাম না থাকায় অনেক দিন সকলে তাঁহাকে গ্রন্থকার বলিয়া জানিতে পারে নাই—ক্রমে প্রকাশ হইয়াছে। তৎপরে তিনি ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে নবীনতপস্বিনী, ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে বিয়ে-পাগলাবুড়ো, ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে সধবারএকাদশী, ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে লীলাবতী

১৮৭১ খৃঃ অব্দে সুরধুনী এবং ১৮৭২ খৃঃ অব্দে জামাইবারিক ও দ্বাদশ-কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন। এই ৭ খানি গ্রন্থের মধ্যে সুরধুনী ও দ্বাদশকবিতা ভিন্ন সকলগুলিই নাটক বা প্রহসন।

নীলদর্পণ—যৎকালে কৃষ্ণনগর যশোহর প্রভৃতি প্রদেশে নীলকর সাহেবেরা প্রজাদিগের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করেন, সেই সময়ে এই নাটক প্রচারিত হয়। ইহাতে গোলোকবসু নামক এক সমৃদ্ধ কায়স্থ পরিবারের নীলোপদ্রবে ধনে প্রাণে ধ্বংস হইবার বর্ণনপ্রসঙ্গে বলপূর্ব্বক প্রজার ভূমিতে নীলবপন, দাদন না লইলে তাহাদিগকে কুঠীতে ধরিয়া লইয়া গিয়া শ্যামচাঁদ ও রামকান্ত প্রহারে দাদন গতান, গ্রাম-দগ্ধকরা, নীলবপনে অনিচ্ছু প্রজাদিগের উপর মিথ্যা নালীশ উপস্থিত করিয়া তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করা, মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের সহিত ভাব-প্রণয় করিয়া প্রজাদিগের কৃত মোকদ্দমা সকল বিফল করিয়া দেওয়া, বলপূর্ব্বক লোকের স্ত্রী পরিবারের জাতিনাশ করা, হত্যাকরা প্রভৃতি নীলকর সাহেবদিগের কৃত ভূরি ভূরি অত্যাচার সকল বিলক্ষণ কবিত্ব-সহকারে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থবর্ণিতরূপ সকল অত্যাচারই নীলকরদিগের কর্ত্তৃক সত্য সত্যই সম্পাদিত হইত কি না? সে বিচার করা আমা-দের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু বর্ণনাপাঠ করিলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়াযায়, এবং নীলকরদিগকে পিশাচ রাক্ষস হইতেও সহস্রগুণে অপ-কৃষ্টজাতি বলিয়া বোধ জন্মে। মিথ্যা মোকদ্দমায় জেলে প্রেরিত গোলোকবসুর উদ্বন্ধনে মৃত্যু, নীলকরকর্ত্তৃক আহত গ্রন্থনায়ক নবীন-মাধবের প্রাণবিয়োগ, পতিপুত্রশোকাকুলা সাবিত্রীর উন্মাদ, উন্মত্ততা-বস্থায় তাঁহাকর্ত্তৃক নিজপুত্রবধূহনন, সহসা উন্মাদাপগমে জ্ঞানসঞ্চার হও-য়ায় অনুতাপে তাঁহার প্রাণত্যাগ—ইত্যাদিস্থলে গ্রন্থকার করুণরসের সাতিশয় উদ্দীপ্তি করিয়াছেন। সে সকল স্থল পাঠ করিবার সময়ে কোন মতেই অশ্রুসম্বরণ করাযায়না।

নীলদর্পণ এইরূপ করুণরসপূর্ণ হইলেও ইহা যে, নাটকাংশে সর্ব্বাঙ্গ-

সুন্দর হইয়াছে, তাহা বলা যাইতেপারেনা। কারণ নাটকের সকল অংশই অভিনেয় হওয়া উচিত, কিন্তু প্রজাদিগের উপর শ্যামচাঁদ ও রামকান্ত প্রহার, গর্ভবতী ক্ষেত্রমণির উদরে মুষ্ট্যাঘাত, উড়ানিপাকান দড়ীতে গোলোকচন্দ্রের মৃতদেহ দোদুল্যমান রাখা, গলায় পা দিয়া সরলতাকে হত্যাকরা প্রভৃতি কাণ্ডসকল অভিনয়ের যোগ্য হইতে পারেনা। ইঙ্গরেজি নাটকে এসকল সম্পূর্ণরূপে দোষাবহ হয়না বটে কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ওরূপ কাণ্ডসকল, রঙ্গস্থলে দর্শকদিগের উদ্বেজক হয় বলিয়া, নেপথ্যে সম্পাদন করিয়া সংস্কৃত নাটকরীতির অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন নীলদর্পণে কোন কোন অযোগ্যস্থলে সাধুভাষাসমন্বিত বক্তৃতা আছে, সেগুলি স্বভাবসঙ্গত নহে। তা ছাড়া গ্রন্থকার অকারণেও ২।১টী পাত্রকে রঙ্গস্থলে আনিয়াছেন;—দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে দুইজন অধ্যাপককে রঙ্গভূমিতে আনিবার কোন কারণ আমরা দেখিতে পাইলাম না।

নীলদর্পণ লইয়া দিনকত হুলস্থূল পড়িয়াছিল। উহাতে বর্ণিত নীলকরকৃত অত্যাচার সকল সাহেবদিগের গোচর করাইবার জন্য ঐ নাটক ইঙ্গরেজিতে অবিকল অনুবাদিত করাহয়। তদ্দর্শনে ইংলিষ-মানপত্রের সম্পাদক, আপনাদিগের খ্যাতিলোপকর পুস্তকের মুদ্রণ করিয়াছে বলিয়া, মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে কলিকাতাসুপ্রীমকোর্টে অভি-যোগ উপস্থিত করিলে লোকহিতৈষী শ্রদ্ধাস্পদ পাদরী জে, লঙ্‌ সাহেব উক্ত পুস্তকের মুদ্রণ ও অনুবাদকরণ জন্য সমস্ত দোষের ভার নিজস্কন্ধে লইয়া আদালতে উপস্থিত হয়েন। উক্ত আদালতের তৎকালীন জজ্‌ সর্‌মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌স সাহেব সেই মোকদ্দমার বিচার করিয়া ১৮৬১ খৃঃ অব্দের ২৪এ জুলাই উক্ত মহাত্মার একমাস কারাবাস ও সহস্র মুদ্রা *

* এই মুদ্রা কলিকাতার ৺কালীপ্রসন্নসিংহ মহোদয় তৎক্ষণাৎ দিয়াছিলেন—সাহেবকে দিতে হয়নাই।

অর্থদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। ইহাতে বাঙ্গালীরা যেরূপ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনীয় নহে। যাহাহউক, ঐ হঙ্গামে নীলদর্পণের নাম দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারও কর্ণগোচর হইতে বাকি ছিল না;—ইহা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পক্ষে সামান্য সৌভাগ্যের কথা নহে।

নবীনতপস্বিনী দীনবন্ধু বাবুর দ্বিতীয় নাটক। ইহার স্থূলমর্ম্ম এই যে, রমণীমোহন নামক রাজা দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করিয়া গর্ভবতী প্রথমাপত্নীর প্রতি বড়ই অনাদর করেন; তাহাতে বড়রাণী এক দাসীর সহিত বহির্গত হইয়া অরণ্যবাস করেন, তথায় তাঁহার এক পুত্র জন্মে। রাজপুত্র ও রাণী তপস্বিবেশে সপ্তদশবর্ষ পর্য্যন্ত নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে রাজধানীতে উপস্থিত হয়েন। ঐ সময়ে ছোটরাণীর মৃত্যু হওয়ায় রাজাকে সকলে পুবর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করেন, এবং এক রাজসভাসদের দুহিতা অপরূপলাবণ্যা 'কামিনী'কে কন্যা স্থির করেন। কিন্তু ছোট রাণীর মৃত্যুর পর রাজার মনে বড় রাণীর পুর্ব্বশোক উচ্ছলিত হওয়ায় তিনি বিবাহ করিতে অসম্মত হয়েন। ইত্যবসরে তপস্বিবেশধারী রাজপুত্র বিজয় ও কামিনীর পরস্পর অনুরাগসঞ্চার হয়, এবং কামিনীর মাতা, তপস্বী হইলেও বিজয়কে কন্যাদান করিতে অভিলাষিণী হয়েন; তাহাতে কামিনীর পিতা কুপিত হইয়া কৌশলপূর্ব্বক বিজয়কে চোররূপে রুদ্ধ করিয়া রাজসভায় উপস্থিত করান; তথায় অভিজ্ঞানাদিদর্শনে রাজা বিজয়কে পুত্ররূপে চিনিতে পারেন, রাণীকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করেন, এবং বিজয়-কামিনীর বিবাহ হয়। এই উপাখ্যানের, নাটকরীতিতে বিস্তার ও সুকৌশল সহকারে বর্ণনাপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার দুইটী অতি রমণীয় পদার্থ তন্মধ্যে বিন্যস্ত করিয়াছেন। সে দুইটীর ছাঁচ বিলাত হইতে আনা হইয়াছে বলিয়া আমরা কোন দোষ দিইনা,—যে হেতু বিলাতীয়ের অনুরূপ দ্রব্য এদেশে উত্তমরূপে নির্ম্মাণ করিয়া দেশীয়দিগের মন মোহিত করিতে পারিলে তাহাতে বাহাদুরীও আছে—দেশের উপকারও আছে। সেই

দুইটী জিনিষ্ কি ?—মল্লিকা আর মালতী। ইহারা যুবতী, রূপবতী, সতী, বুদ্ধিমতী ও রসবতীর অগ্রগণ্যা। স্বামী, সখী ও সখীপতির সহিত কিরূপ বিমল আমোদ করিতে হয়, তাহা যাঁহারা না জানেন, তাঁহারা কিছু দিন মল্লিকা মালতীর সহচারিণী থাকিবেন। "মরণ আর্ কি! ভাতারের সঙ্গে ও কিলা ?" মালতীর এই কথার উত্তরে মল্লিকার "তা রঙ্গ কর্বের জন্যে বুঝি পথের লোক ডেকে আন্‌বো ?" এই উক্তি কত লোককে কত উপদেশ দিতে পারে। মিছা মিছি রাজী হইয়া জলধরকে তাহার স্ত্রীরদ্বারা ঝাঁটা খাওয়ান, তৎপশ্চাৎ তাহাকে স্বগৃহে আনয়ন পূর্ব্বক আল্কাৎরা তূলা মাখাইয়া হোঁদল কুঁৎ কুঁতে রূপে লৌহপিঞ্জরে রুদ্ধ করিয়া দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যগুলি যদিও কুলবালার পক্ষে কিছু অসঙ্গত হয়, তথাপি যখন্ ঐ সকল কার্য্য তাহাদের পতির জ্ঞাতসারে হইয়াছিল এবং যখন্ জলধরের আকার-প্রকার ঐরূপ, তখন্ তাহা দোষ বহ হইতে পারেনা। ফলতঃ আমাদের বিবেচনায় নবীনতপস্বিনীর মল্লিকা মালতীর বিবরণটী সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর ও প্রীতিপদ।

রতিকান্ত, জলধর, জগদম্বা, রাজা, মাধব, গুরুপুত্র, সুরমা, বিদ্যাভূষণ, বড়রাণী, বিজয়, কামিনী প্রভৃতি নাটকোক্ত অপরাপর পাত্রগুলির চরিতও প্রায় সর্ব্বস্থলেই স্বভাবসঙ্গতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কবি মধ্যে মধ্যে——

'মাছ মরিল বেরাল কাঁদে শান্ত কর্‌লে কে।
বেঙের শোকে সাঁতারপানি হেরি সাপের চকে॥"
" মালতী মালতী মালতী ফুল। মজালে মজালে মজালে কুল॥"
——"আমরি আমরি যমেরই ভুল॥' ——
"মধুপান করতে পারি। মাচির কামড় সৈতে নারি॥"
"কামিনীর কথা শোনে তারে বলি পতি।
পতিপায় থাকে মন তারে বলি সতী॥"
"স্বামিমুখে মন্দ কথা সাপিনীদশন।
ফুটিলে মানিনীমনে, অমনি মরণ॥"

এইরূপ যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা দিয়াছেন, তাহা সেই সেই স্থানে কিরূপ মধুর হইয়াছে, তাহা বর্ণনীয় নহে। ফলতঃ নবীনতপস্বিনীখানি একটী উৎকৃষ্ট নাটক। ইহার কয়েক স্থলে যে কিঞ্চিৎ অসঙ্গত ও অনুচিত ঘটনার বর্ণন আছে—তাহা আমরা আর উল্লেখ করিলাম না। দীনবন্ধুবাবু নীলদর্পণের পর অনেক দিন পর্য্যন্ত কোন রচনা করেন নাই, এই জন্য অনেকে বলিত, "দীনবন্ধুবাবু তাদৃশ কবি নহেন—নীলদর্পণও ভাল হয়নাই—কেবল সময়গুণে লোকের আদৃত হইয়াছিল"—নবীনতপস্বিনী প্রকাশিতহইবার পর অবধি তাঁহাদের সে মুখ বন্ধহইয়াছে। এই নাটক কয়েকস্থানে অভিনীতও হইয়াছে।

লীলাবতী—দীনবন্ধুবাবুর তৃতীয় নাটক। হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়নামক এক সমৃদ্ধ ব্যক্তি আপনার গুণবতী কন্যা লীলাবতীর নদেরচাঁদ নামক নিতান্ত দুশ্চরিত্র এক শ্রেষ্ঠ কুলীন পাত্রের সহিত বিবাহ দিবার কল্পনা করেন। কিন্তু লীলাবতী পূর্ব্বহইতেই আপনাদিগের বাটীতে প্রতিপালিত রূপগুণশালী ললিতমোহন নামক যুবকের প্রতি অনুরক্তা হইয়াছিলেন। চট্টোপাধ্যায় ইহা জানিতেপারিয়াও ললিতকে লীলাবতী দানকরিতে ইচ্ছুক হয়েননাই। কারণ তাঁহার পুত্র অরবিন্দ বার বৎসরকাল নিরুদ্দেশ থাকায় তিনি ললিতকে পোষ্যপুত্র গ্রহণকরিয়া লীলাবতীকে বড় কুলীনে দিবার মানস করিয়াছিলেন। লীলাবতী নদেরচাঁদের হস্তে না পড়িয়া ললিতের পত্নী হয়, এজন্য ললিতের বন্ধু সিদ্ধেশ্বর, চট্টোপাধ্যায়ের শ্যালক শ্রীনাথ, অরবিন্দের স্ত্রী ক্ষীরোদবাসিনী, লীলাবতীর সই সারদাসুন্দরী প্রভৃতি সকলেই নিতান্ত ইচ্ছা ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টার কোন ফল হইবে না বুঝিয়া ললিত, চট্টোপাধ্যায়ের বাটী হইতে পলায়ন করেন, সুতরাং চট্টোপাধ্যায়কে পোষ্যপুত্র লইবার জন্য অপর একটী বালক স্থির করিতেহয়। অরবিন্দ আপন জনকের রক্ষিতা স্ত্রীর কন্যা চাঁপাকে নিজপত্নীভ্রমে আলিঙ্গনকরিয়া তৎপ্রায়শ্চিত্তার্থই বহির্গত হইয়াছিলেন। ঐ চাঁপা

সন্ন্যাসিবেশে ভ্রমণ করিয়া অরবিন্দকে নানা সঙ্কট হইতে উদ্ধার করেন এবং চট্টোপাধ্যায়ের পোষ্যপুত্র লইবার অব্যবহিতপূর্ব্বেই অরবিন্দ সাজিয়া তথায় উপস্থিত হয়েন। ইহার ২।৩ দিন পরেই ললিতের সহিত প্রকৃত অরবিন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলে প্রথমে মহাগোলযোগ ঘটে, পরে প্রথম অরবিন্দ পুরুষবেশ ত্যাগকরিয়া চাঁপারূপে প্রকাশিত হইলে গোলযোগের নিবৃত্তি এবং ললিতের সহিত লীলাবতীর বিবাহ হয়—এই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া পরমকৌশলসহকারে এই নাটকের রচনা করা হইয়াছে। বর্ণিত পাত্রগুলির প্রকৃতিসকল প্রায় সর্ব্বস্থলেই যথাযথ সংরক্ষিত হইয়াছে। হেমচাঁদের সহিত সারদাসুন্দরীর কথোপকথন ও হেমচাঁদের কটুবাক্যে সারদার বাক্স উল্টাইয়া ফেলা অতি মনোরম হইয়াছে; চট্টোপাধ্যায়ের কুলান্ধতা, শ্রীনাথের গোয়ার্ত্তুমী, কন্যাপ্রদর্শনসময়ে হেমচাঁদ ও নদের চাঁদের বক্তৃতা, ক্ষীরোদবাসিনীর বিলাপ, লীলাবতীর প্রলাপ, সন্ন্যাসিবেশধারিণী চাঁপার ব্যবহার এসকলও অতি উৎকৃষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। দীনবন্ধুবাবু এক জন বিলক্ষণ কৃতবিদ্য লোক, সুতরাং তাঁহার রচিত পুস্তকে উপাখ্যানের মনোরম বৈচিত্র্য থাকা যেরূপ সম্ভাবিত, এগ্রন্থে তাহাই আছে।

দীনবন্ধুবাবু খুব রসিক লোক। তিনি নানাদেশ ভ্রমণকরিয়া অনেক খোস্‌গল্প সংগ্রহকরিয়াছেন এবং সেই গুলি পুস্তকমধ্যে প্রবেশ করাইতেছেন। সেরূপ করায় অনেকস্থলই মধুর হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন কোন স্থলে বোধহয় সেই গল্পগুলি প্রকাশকরিবার জন্যই সেই সেই প্রকরণের অবতারণা করিয়াছেন। কন্যাপ্রদর্শনাবসরে রঘুয়াভৃত্যকে আনয়নকরিয়া তন্মুখ হইতে 'অন্নিকে সন্নিকে লোকে' ইত্যাদি উড়িয়া শ্লোক প্রকাশকরা এবং মাতালসভায় রস ও ভূতের বিচার করাই তাহার প্রমাণ। আমাদের বিবেচনায় ঐ গুলি নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে। সে যাহাহউক, নদেরচাঁদ গাঁজা, গুলি ও মদ খায় বলিয়াই তাহার প্রতি শ্রীনাথের তাদৃশ ঘোরতর বিদ্বেষ, কিন্তু দীন-

বন্ধুবাবু সেই শ্রীনাথকেই মদ, গাঁজা ও গুলিতে বুঁদ করিয়া তুলিয়াছেন! ইহা সঙ্গত হয়নাই। শ্রীনাথ স্বয়ং বিশুদ্ধচরিত্র থাকিয়া নদেরচাঁদের প্রতি ঐরূপ উদ্ধতভাবে ঘৃণা প্রদর্শন করিলে তাহা সঙ্গত হইত। গ্রন্থকার হেমচাঁদের বক্তৃতামুখে পয়ারকে গয়ার বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু তিনিই বলুন দেখি, লীলাবতী, সারদাসুন্দরী ও ললিত প্রভৃতির মুখে যে সকল দীর্ঘ দীর্ঘ মাইকেলী ছন্দ নিক্ষেপকরিয়াছেন, তাহা কি গয়ার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে? যাঁহারা লীলাবতীর অভিনয়দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন, ঐ সকল কবিতা শ্রোতার কিরূপ কর্ণশূল হয়।

বিয়েপাগ্‌লাবুড়ো—সধবার একাদশী ও জামাইবারিক এতিন খানি প্রহসন। দীনবন্ধুবাবুর বিদ্যা, বুদ্ধি, রসিকতা ও উপাখ্যানরচনাচাতুর্য্য যেরূপ প্রসিদ্ধ, এই তিনখানিই তাহার উপযুক্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। এই তিন পুস্তকেরই আদ্যোপান্ত হাস্যরসে পরিপূর্ণ; মধ্যেমধ্যে করুণরসেরও আবির্ভাব আছে। সে গুলিও অতি মনোহর হইয়াছে। বিয়েপাগ্‌লাবুড়ো নামক পুস্তকে, ঐরূপ এক বৃদ্ধব্রাহ্মণকে নাচাইয়া গ্রামের কোন ভদ্রলোককর্ত্তৃক শিক্ষিত কয়েকজন বিদ্যালয়ের ছাত্র মিছামিছি বিবাহদিয়া কৌতুক করিয়াছে। কৌতুক বেশ আমোদজনক হইয়াছে এবং স্ত্রীর মৃত্যু হইলে অধিকবয়সেও পুনর্ব্বার বিবাহ করণেচ্ছু লোকদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কনক বাবু বিজ্ঞ লোক হইয়াও স্কুলের অল্পবয়স্ক ছেলেগুলিকে অমনতর বেলেল্লাগিরি কাজ করিতে শিক্ষাদিয়া ভাল করেননাই। আর তা ছাড়া, ঐ ছেলেগুলো বাসরঘরে শালীশালাজপ্রভৃতি সাজিয়া যে ঘোরতর ইয়ারকি দিয়াছে, প্রৌঢ়া যুবতীরাও সকলে সেরূপ পাকা ইয়ারকি দিতে পারে না। সুতরাং সেগুলি কিছু অস্বাভাবিক হইয়াছে।

সধবার একাদশী খানি মদের কথাতেই আরব্ধ ও মাতালের

কথাতেই পর্য্যবসিত। ইহাতে হাস্যরসোদ্দীপক অনেক বিষয় বর্ণিত আছে সত্য, কিন্তু আদ্যোপান্ত অশ্লীল বথামি ও মাতলামীর কথাতেই পরিপূর্ণ। সমাজপ্রচলিত কোন দোষের সবিস্তর বর্ণন, সেই দোষ জন্য অনিষ্টসঙ্ঘটন ও তৎপরে তদ্দোষাক্রান্ত ব্যক্তির অনুতাপ ও চরিত্রশোধন প্রভৃতি পরিহাসচ্ছলে বর্ণনকরিয়া সেই দোষের প্রতি সমাজের ঘৃণা উৎপাদন করাই, বোধহয়, প্রহসনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া শুদ্ধ কতকগুলা বথামীর গল্প লিখিলেই যদি প্রহসন হইত, তাহা হইলে কলিকাতার মেছোবাজার ও সোণাগাছী প্রভৃতি স্থানে দৈনন্দিন যেসকল ব্যাপার সঙ্ঘটিত হয়, সেইগুলি অবিকল লিখিয়া লইলেও অনেক প্রহসন হইতে পারিত। উল্লিখ্যমান প্রহসনে অটল ও নিমেদত্ত বরাবর সমান মাতলামী, ও বেশ্যা প্রভৃতি লইয়া সমান চলাচলি করিয়াছে। তাহাদের চরিত উত্তমরূপে চিত্রিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তৎপাঠে সমাজের কিছুমাত্র শিক্ষালাভ নাই। সুতরাং ওরূপ বিবরণ লিখিয়া প্রহসনরচনার কি প্রয়োজন ছিল? তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ফলতঃ বড়ই দুঃখের বিষয় যে, দীনবন্ধু বাবুর ন্যায় সুসামাজিক লোকের হস্ত হইতেও এরূপ জঘন্য পদার্থ বহির্গত হইয়াছে!

জামাইবারিক প্রহসনখানির উপাখ্যান সমধিকচাতুর্য্যসম্পন্ন। বিজয়বল্লভ নামক এককায়স্থ জমীদার বড় বড় কুলীনসন্তানদিগকে কন্যাদান করিয়া ঘরজামাইএ রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সকলের একত্র অবস্থানের জন্য একটী পৃথক্ প্রশস্ত গৃহনির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন— লোকে ঐ গৃহকে জামাইবারিক বলিত। জামাইএরা তথায় থাকিয়া গাঁজা গুলি মদ খাইতেন এবং সময়মত পাস্ পাইলে তবে স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইতেন। তাঁহাদের স্ত্রীরা অনেকেই স্ব স্ব স্বামীর প্রতি নিতান্ত সাহঙ্কার ব্যবহার করিত। অভয়কুমার নামে ঐরূপ এক জামাই ছিলেন। একদা তাঁহার স্ত্রী পদাঘাত করিব, বলায় তিনি

অভিমানে শ্বশুরবাটী হইতে চলিয়া আইসেন এবং দুই পত্নীর বিবাদানলে দহ্যমানশরীর পদ্মলোচন নামক নিজ প্রতিবাসীর সহিত মিলিত হইয়া বৃন্দাবনগমনপূর্ব্বক বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করেন। এ দিকে অভয়ের স্ত্রী কামিনী পতির অবমাননাকরণজন্য অনুতাপে তাপিত হইয়া পতির অন্বেষণার্থ সভর্ত্তৃকা এক বিশ্বস্ত প্রতিবেশিনীর সহিত বৃন্দাবনগমন করিয়া বৈষ্ণবীবেশে থাকেন। তথায় বৈষ্ণবরূপী অভয়ের সহিত কণ্ঠীবদল হইলে পর সমুদয় প্রকাশিত হয়—ইহাই এই প্রহসনের স্থূল মর্ম্ম।

জামাইদিগের অতদূর দুরবস্থা, দুই পত্নীকর্ত্তৃক পদ্মলোচনের শরীর ভাগ করিয়া লওয়া ও একের ভাগে পতিত স্বামীর অঙ্গে অন্যের আঘাতাদি করা, রাত্রিকালে স্বামিভ্রমে চোরকে ধরিয়া দুই সতীনের ওরূপ কাড়াকাড়ি ও প্রহার করা প্রভৃতি কার্য্যগুলি নিতান্ত অত্যুক্তিদোষে দূষিত হইয়াছে—সুতরাং সেই সেই অংশগুলি তত প্রীতিকর না হউক, অপর সমুদয় অংশ বিলক্ষণ মনোহর হইয়াছে। ভবী ময়রাণী, হাবার মা ও কামিনীর পরস্পর কথোপকথন, বাড়ীর ভিতর যাইবার জন্য জামাইদিগকে পাস্ দেওয়ার অবসরে গ্রন্থকারের সকল বন্ধুরই নামোল্লেখ ও কৌশলক্রমে যবনজাতীয় আব্দুল লতিফ্‌কেও তন্মধ্যে আনয়ন, স্বামীর অবমাননা করিয়াই হঠাৎ কামিনীর অনুতাপ উপস্থিত হওয়া এবং বৃন্দাবনে মিলনের সময়ে কামিনীর মনের সমুদয় কথা খুলিয়া খেদ করা, এই সমুদয়স্থলেরই বর্ণনাবসরে কবি বিলক্ষণ কবিত্ব ও ও পরিহাসরসিকতা প্রকাশ করিয়াছেন। রামায়ণ ও পীরের গানগুলি নূতন না হইলেও বিলক্ষণ কৌতুককর হইয়াছে। কৌলীন্যানুরোধে যাঁহারা ঘরজামাইএ রাখেন বা ঘরজামাইএ থাকেন, এই পুস্তকের পাঠে তাঁহাদের অনেকেরই চৈতন্য হইবার সম্ভাবনা।

সুরধুনীকাব্য ও দ্বাদশকবিতা এ দুইখানি পদ্যময়। হিমালয় হইতে সাগর পর্য্যন্ত গঙ্গার উভয়পার্শ্ববর্ত্তী নদ নদী পর্ব্বত দেশ নগর গ্রাম ও তত্তৎস্থানীয় ঐতিহাসিক বিবরণ এবং প্রধান প্রধান

বস্তু ও ব্যক্তিদিগের বর্ণনাকরাই এই গ্রন্থরচনার প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত কবি যুবতী গঙ্গাকে পদ্মা সখীর সহিত পিতৃ-ভবন হিমালয় হইতে পতি সাগরের সমীপে প্রেরণ করিবার উপা-খ্যানের কল্পনা করিয়াছেন, এবং সেই কল্পিত উপাখ্যানের বর্ণনপ্রসঙ্গে অনেক স্থানের অনেক বিবরণ লিখিয়াছেন। যে সকল প্রসিদ্ধ নগরাদি গঙ্গার পার্শ্ববর্ত্তী নহে, গঙ্গায় পতিত যমুনা সরযূ ঘর্ঘরা কৌশিকী প্রভৃতি সখীরূপা অপরাপর নদীদিগের মুখে সে সকলেরও বর্ণনাকরা হইয়াছে। ফলতঃ এই গ্রন্থ পাঠে হিমালয় হইতে সাগর পর্য্যন্ত নদী-সন্নিহিত অনেক প্রধানপ্রধান স্থানের বিবরণ কাব্যরসাস্বাদসহকারে জ্ঞাত হইতে পারাযায়।

দীনবন্ধুবাবু পূর্ব্বোল্লিখিত নাটকগুলি রচনাকরিয়া যেরূপ যশোলাভ করিয়াছিলেন, সুরধুনীকাব্যে সেরূপ করিতে পারেন নাই। ইহার কবিতাসকল সর্ব্বস্থলে প্রীতিকর হয়নাই—এমন কি, ইহারও অনেক পদ্য "কেবল চৌদ্দোয় চেনাযায়।" ইংরেজিতে যাহাকে 'এনাক্রনিজ্‌ম্‌' অর্থাৎ কালিকদোষ কহে, ইহাতে তাহাও সঙ্ঘটিত হইয়াছে। কবির রচনায় গঙ্গার হিমালয় হইতে সাগরগমনের প্রথম সময়ই প্রকাশিত হয়, কিন্তু তখন্ কাশীর মানমন্দির, বহরমপুরের কালেজ, কৃষ্ণনগরের কার্ত্তিক-বাবুর গান—এসকল কোথায় ছিল? এই গ্রন্থের বিষয়ও কবির নূতন উদ্ভাবিত নহে; কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, মনসার ভাসান, ও গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী এই ৪খানি প্রাচীন পুস্তকে প্রায় এইরূপ বিষয় সকলইবর্ণিত হইয়াছে।

দ্বাদশকবিতা—'শকুন্তলার তনয়দর্শনে দুষ্মন্তের মনের ভাব' 'চন্দ্র' 'সূর্য্য' 'কোকিল' ইত্যাদি দ্বাদশটী পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ের বর্ণনা একত্র করিয়া এই পুস্তক নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার অন্তর্গত কোন কোন কবিতা পূর্ব্বে সংবাদপত্রাদিতেও প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার, শ্রীযুক্তঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর মহাশয়কে "আপনি বর্ত্তমান বঙ্গভাষার

জনক—বঙ্গভাষা আপনার তনয়া” এই বলিয়া পুস্তকখানি উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। এই পুস্তকের কবিতাসকল আদ্যোপান্ত উৎকৃষ্ট না হউক, কিন্তু অধিকাংশই যে, অতি সুন্দর হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। আমরা এবিষয়ের বাহুল্য না করিয়া পাঠকদিগের প্রদর্শনার্থ একটী কবিতা নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এতৎপাঠে তাঁহারা ঐ পুস্তকের দোষগুণ কতক বুঝিবেন।

পরিণয়।

সুপবিত্র পরিণয়, অবনীতে সুধাময়, সুখ-মন্দাকিনীর নিদান।
মানব মানবীদ্বয়, হৃদয়ের বিনিময়, করিবার বিশুদ্ধ বিধান॥
একাসনে দুইজন, যেন লক্ষ্মীনারায়ণ, বসে সুখে আনন্দ অন্তরে।
এ হেরে উহার মুখ, উদয় অতুল সুখ, যেন স্বর্গ ভুবনভিতরে॥
প্রণয় চন্দ্রিকাভাতি, ঘরময় দিবারাতি, বিনোদ কুমুদ বিকসিত।
আনন্দ বসন্তবাস, বিরাজিত বারমাস, নন্দনবিপিন বিনিন্দিত॥
যেদিকে নয়ন যায়, সন্তোষ দেখিতে পায়, গিয়েছে বিষাদ বনে চলে।
সুখী স্বামী সমাদরে, কান্তাকর করে করে, পিরীতি পূরিত বাণী বলে,—
“তব সন্নিধানে সতি! অমলা অমরাবতী, ভুলে যাই নর-নশ্বরতা;
অভাব অভাব হয়, পরিতাপ পরাজয়, ব্যাধি বলে বিনয়বারতা॥”
রমণী অমনি হেসে, স্নেহের সাগরে ভেসে, বলে ‘কান্ত! কামিনী কেমনে;
বেঁচে থাকে ধরাতলে, যেই হতভাগ্য ফলে, পতিত পতির অযতনে?
নবশিশু সুখরাশি, প্রণয়-বন্ধন-ফাঁসি, পেলে কোলে কালসহকারে।
দম্পতীর বাড়ে সুখ, যুগপৎ চুম্বে মুখ, কাড়াকাড়ি কোলে লইবারে॥

আলালের ঘরের দুলাল প্রভৃতি।

কলিকাতানিবাসী ৺প্যারীচাঁদমিত্র ‘টেকচাঁদঠাকুর’ এই কল্পিত-নামে অন্তরিত থাকিয়া ‘আলালের ঘরের দুলাল’ ‘মদখাওয়া বড়দায় জাত থাকার কি উপায়’ ‘রামারঞ্জিকা’ ‘যৎকিঞ্চিৎ’ ও ‘অভেদী’

প্রভৃতি নামে কয়েকখানি গদ্যগ্রন্থের প্রণয়ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে আলালের ঘরের দুলালই প্রথম ও প্রধান।

এই পুস্তকে গ্রন্থকার বাবুরামবাবু নামক এক পল্লীগ্রামস্থ জমীদারের আচারব্যবহার, তাঁহার প্রশ্রয়প্রাপ্ত জ্যেষ্ঠপুত্র মতিলালের বিদ্যাশিক্ষা ও দুশ্চরিত্রতা এবং কনিষ্ঠপুত্র রামলালের বরদাপ্রসাদবিশ্বাস-নামক এক সদাশয় ধর্ম্মশীলব্যক্তির সহবাসে সদ্‌গুণলাভ প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া একটী অনতিদীর্ঘ উপাখ্যান বর্ণনকরিয়াছেন। ঐ উপাখ্যানের মধ্যে পল্লীগ্রামস্থ অনেক জমীদারে দোল দুর্গোৎসব নাচ তামাসা প্রভৃতিকার্য্যে মুক্তহস্ত হইয়াও পুত্রের বিদ্যাশিক্ষাদি আবশ্যক কার্য্যে যেরূপ কৃপণতা করেন, কোন লোককে জব্দ করিবার ইচ্ছা হইলে তাহার উপর যেরূপ মিথ্যা নালীশ উপস্থিত করেন—কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে মিথ্যাবাদী সাক্ষী, মোক্তার, উকীল, আদালতের আমলা প্রভৃতি যেরূপে তাঁহাদের ধনশোষণ করে, অধর্ম্মী বঞ্চক জালকারক মুখসর্ব্বস্ব ব্যক্তিবিশেষকে সর্ব্বকর্ম্মসুদক্ষ মনে করিয়া তাহার পরামর্শে তাঁহারা যেপ্রকারে নানাকুক্রিয়ায় রত ও পরিশেষে বিপজ্জালে জড়িত হয়েন, তাহা বাবুরামের চরিতে বিলক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। ছেলে বাল্যকালে পিতামাতার অনুচিত প্রশ্রয় পাইলে এবং সৎশিক্ষালাভে বঞ্চিত হইলে যেরূপ বিগড়িয়া যায়, বয়োবৃদ্ধিসহকারে তাহার নানা কুক্রিয়া যেপ্রকার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ধনবান্ বালকের সহিত দেশের অসৎ বালক জুটিয়া যেপ্রকারে তাহাকে অধঃপাতে দেয়, তাহা মতিলালের চরিত্রবর্ণনে বিশেষরূপে চিত্রিত হইয়াছে—কুপরামর্শদায়ী স্বার্থপর দুষ্টলোকে স্বার্থসাধনোদ্দেশে লোকের কি সর্ব্বনাশ করিতে পারে, তাহা ঠক্‌চাচা ও বাঞ্ছারামে বিশেষ ব্যক্ত হইয়াছে—এবং সৎপরামর্শে ও সাধুসঙ্গে লোকের চরিত্র কিরূপ বিশুদ্ধ হইতেপারে, তাহা বরদাবাবু বেণীবাবু বেচারামবাবু ও রামলালের চরিত্রে সবিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে বড়মানুষের সভা, কলিকাতার আদিবৃত্তান্ত, পোলিস, বাজার,

বিবাহের ঘোঁট, বরযাত্রীদিগের দুর্দ্দশা, মাজিষ্ট্রেটের কাছারি, সমারোহ-শ্রাদ্ধ, নীলকরের উপদ্রব প্রভৃতি অন্যান্য নানাবিষয়েরও সুন্দর বর্ণনা করা হইয়াছে। উপাখ্যানটী আগ্রহের সহিত শুশ্রূষণীয় না হউক, শিক্ষাপ্রদ বটে। পরমশত্রু ঠক্‌চাচা ও বাবুরামের প্রতি বরদাবাবুর অনুগ্রহ, কুক্রিয়াশীল মতিলালের দুরবস্থার একশেষ, নষ্টমতি ঠক্‌চাচার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাস, ধর্ম্মপরায়ণ রামলালের সর্ব্ববিধ সুখলাভ ইত্যাদি অনুধ্যানকরিলে 'ধর্ম্মের জয়—পাপের নাশ' এই কথার তাৎপর্য্য সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারাযায়।

গ্রন্থবর্ণিত অনেক বিষয়ই স্বভাবসঙ্গত হইয়াছে, কিন্তু কতকগুলি আবার নিতান্ত অস্বাভাবিকও বোধহয়। মতিলালের বদ্‌মাহেশী বড় অত্যুক্তিদূষিত হইয়াছে। তাহার মা কাঁদিতে কাঁদিতে নিকটে আসিয়া বলিল 'মতি! তোমার ভগিনী ও বিমাতার সকলদিন আদ্‌পেটা খাওয়াও হয় না; মতি অম্‌নি রাগিয়া দুই চক্ষু লাল করিয়া মাএর গালে ঠাস্ করিয়া চড় মারিল'! একথা কি মনে ধারণা করাযায়? ঐরূপ প্রহার করাইবার অগ্রে মাএর সহিত কোনরূপ কলহ করাইলে ভাল হইত না কি? গ্রন্থকার একস্থলে বাবুরামের স্ত্রৈণতাবর্ণনে লিখিয়াছেন —"স্ত্রী 'এ জল নয় দুধ্' বলিলে বাবুরাম চোখে দেখিয়াও অমনি বলিতেন, 'তাইত—এজল নয়—এ দুধ্'—স্ত্রী উঠ্ বলিলে উঠিতেন—বস্ বলিলে বসিতেন।" ইত্যাদি—কিন্তু সেই বাবুরামের, তিনি কি বিবেচনায় ঘটকালী করিয়া, স্ত্রীপুত্রাদিসত্ত্বে বুড়বয়সে পুনর্ব্বার বিবাহ দেওয়াইলেন? যে পুরুষ স্ত্রীর অমন ঘণ্টার গরুড়, তাহার কি আবার বিবাহ করিতে সাহস হয়?—বাবুরামের স্ত্রী মতিলালকর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন এবং যুবতীকন্যাকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনগমন করিলেন। বৃন্দাবন বৈদ্যবাটীর নিকটে নয়—তথা হইতে প্রায় ৩ মাসের পথ। দুইটী চিরগৃহরুদ্ধা যুবতী স্ত্রী নিঃসম্বলে ও নিরবলম্বনে ধর্ম্মবজায় রাখিয়া কিরূপে অত পথ যাইতে পারিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কিছু লেখা উচিত ছিল!

এস্থলে আর একটী বিষয় উল্লেখ্য হইতেছে। এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা বহুবিধ কষ্টস্বীকার করিয়া বিদ্যোপার্জ্জন করেন, চতুষ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনাকরাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সহস্র ক্লেশভোগ করিয়াও তাহা করিতে পারিলেই তাঁহারা চরিতার্থ হন। অধ্যাপনার প্রণালীও এদেশে স্বতন্ত্ররূপ—ছাত্রদিগকে অন্ন দিয়া পড়াইতে হয়। বিদ্যাধ্যাপনের এরূপ উদার রীতি বোধহয় কোন দেশে নাই। অধ্যাপকেরা বৈষয়িকসুখে বিসর্জ্জন দিয়া জ্ঞানার্জ্জন ও জ্ঞানবিতরণকার্য্যেই সর্ব্বদা নিরত থাকেন, এইজন্য তাঁহাদের আবশ্যকব্যয়নির্ব্বাহার্থ দেশীয় ধার্ম্মিক বিজ্ঞলোকেরা শ্রাদ্ধবিবাহাদি সকল কার্য্যের উপলক্ষেই তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দানকরিয়াথাকেন। তাহাই অধ্যাপকদিগের জীবিকানির্ব্বাহের একমাত্র উপায়। তদ্দ্বারা তাঁহারা কথঞ্চিৎ পরিবারদিগের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহকরিতে পারিলেই কৃতার্থম্মন্য হইয়া অভিলষিতকার্য্যে চিরজীবন যাপন করেন। অতএব আমাদের ব্রাহ্মণপণ্ডিতমহাশয়দিগের ন্যায় শ্লাঘ্যকর্ম্মা ও উদারাশয় পণ্ডিত কোন্‌জাতির মধ্যে কত আছেন? যদিও উৎসাহবিরহাদি নানাকারণে এক্ষণে সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিত নির্দ্দিষ্টব্যবসায়ে নির্লিপ্ত থাকিতে পারেননা, তথাপি সাধারণ্যে ঐ শ্রেণীস্থ লোকের উপরে প্রাচীন ও নব্য উভয়তন্ত্রেরই কৃতবিদ্য বিজ্ঞলোকদিগের অদ্যাপি বিলক্ষণ গৌরববুদ্ধি আছে; যেহেতু তাঁহারা, আপনাদিগের মধ্যে একদল ঐরূপ মহেচ্ছ লোক আছেন, এজন্য ভিন্নজাতীয়দিগের নিকট গর্ব্বকরিয়া থাকেন;—কিন্তু পাঠকগণ! দেখুন, হিন্দুজাতির গৌরবস্থল সেই ব্রাহ্মণপণ্ডিতমহাশয়দিগের প্রতি টেক্‌চাঁদবাবু কিরূপ বিদ্রোচিত বাক্যপ্রয়োগ করিয়াছেন! তিনি বাবুরামের শ্রাদ্ধবর্ণনপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"দিন রাত্রি ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও অধ্যাপকের আগমন, যেন গো-মড়কে মুচির পার্ব্বণ।" !!—কেবল ব্রাহ্মণপণ্ডিতের উপরেই কেন? ব্রাহ্মণজাতির প্রতিই টেক্‌চাঁদবাবুর যেন কিছু বিদ্বেষ আছে বোধহয়, যেহেতু তিনি আগড়পাড়াস্থ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগোষ্ঠীর

বর্ণনায় লিখিয়াছেন "বামুনে বুদ্ধি প্রায় বড় মোটা—সকল সময়ে সব কথা তলিয়া বুঝিতে পারে না—ন্যায়শাস্ত্রের ফেঁকৃড়ি পড়িয়া কেবল ন্যায়শাস্ত্রীয় বুদ্ধি হয়" ইত্যাদি—এক্ষণে টেকচাঁদবাবুর প্রতি আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে, ন্যায়শাস্ত্র বোঝা কি মোটাবুদ্ধির কর্ম্ম? এপর্য্যন্ত ঐ 'মোটাবুদ্ধি' ব্রাহ্মণভিন্ন কয়জন সরুবুদ্ধি ইতরজাতীয়লোকে ন্যায়শাস্ত্র বুঝিতে পারিয়াছেন? এদেশে ব্রাহ্মণেরাই চিরকাল শাস্ত্রচর্চ্চা ও বুদ্ধির পরিচালনা করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের সন্তানেরা, সাধারণ্যে, অপরিশীলিতবুদ্ধি অন্যান্য জাতীয়দিগের সন্তানগণ অপেক্ষা অধিক মোটাবুদ্ধি হইবেন, তাহা সম্ভব নহে।

এক্ষণে এই পুস্তকের ভাষাবিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। ইতিপূর্ব্বে যে সকল বাঙ্গালা পুস্তক রচিত হইয়াছে, তাহাদের ভাষা অপেক্ষা ইহার ভাষা কিছু স্বতন্ত্ররূপ;—সাধারণ লোকে সচরাচর যেরূপ ভাষায় কথোপকথন করে, এই পুস্তকের অধিক ভাগই সেইরূপ গ্রাম্য ভাষায় লিখিত। পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ অগ্রে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—যথা—

"শ্যামের নাগাল পালাম না গো সই—ওগো মরমেতে মরে রই"—টক্—টক্—পটাস্—পটাস্, মিয়াজান গাড়োয়ান এক এক বার গান করিতেছে—টিট্‌কারি দিতেছে ও শালার গোরু চল্‌তে পারেনা বলে লেজ মুচ্‌ড়াইয়া সপাৎ সপাৎ মারিতেছে। একটু একটু মেঘ হইয়াছে—একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে—গোরু দুটা হন্ হন্ করিয়া চলিয়া একখানা ছক্‌ড়া গাড়ীকে পিছে ফেলিয়া গেল। সেই ছক্‌ড়ায় প্রেমনারায়ণ মজুন্দার যাইতেছিলেন—গাড়ীখানা বাতাসে দোলে—ঘোড়া দুটা বেটো ঘোড়ার বাবা—পক্ষিরাজের বংশ—টংয়স্ টংয়স্ ডংয়স্ ডংয়স্ করিয়া চলিতেছে—পটাপট্, পটাপট্, চাবুক পড়িতেছে কিন্তু কোনক্রমেই চাল্ বেগড়ায় না।" ইত্যাদি।

এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, গ্রন্থরচনায় এইরূপ ভাষা অবলম্বনকরা ভাল? কি বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারাদিপ্রবর্ত্তিত ভাষা গ্রহণকরা ভাল?—এ প্রশ্নের মীমাংসা করা কিছু কঠিন। কারণ লোকের রুচিই এ বিষয়ের প্রমাণ—সকল লোকের যাহা ভাল লাগিবে, তাহাকে অবশ্যই ভাল

বলিতে হইবে। দেখাযাইতেছে যে, এইরূপ ভাষার রচনাই এক্ষণে অনেক লোকের অধিক প্রীতিপ্রদ হইতেছে, এবং সেই জন্যই এইরূপ ভাষায় অনেকগুলি পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে এবং দিন দিন তাদৃশ পুস্তকের সঙ্খ্যাবৃদ্ধি হইতেছে। ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহ এবম্বিধ ভাষাতেই 'হুতোম্‌পেঁচার নক্‌সা' প্রণয়নকরিয়া সমাজে যথেষ্ট যশোলাভ করিয়াছিলেন। আজি কালি শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যে সকল উপাখ্যান-পুস্তক লোকে আদরপূর্ব্বক পাঠকরিয়াথাকে, সে সকলেরও ভাষা কিয়ৎপরিমাণে প্রায় এইরূপ। অতএব এই ভাষা সাধারণ লোকের কতক মনোরঞ্জন করিয়াছে, বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সর্ব্ববিধগ্রন্থরচনায় এইরূপ ভাষা আদর্শস্বরূপ হইতেপারে কি না?—আমাদের বিবেচনায় কখনই না। হুতোমপেচা বল, মৃণালিনী বল—পত্নী বা পাঁচজন বয়স্যের সহিত পাঠকরিয়া আমোদ করিতে পারি—কিন্তু পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিতমুখে কখনই ও সকল পড়িতে পারিনা। বর্ণনীয়বিষয়ের লজ্জাজনকতা উহা পড়িতে না পারিবার কারণ নহে; ঐ ভাষারই কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজনসমক্ষে উচ্চারণকরিতে লজ্জাবোধ হয়। পাঠকগণ! যদি আপনাদের উপর বিদ্যালয়ের পুস্তকনির্ব্বাচনের ভার হয়, আপনারা আলালীভাষায় লিখিত কোন পুস্তককে পাঠ্যরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন কি?—বোধহয়, পারিবেন না। কেন পারিবেন না?—ইহার উত্তরে অবশ্য এই কথা বলিবেন যে, ওরূপ ভাষা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ নয় এবং উহা সর্ব্বসমক্ষে পাঠকরিতে লজ্জা বোধহয়। অতএব বলিতে হইবে যে, আলালী ভাষা সম্প্রদায়বিশেষের বিশেষ মনোরঞ্জিকা হইলেও উহা সর্ব্ববিধ পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত নহে। যদি তাহা না হইল, তবে আবার জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, ঐরূপ ভাষায় গ্রন্থরচনাকরা উচিত কি না?—আমাদের বোধে অবশ্য উচিত। যেমন ফলারে বসিয়া অনবরত

মিঠাই মণ্ডা খাইলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত হইয়াযায়—মধ্যে মধ্যে আদার কুচি ও কুমড়ার খাট্টা মুখে না দিলে সে বিকৃতির নিবারণ হয়না, সেইরূপ কেবল বিদ্যাসাগরী রচনা শ্রবণে কর্ণের যে একরূপ ভাব জন্মে, তাহার পরিবর্ত্তনকরণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা শ্রবণ-করা পাঠকদিগের আবশ্যক। ফলকথা এই যে, পাঠক যেমন নানা-প্রকার, তাঁহাদের রুচিও সেইরূপ নানাপ্রকার; একবিধ রচনাপাঠে সর্ব্ববিধ পাঠকদিগের রুচি চরিতার্থ হওয়া কোনমতেই সম্ভাবিত নহে—অতএব ভাষার মধ্যে নানাপ্রকার রচনারীতি থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। যাহাহউক আমাদের বিবেচনায় হাস্যপরিহাসাদি লঘু-বিষয়ের বর্ণনায় আলালী ভাষা যেরূপ মনোহারিণী হয়, শিক্ষাপ্রদ বা প্রগাঢ় গুরুতর বিষয়ের বিবরণকার্য্যে বিদ্যাসাগরী ভাষা সেইরূপ প্রীতিপ্রদা হয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটী গুরুতর বিষয়ের কথা আমাদের মনে উদিত হইল। কিয়দ্দিন অতীত হইল সিবিল সর্বিস্ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত জন্ বীম্‌স সাহেব বাঙ্গালা ভাষাবিষয়ে একখানি ইঙ্গরেজিপুস্তিকা প্রচারকরিয়াছেন। তিনি ঐ পুস্তিকায়, বঙ্গভাষার পুস্তকরচনাবিষয়ে একটী প্রস্তাব করিয়াছেন। সে প্রস্তাবের স্থূল তাৎপর্য্য এই—

'এক্ষণে দুই দল লোক বাঙ্গালার পুস্তক রচনাকরিতেছেন, তন্মধ্যে একদল প্রচুর সংস্কৃতশব্দ ব্যবহারকরেন এবং অপর দল ইতর ও চলিত ভাষা পুস্তকমধ্যে নিবেশিত করেন। অতএব ঐরূপ দলাদলী ভাব না থাকিয়া যাহাতে বাঙ্গালা ভাষা প্রণালীবদ্ধ হইয়া একরূপ দাঁড়ায়, তদ্বিষয়ে ব্যবস্থাকরা কর্ত্তব্য। তিনি এই প্রসঙ্গে ইউরোপের নানা-দেশীয় সাহিত্য সমাজের ইতিবৃত্তের উল্লেখকরিয়া পরিশেষে লিখিয়া-ছেন যে, বাঙ্গালাসাহিত্যের ভাষানির্ণয়ের জন্য একটী সভা করা আব-শ্যক। ঐ সভাহইতে যে অভিধান প্রকাশিত হইবে, তাহার অনন্ত-র্গত কোন শব্দ বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রযুক্ত হইতে পারিবেনা, এরূপ নিয়মকরা কর্ত্তব্য'—ইত্যাদি।

বীম্‌স সাহেব ভিন্নদেশীয় হইয়া আমাদের ভাষাব্যবস্থাপনের জন্য যে, এত যত্নশীল হইয়াছেন, তদর্থ তাঁহাকে আমরা শতবার ধন্যবাদ দিই। কিন্তু তিনি যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে আমরা অনুমোদন করিতেপারিনা। বাঙ্গালাকে সংস্কৃতভাষা করিয়া না তুলিয়া এবং উহার মধ্যে রূঢ়, স্থানীয় ও অশ্লীল শব্দসকল প্রবেশ করিতে না দিয়া মাঝামাঝিরূপে রচনার ব্যবস্থাকরা কর্ত্তব্য; তিনি উক্ত পুস্তিকামধ্যেই নিজের, এই যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা আমরা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি, কিন্তু সেই ব্যবস্থাকরণার্থ সভা ও অভিধান প্রস্তুত করিয়া গ্রন্থকারদিগের হস্তপদবন্ধন করিয়া দেওয়া আবশ্যক বোধকরিনা; যেহেতু সময়ের গতি ও সমাজের রুচি অনুসারে আপনাহইতেই সেরূপ ব্যবস্থা হইয়া উঠিবে—অথবা উঠিবেই কেন, কতকদূর উঠিয়াওছে। এক্ষণে সংস্কৃতজ্ঞ উৎকৃষ্ট লেখকেরাও দীর্ঘসমাস-সমন্বিত বাক্যরচনা প্রায় করেননা, এবং অভিমত অর্থের প্রতিপাদক সাধুশব্দ না পাইলে তত্তৎস্থলে অপর ভাষাও গ্রহণ করিয়া থাকেন—এদিকে আলালীভাষার পক্ষপাতীদিগেরও অনেক ভাললোকে এখন বুঝিতেছেন যে, চলিত গ্রাম্যভাষা কখন পুস্তকের ভাষা হইতে পারেনা এবং সে ভাষায় পুস্তকরচনা করিলে তাহা বিজ্ঞসমাজে সম্যক্ প্রশংসা পায় না। ফলকথা যখন্ এইরূপে আপনা হইতেই ভাষার স্থায়িরূপ আকার দণ্ডায়মান হইতেছে, তখন্ আর তদর্থ নিয়মস্থাপনের প্রয়োজন কি?—আর করিলেইবা স্বাধীনরুচি বিজ্ঞ-লেখকেরা আপনাদের অনভিমত বোধ করিলে কেন তাহা প্রতিপালন করিবেন?—তবে রাজশাসন হয়, সে ভিন্ন কথা—কিন্তু এজন্য রাজ-শাসন হওয়াও বড় বিড়ম্বনার বিষয়।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বাঙ্গালা 'সাহিত্যে'র নিমিত্ত কোন নিয়ম নির্দ্ধারিত না হউক ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, পদার্থবিদ্যা জ্যোতিষ, দর্শন, রসায়ন, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র,

যন্ত্রবিজ্ঞান প্রভৃতি ইঙ্গরেজিগ্রন্থে যে সকল বাচক, লাক্ষণিক বা পারিভাষিক শব্দ প্রযুক্ত আছে, বাঙ্গালাভাষায় সেগুলিকে আনিয়া ব্যবহার করিবার জন্য একটী নিয়মস্থাপন করা কর্ত্তব্য। আমাদের বিবেচনায় সংস্কৃতগ্রন্থে যতদূর পাওয়াযায়, তাহা অবিকল লইয়া এবং যাহা না পাওয়াযায়, সরল ও সুসঙ্গতভাষায় সুবিজ্ঞলোকদিগের দ্বারা তাহা অনুবাদিত করিয়া একখানি অভিধান প্রস্তুত করা আবশ্যক। তাহা হইলে ঐ সকল বিষয়ে যাঁহারা গ্রন্থরচনা করিবেন, তাঁহাদিগের যথেষ্ট সুবিধা হইবে এবং ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকারেরা আপনাদিগের অভি-প্রায়ানুসারে ভিন্ন ভিন্নরূপে সঙ্কলিত নূতন নূতন শব্দের প্রয়োগ করায়, সে সকল বুঝিবার জন্য পাঠকদিগের যে ক্লেশ ও অসুবিধা হয়, তাহাও সম্পূর্ণরূপে অপগত হইবে।

টেক্‌চাঁদঠাকুরপ্রণীত অপর পুস্তকগুলির মধ্যে আর কোনখানিই আলালেরঘরের দুলালের সমান প্রীতিপদ হয় নাই। কিন্তু সকল-গুলিই আলালীভাষায় লিখিত। তাঁহার ২য় পুস্তক 'মদখাওয়া বড়দায় জাত থাকার কি উপায়'। ইহাতে পরস্পর অসম্বদ্ধ কয়েকটী মাত-লামী ও বথামীর গল্পমাত্র আছে। তৎপাঠে বিশেষ কোন লাভ নাই। তাঁহার তৃতীয় পুস্তক রামারঞ্জিকা। ইহাতে পতি ও পত্নীর কথোপকথনচ্ছলে এমত সকল বিষয়ের বিবরণ আছে, যাহা পাঠ করিলে আমাদের স্ত্রীলোকেরা সাংসারিক অনেক বিষয়ে অনেক উপদেশলাভ করিতে পারেন। কিন্তু ঐ সকল কথার মধ্যে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদির সংস্কৃতবচন সমস্ত উদ্ধৃত করিয়া মনঃসংযম মোক্ষ প্রভৃতির যে সকল উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা সঙ্গত বোধহইল না। কারণ উপদেশ্যা পদ্মাবতীকে উক্তরূপ উপদেশের বোধসমর্থা বিদুষী বলিয়া পূর্ব্বে বর্ণনকরা হয়নাই। গ্রন্থকার হরিহর ও পদ্মা-বতীর উক্তি প্রত্যুক্তিতেই গ্রন্থ চালাইতেছিলেন কিন্তু অকস্মাৎ ১৮শ অধ্যায় হইতে "আমার পিতা সৌদাগরী কর্ম্ম করিতেন" ইত্যাদি

বলিয়া যে তিন ব্যক্তির জীবনবৃত্ত বর্ণন করিয়াছেন, কি সঙ্গতিক্রমে সে স্থলে সেগুলির অবতারণা করা হইল, তাহা আমরা কিছুই বুঝিলাম না! ।

টেকচাঁদের ৪র্থ পুস্তক গীতাঙ্কুর। ইহাতে ব্রহ্মবিষয়ক অনেকগুলি গীত আছে—নিম্নভাগে তাহার একটী উদ্ধৃত হইল—

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়া।

"বিপদ কে বলে বিপদ। বুঝিলে বিপদ নহে প্রকৃত সম্পদ॥
তুমি হে প্রেম-আধার, প্রেম করহ বিস্তার, চরমে হবে নিস্তার, এ জন্য বিপদ॥
কত রাগ কত দ্বেষ, অহঙ্কার অশেষ, পাপের দারুণ ক্লেশ বাড়ায় সম্পদ॥
বিপদে ঔষধ ধন, মন করি সংশোধন, করিয়া পাপনিধন, দেয় নিরাপদ।
তুমি হে মঙ্গলায়ন, এ পামরে কর ত্রাণ, বিপদে সম্পদে যেন, ভাবি ঐ পদ॥"

'যৎকিঞ্চিৎ' নামক পুস্তক ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অবিনাশিত্ব, পরলোক ও উপাসনা প্রভৃতিবিষয়ক। ইহা এবং 'অভেদী' এ দুই খানিই একপ্রকার ধর্ম্মসংক্রান্ত পুস্তক—সাহিত্যগ্রন্থ নহে, সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের কিছু বক্তব্য নাই।

দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি।

শ্রীযুক্তবঙ্কিমচন্দ্রচট্টোপাধ্যায় দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ, আনন্দমঠ, দেবী-চৌধুরাণী প্রভৃতি কযেকখানি আখ্যায়িকা রচনাকরিয়াছেন। ইনি চুঁচুড়ার পরপারস্থ কাঁঠালপাড়া গ্রামে ১৭৬০ শকে [১৮৩৮ খৃঃ অঃ] জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা ৺যাদবচন্দ্রচট্টোপাধ্যায় বহুকাল ডেপুটী কালেক্টরী কার্য্য করিয়া অনেককাল পেন্সনভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার ৪ পুত্রের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র তৃতীয়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে বহুদিন হুগলীর মহম্মদ্ মসীন্

কালেজে অধ্যয়ন করিয়া পরিশেষে কলিকাতা প্রেসিডেন্সিকালেজে প্রবেশপূর্ব্বক তথায় বি, এ, পাস করেন—তৎপরে বি, এল, উপাধিও প্রাপ্ত হইয়াছেন। কালেজে অবস্থানকালেই ইনি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হয়েন, এবং তদবধি এ পর্য্যন্ত—অবশ্য উন্নতির সহিত—সেই পদেই প্রতিষ্ঠিত আছেন।

কালেজে পঠদ্দশার সময় হইতেই বঙ্কিমবাবুর বাঙ্গালারচনায় অনুরাগ ছিল, এজন্য মধ্যে মধ্যে পদ্য লিখিয়া প্রভাকরাদি সংবাদপত্রে প্রকাশকরিতেন। ঐ অবস্থায় 'ললিতা মানস' নামে একখানি ক্ষুদ্র পদ্য পুস্তকও মুদ্রিত করিয়াছিলেন। সেখানি এখন্ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। এই পুস্তকপ্রকাশের পর অনেকদিন পর্য্যন্ত তিনি কোন বাঙ্গালারচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। তৎপরে ১৮৬৪ খৃঃ অব্দ হইতে আরম্ভকরিয়া এপর্য্যন্ত পূর্ব্বোল্লিখিত পুস্তকগুলি রচনাকরিয়াছেন। তন্মধ্যে সময় ও গুণ উভয়েই দুর্গেশনন্দিনীই প্রথম।

দুর্গেশনন্দিনী, একটী ঐতিহাসিক উপন্যাস। গড়মান্দারণ নামক গ্রামের কোনদুর্গে পূর্ব্বকালে বীরেন্দ্রসিংহ নামা এক জায়গীরদার আধিপত্য করিতেন। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া হীনবংশীয়া এক কামিনীর পাণিগ্রহণ ও তাঁহার গর্ভে এক কন্যা উৎপাদন করায় নিজ পিতা কর্তৃক অবমানিত হইয়া গৃহত্যাগ করেন এবং দিল্লীর মোগল সম্রাট্‌দিগের রাজপুতসেনামধ্যে নিবিষ্ট থাকিয়া খ্যাতিপ্রতিপত্তি লাভ করেন। তিনি স্বগ্রামে যে কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে উক্ত স্থানস্থ শশিশেখর নামক এক ব্রাহ্মণের উপপত্নী-গর্ভজা। শশিশেখর ঐ উপপত্নীগ্রহণ জন্য লজ্জায় দেশত্যাগীহইয়া বারাণসীতে গমনপূর্ব্বক তত্রত্য এক দণ্ডীর নিকট বহুদিন শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তথায়ও এক শূদ্রার গর্ভে কন্যা উৎপাদনকরায় গুরুকর্তৃক অবমানিতহইয়া কিয়ৎকাল নিরুদ্দেশ ছিলেন। পরে পরমহংস হইয়া 'অভিরামস্বামী' এই পরিবর্ত্তিত নামে দিল্লীতে প্রকা-

শিত হইলে তাঁহার শূদ্রাগর্ভজা কন্যা বিমলা তথায় গিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্তা হইয়াছিল। ঐ স্থানে অভিরামস্বামীর কৌশলে ও রাজা মানসিংহের সহায়তায় বীরেন্দ্রসিংহ বিপাকে পড়িয়া বিমলার পাণিগ্রহণ করেন, এবং পিতৃবিয়োগের সংবাদ পাইয়া তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে গ্রহণপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগত হয়েন। তথায় তাঁহার প্রথমপত্নীগর্ভজা মাতৃহীনা কন্যা তিলোত্তমা বিমলাকর্ত্তৃকই প্রতি-পালিত হইয়া ক্রমে যৌবনদশায় পদনিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময়ে মোগল ও পাঠানদিগের যুদ্ধারম্ভ হওয়ায় রাজা মানসিংহ সসৈন্যে ঐ প্রদেশে গমনকরিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পুত্র জগৎসিংহ পাঠান-পরাজয়কার্য্যে নিযুক্তহইয়াছিলেন। তিনি ঘটনাক্রমে এক রজনীতে গড়মান্দারণের সমীপস্থ প্রান্তরমধ্যগত দেবমন্দিরে ঐ বিমলা ও তিলোত্তমাকে দর্শনকরেন এবং দর্শনক্ষণ হইতেই তিলোত্তমা ও রাজ-কুমারের পূর্ব্বরাগসঞ্চার হয়। রাজকুমার ঐ সমরকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও অতিরাগবশতঃ, বিমলার সহকারিতায় এক গুপ্তদ্বার দিয়া বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক, তিলোত্তমার সমীপস্থ হয়েন। ঐ সময়েই পাঠানরাজ কতলুখাঁর সেনাপতি ওস্‌মান সুযোগ পাইয়া সসৈন্য দুর্গমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বীরন্দ্রসিংহ, বিমলা, জগৎসিংহ, তিলো-ত্তমাপ্রভৃতি সকল পরিবারকে বন্দীভূত করেন। বন্দীভাবের পর কতলুখাঁর আজ্ঞায় বীরেন্দ্রের শিরশ্ছেদ হয়; আহত জগৎসিংহ, ওস্‌মান ও কতলুখাঁর দুহিতা আয়েষার যত্ন ও শুশ্রূষায় আরোগ্য-লাভ করেন; বিমলা পতিহন্তা কতলুখাঁর প্রাণবধ করিয়া পলায়ন-করেন; মোগলপাঠানের সন্ধি হয়; এবং তিলোত্তমার সহিত জগৎ-সিংহের বিবাহ হয়—দুর্গেশনন্দিনীস্থ উপাখ্যানের স্থূলতাৎপর্য্য এই। কিন্তু এই তাৎপর্য্যমাত্রশ্রবণে দুর্গেশনন্দিনী কিরূপ পদার্থ, তাহা পাঠকেরা কিছুই বুঝিতেপারিবেননা, অতএব আমরা অনুরোধ করি তাঁহারা ঐ গ্রন্থখানি একবার আদ্যোপান্ত পাঠকরুন।

অভিরামস্বামী, বীরেন্দ্রসিংহ, জগৎসিংহ, ওস্মান, তিলোত্তমা, আয়েষা ও বিমলা এই কয়েকজনই এই আখ্যায়িকার প্রধান পাত্র। অভিরামস্বামী বোধহয়, ভূদেবমুখোপাধ্যায়ের অঙ্গুরীয়বিনিময়স্থ রামদাসস্বামীর অনুজ হইবেন। ইনি যৌবনদশায় যেরূপ থাকুন, প্রৌঢ়াবস্থায় বিলক্ষণ বিজ্ঞবিচক্ষণ হইয়াছিলেন। ইহাঁরই পরামর্শে মোগল পাঠানের যুদ্ধসময়ে মোগলের পক্ষ অবলম্বনকরিতে বীরেন্দ্রসিংহের প্রবৃত্তি হয়। এই পরামর্শদানের পর ইহাঁর আর বড় সাড়া শব্দ পাওয়া যায়নাই—বীরেন্দ্রের বধকালে একবারমাত্র দেখাদিয়াছিলেন। তৎপরে ইনি কতলুখাঁর বধের জন্য বিমলার নিকট ছুরিকা প্রেরণকরেন, এবং তিলোত্তমার পীড়ার সময়ে রাজপুত্রকে আনাইয়া তাঁহার মন আর্দ্র করেন এবং তিলোত্তমার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। বিমলাকে বীরেন্দ্রসিংহে অর্পিতকরিবার সময়ে ইহাঁর যেরূপ বুদ্ধিকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছিল, অপর কোন স্থলে সেরূপ হয়নাই—অতএব আমাদের বিবেচনায় বুদ্ধিকৌশলে ইনি পূর্ব্বোলিখিত রামদাসস্বামীর তুল্য লোক নহেন।

বীরেন্দ্রসিংহ উদ্ধতস্বভাব মহাবীর। এগ্রন্থে তাঁহার অধিক কার্য্য বর্ণিত নাই। কতলুখাঁর সভায় প্রাণদণ্ডাজ্ঞার সময়ে তাঁহার সাহস, তেজস্বিতা, মৃত্যুভয়শূন্যতা, দৃপ্ততা প্রভৃতি যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ক্ষত্রিয়বীরের একান্ত অনুরূপ।—গ্রন্থের নায়ক জগৎসিংহ নবীনবয়স্ক, বুদ্ধিমান্, তেজস্বী, ধার্ম্মিক, সাহসিক ও প্রেমিক লোক। তিনি আখ্যায়িকামধ্যে আদ্যোপান্ত উপস্থিত থাকিয়া কত কার্য্য করিয়াছেন, তাহার সঙ্খ্যা নাই, সুতরাং সে সমুদয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উল্লেখকরা বাহুল্য। তবে একথা বলিতেপারি যে, জগৎসিংহের ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্যকলাপ, মহাকুলসম্ভূতোচিত তেজস্বিতা প্রভৃতির কোথাও কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়নাই। তিনি কারাগার মধ্যে উপস্থিতা তদ্গতজীবিতা তিলোত্তমাকেও যে, অননুরাগসূচকবাক্যে ব্যথিত করিয়া-

ছিলেন, তাহাও অনুচিত হয়নাই। কারণ তিনি তৎপূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন, তিলোত্তমা কতলুখাঁর উপপত্নী হইয়াছেন। এ কথাশ্রবণের পর তিলোত্তমার প্রতি তাঁহার পূর্ব্বভাব থাকা সম্ভব নহে।—আয়েষা পরমসুন্দরী, বুদ্ধিমতী, অসাধারণগুণশালিনী, যুবতী রাজকন্যা। তিনি বিপৎসময়ে রাজপুত্রের যেরূপ শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাহা না করিলে হয়ত তাঁহার আরোগ্যলাভই দুর্ঘট হইত; কিন্তু সেই আয়েষাও মুক্তকণ্ঠে অনুরাগপ্রকাশ করিলেও রাজপুত্রের মনে তাঁহার প্রতি এক নিমেষের জন্যও অন্যভাব জন্মেনাই; ইহা নায়কের পক্ষে সাধারণ গুণ নহে। ফলতঃ তিনি না বুঝিয়া তিলোত্তমার প্রতি যেরূপ ব্যবহারই করুন না কেন, তাঁহার প্রতি তিলোত্তমার সেই প্রগাঢ় অনুরাগ কোনমতে অপাত্রে ন্যস্ত হয়নাই।

গ্রন্থকার কতলুখাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও সেনাপতি ওস্মানকে কেবল মুখে 'পাঠানকুলতিলক' বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, তাহা নহে—সত্য সত্যই তাঁহাকে পাঠানকুলতিলক করিয়াতুলিয়াছেন। গড়মান্দারণের দুর্গে প্রবেশ করিয়া একাকিনী বিমলার সহিত তাঁহার কথোপকথন, বন্দীভূত আহত রাজপুত্রের প্রতি তাদৃশ সদয় ব্যবহার, আপনার মনোরথপ্রিয়া আয়েষা করতলগত শত্রুর প্রতি অনুরক্তা হইয়াছে, বুঝিয়াও স্থিরভাবে তাহা সহ্যকরা, সামর্থ্যসত্ত্বেও প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি অন্যরূপ অনিষ্টাচরণ না করিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাঁহাকে আহ্বান করা, পরাজয় হইলেও প্রাণরক্ষার্থ ক্ষমাপ্রার্থনা না করা প্রভৃতি ওস্মানের কৃত কার্য্যগুলির যে কোনটীর দিকে অনুধাবন করিয়া দেখাযায়, তাহাতেই তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির উদ্রেক হয়। পাঠানদিগের চরিত সচরাচর যেরূপ বর্ণিত হয়, তাহাতে ওস্মানের ঐ 'সমগ্র' উদার কার্য্য না দেখিয়া 'কতক' দেখিলেও তাঁহাকে পাঠানকুলতিলক বলাযাইতে পারিত।

গ্রন্থনায়িকা দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমা সুন্দরী, ধীরা, নবীনা, অনু-

রাগিণী নায়িকা। তিনি শৈলেশ্বরশিবমন্দিরে জগৎসিংহকে দেখিয়াই মুগ্ধ হয়েন, বাটীতে আসিয়া নির্জ্জনে অন্যমনস্ক হইয়া খাটের গাএ কালী দিয়া 'অ' 'ই' হিজিবিজি ও 'কুমার জগৎসিংহ' ইত্যাদি লেখেন এবং আর আর কত কর্ম্ম করিয়া পরিশেষে কারাগারে জগৎসিংহের নিকট উপস্থিত হয়েন। ঐ স্থানে তিলোত্তমার অবস্থা অতি মনোহররূপে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ নবীনা রাজকন্যা সুযোগ পাইয়া দুর্গহইতে বাহির হইয়াছিলেন, যেখানে যাইবার কথা ছিল তাহা ভুলিয়াগিয়াছেন, কিছুই মনে নাই, কেবল 'জগৎসিংহ' এই নাম মুখ হইতে নির্গত হওয়ায় সহচর তাঁহাকে পুনর্ব্বার দুর্গমধ্যে আনিয়া কারাগারে জগৎসিংহের গৃহদ্বারে উপস্থাপিত করিল। গৃহপ্রবেশে তিলোত্তমার পা সরে না, কথঞ্চিৎ প্রবেশ করিলেন, প্রাচীর ধরিয়া অধোবদনে দাঁড়াইলেন, জগৎসিংহ চিনিয়া 'বীরেন্দ্রসিংহকন্যা! এখানে কি অভিপ্রায়ে?' এই নিরনুরাগ শুষ্ক সম্ভাষণ করিলেন। শুনিয়া তিলোত্তমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল, মস্তক ঘুরিতে লাগিল ও মূর্চ্ছা হইল। আয়েষা আসিয়া তাঁহার মূর্চ্ছাপনয়ন করিলেন এবং তাঁহারই অনুমতিতে দাসীর স্কন্ধে ভর দিয়া তিলোত্তমা ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।—এই প্রকরণের বিবরণটী যে, কিরূপ স্বভাবসঙ্গত ও কিরূপ মধুর হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না—পাঠ মাত্র সমুদয় ব্যাপার যেন চিত্তপটে চিত্রিত হইয়া উঠে।

তিলোত্তমার বিষয়ে গ্রন্থকারের সহিত ৩টী স্থলে আমাদের কিঞ্চিৎ বিবাদ আছে। ১মতঃ তিলোত্তমা ও বিমলা সায়ঙ্কালে শৈলেশ্বর পূজা করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সন্ধ্যাসময়ে শিবপূজা করিতে যাওয়া আমাদের দেশে রীতি নাই; আর তাহা থাকিলেও বাহকেরা যে, ঝড়বৃষ্টি জন্য সেই প্রান্তরমধ্যে দুইটী স্ত্রীলোককে ফেলিয়া পলাইল, অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত প্রত্যাগত হইলনা! ইহা কিছু অসঙ্গত বোধহয়। ২য়তঃ—শিবমন্দিরে জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার দর্শনমাত্র পরস্পরের

মনে অনুরাগসঞ্চার হয়। সংস্কৃত কবিরা সর্ব্বদাই প্রায় এইরূপ অনুরাগের বর্ণন করিয়া থাকেন। সংস্কৃতকাব্য বঙ্কিমবাবুর আখ্যায়িকার আদর্শ নহে—তাঁহার আদর্শ ইঙ্গরেজি কাব্য। কিন্তু ইঙ্গরেজি-আখ্যায়িকানুরাগীরা আমাদিগের পুণ্ডরীকমহাশ্বেতাদির ন্যায় রূপ-দর্শনমাত্র সঞ্চরিত অনুরাগে 'পাশব অনুরাগ' (Animal love) বলিয়া দোষ দিয়া থাকেন, সুতরাং বঙ্কিমবাবুর ন্যায় ইঙ্গরেজিবিৎ লোকের গ্রন্থে সে দোষ সঙ্ঘটন হওয়া উচিত হয়নাই। ৩য়তঃ—এই পুস্তকের নায়কনায়িকা সাহেব বিবি নহেন—হিন্দু। হিন্দুদিগের সমান-বর্ণ ব্যতিরেকে অসমানবর্ণে বিবাহহওয়া তখন রীতি ছিলনা। সুতরাং জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার পরস্পর সমানবর্ণত্ব জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে অনুরাগসঞ্চার হওয়া এবং তিলোত্তমার প্রকৃত পরিচয় পাইবার অগ্রেও তাঁহার জন্য জগৎসিংহের সেই সেই রূপ মনোভাব প্রকাশ করা আমাদের বিবেচনায় সদ্‌যুক্তিসঙ্গত হয়নাই। কালিদাস এরূপ-স্থলে কিপ্রকার সাবধান হইয়াছেন, পাঠকগণ তাহা শ্রবণ করুন।—

রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার অলৌকিক রূপলাবণ্যাদিসন্দর্শনে মুগ্ধ হইলেন, তাঁহার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, অমনি তাঁহার মনে বিতর্ক উঠিল, পাছে এ ব্রাহ্মণকন্যা হয়! ক্ষণৈক পরে মনে মনেই সে তর্কের মীমাংসা হইল এবং স্থির করিলেন ——

অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা যদার্য্য মস্যা মভিলাষি মে মনঃ।
সতাংহি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণ মন্তঃকরণ-প্রবৃত্তয়ঃ॥

এইরূপ চিন্তার পর কিছুক্ষণ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন বটে; কিন্তু মনের সম্যক্ প্রীতি হইলনা। পরে যখন্ শকুন্তলাকে ক্ষত্রিয়কন্যা বলিয়া জানিতে পারিলেন, তখন্ আহ্লাদে গদ্গদ হইয়া কহিলেন——

ভব হৃদয় সাভিলাষং সম্প্রতি সন্দেহনির্ণয়ো জাতঃ।
আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্॥

আয়েষা যথার্থই দেবকন্যারূপিণী। ইহাঁর রূপ, গুণ, বুদ্ধি, বিবেচনা, উদারতা, ধৈর্য্য সকলই অলৌকিক। ইনি জগৎসিংহের

পীড়িতাবস্থায় অক্লান্তভাবে যেরূপ শুশ্রূষা করিয়াছিলেন—ওস্মান ইহাঁর পাণিগ্রহণাভিলাষী হইয়া অভিপ্রায় প্রকাশকরিলে যেরূপ উত্তর দিয়াছিলেন——জগৎসিংহের প্রতি পত্নীভাবে গাঢ়ানুরক্তা হইয়াও যেরূপে মনোভাব গোপনে রাখিয়াছিলেন——কারাগারে ওস্মানের কথায় অসহিষ্ণু হইয়া যেরূপ দৃপ্তভাবে তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন —রাজপুত্রে বিদায় লইবার সময়ে সাক্ষাৎকরণপ্রার্থী হইলে যে কারণে দর্শন দিতে অসম্মতা হইয়াছিলেন—তাঁহাকে যেরূপে পত্র লিখিয়াছিলেন—এবং তিলোত্তমার সহিত তাঁহার বিবাহসময়ে অলঙ্কারাদিপ্রদানপূর্ব্বক যেরূপ ভাব প্রকাশকরিয়াছিলেন—সে সমুদয় নিবিষ্টচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে মনোমধ্যে বিস্ময়, করুণা, ভক্তি ও আনন্দরসের প্রবাহ উচ্ছলিত হইয়াউঠে। অঙ্গুরীয়বিনিময়ের রোসিনারাও ইহাঁর ভগিনী বটেন, কিন্তু তাঁহা অপেক্ষা ইহাঁর সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও ধৈর্য্য অনেকগুণে অধিক।

এক্ষণে **বিমলা**—বিমলা যে, অভিরামস্বামীর কন্যা ও বীরেন্দ্রের ধর্ম্মপত্নী তাহা, বীরেন্দ্রের মৃত্যুর পূর্ব্বে সকলে জানিত না—প্রধান পরিচারিকাই বোধকরিত। বিমলা আখ্যায়িকার আদ্যোপান্ত সর্ব্বত্রই ভ্রমমাণা। তিনিই প্রথমে দেবমন্দিরে জগৎসিংহের সহিত কথা কহেন; তিনি মনোহরবেশে সুসজ্জিত হইয়া আস্মানীর দ্বারা বিদ্যাদিগ্‌গজের দুরবস্থা করিয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে গ্রহণপূর্ব্বক রজনীতে সেই দেবমন্দিরে যাইয়া জগৎসিংহের সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করেন; তিনিই জগৎসিংহকে গুপ্তদ্বার দিয়া তিলোত্তমার নিকট উপস্থিত করিয়া দেন; তাঁহারই অসাবধানতায় পাঠানদিগের কর্ত্তৃক দুর্গ অধিকৃত হয়; তাঁহারই পত্রে আখ্যায়িকাস্থ পাত্রগণের পরিচয়বিষয়ক সমুদয় অন্ধকার দূরগত হয় এবং তিনিই সুরা ও নৃত্যগীত দ্বারা কতলুখাঁর মন মোহিত করিয়া আলিঙ্গনসময়ে ছুরিকাদ্বারা তাঁহার প্রাণবধ করিয়া পতিবধপ্রতিহিংসার সাধন করেন। বিমলাকে তাদৃশ রূপবতী

বলিয়া বোধ না হউক, কিন্তু তাঁহার ন্যায় রসিকা, প্রমোদমানা, বিবেকবতী ও প্রত্যুৎপন্নমতি কামিনী অতি দুর্লভ। গ্রন্থের সর্ব্বত্রই তিনি প্রচুরপরিমাণে আপনগুণের পরিচয় দিয়াছেন; সে সমুদয়ের বিস্তৃতরূপে উল্লেখ করা বাহুল্য, সুতরাং আমরা পাঠকগণকে অন্ততঃ দুইটী স্থান অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠকরিতে অনুরোধ করি—যখন্ পাঠানসেনাপতি বিমলাকে ওড়না দ্বারা ছাদের আলিসার সহিত বাঁধিয়া রহিমখাঁর জিম্মায় দিয়াযান, তখন্ রহিমখাঁকে "সেখজী! তুমি বড় ঘামিতেছ, একবার আমার বন্ধন খুলিয়া দেও যদি, তবে আমি তোমাকে বাতাস করি; পরে আবার বাঁধিয়া দিও" ইত্যাদি সরস কথায় ভুলাইয়া মুক্তিলাভ করা—সেই এক স্থান—এবং যখন্ কতলুখাঁর জন্মতিথির রজনীতে মনোহরবেশধারিণী বিমলা কৌশলে তাঁহার বক্ষে ছুরিকা নিখাত করিয়া—"পিশাচী নই সয়তানী নই—বীরেন্দ্রসিংহের বিধবা স্ত্রী" এই বলিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করেন—সেই এক স্থান। অধিক কি, বিমলার চরিত গ্রন্থকার আদ্যোপান্তই এরূপ মনোহরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যে, উহাঁকেই সময়ে সময়ে গ্রন্থের নায়িকা বলিতে আমাদের ইচ্ছা হয়। ফলতঃ জগৎসিংহের সহিত রজনীতে সাক্ষাৎ করিবার জন্য মন্দিরে যাইবার পূর্ব্বে প্রকৃত অভিসারিকার ন্যায় তাদৃশ বেশভূষা করা এবং আস্‌মানীর দ্বারা বোকা বামণ বিদ্যাদিগ্‌গজকে উচ্ছিষ্টান্ন প্রভৃতি খাওয়াইয়া তাহার ততদূর দুরবস্থা করা এই দুইটী ভিন্ন বিমলার সমুদয় কার্য্যগুলিই আমাদের পরমপ্রীতিপ্রদ হইয়াছে।

দুর্গেশনন্দিনীর অন্তর্গত কয়েকটী পাত্রের চরিত যেরূপে সমালোচিত হইল, বোধ হয়, তাহাতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, এই আখ্যায়িকাখানি একটী মনোরম পদার্থ হইয়াছে, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছি। ইহা পাঠকরিতে আরম্ভ করিলে উত্তরোত্তর সমধিকপরিমাণেই কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। উপাখ্যানগ্রন্থের

ইহা একটী প্রধান গুণ। ইঙ্গরেজির নানাবিধ নবেল পুস্তক পাঠ করিয়া বঙ্কিমবাবু আপন পাত্রগণের অলঙ্কারসংগ্রহ করেন, এই কথা বলিয়া কেহ কেহ দোষারোপ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা রায় দীনবন্ধু মিত্রের নবীনতপস্বিনীর সমালোচনায় ব্যক্ত করিয়াছি যে, সেরূপ করা আমাদের বিবেচনায় গুণ বৈ দোষ নহে। এস্থলে কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, দুর্গেশনন্দিনীস্থ কোন কোন পাত্রের অনেক অস্থি মাংস প্রসিদ্ধ সর্ ওয়ালটর স্কটের 'আইবান হো' নামক ইঙ্গরেজি নবেল হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে; কিন্তু আমরা বিশ্বাস্য ব্যক্তি বিশেষের মুখে শুনিয়াছি, বাস্তবিক তাহা নহে। দুর্গেশনন্দিনী— রচনার পূর্ব্বে বঙ্কিম বাবু আইবান হো পাঠই করেন নাই।

এই গ্রন্থের ভাষা চলিত বটে, কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত আলালীও সম্পূর্ণ নহে—তদপেক্ষা উন্নত ও মধুর। ইহার রচনায় যে একটী নূতন-বিধ ভঙ্গী আছে, ইহার পূর্ব্বকালীন কোন বাঙ্গালা পুস্তকে সে ভঙ্গীটী দেখিতে পাওয়াযায়নাই। সেটী ইঙ্গরেজির অনুকরণ হইলেও বিলক্ষণ মধুর। কিন্তু এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, গ্রন্থকার স্বয়ং, বর্ণিত পাত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া মধ্যে মধ্যে যে, অত অধিক বাক্-প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা আমাদের মিষ্ট লাগে না—বরং তদ্দ্বারা স্থানে স্থানে রসভঙ্গ হইয়াছে বোধহয়। আমাদিগের মতে, তুমি গ্রন্থকার!—

"রহস্যঞ্চ প্রকাশঞ্চ যদ্‌বৃত্তং তস্য ধীমতঃ।
রামস্য সহ সৌমিত্রে রাক্ষসানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
বৈদেহ্যাশ্চৈব যদ্‌বৃত্তং প্রকাশং যদিবা রহঃ।
তচ্চাপ্যবিদিতং সর্ব্বং বিদিতং তে ভবিষ্যতি॥"

ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক দত্তবর বাল্মীকির ন্যায় কোন দৈবশক্তিবলে তোমার পাত্রগণের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সমুদয় ভাব অবগত হইতে পারিয়াছ—সুতরাং তুমি সেইগুলি অবিকল মুখে ব্যক্ত করিবে মাত্র— তুমি তাহাদের সহিত কথা কহিতে যাইবে কেন?—তাহারা কোন্

কালের লোক—তুমি কোন্‌কালের লোক! যাত্রাস্থলে প্রহ্লাদের যথার্থ উদ্যতখড়্গা দ্বারীকে যদি পোলিসের সার্জ্জন গ্রেফ্‌তার করিতে যায়, তবে কেমন দেখায়?

আমরা প্রথম সংস্করণে দুর্গেশনন্দিনীর ভাষাগত কতিপয় দোষের প্রদর্শন করিয়াছিলাম এবং আশা করিয়াছিলাম যে, পুনঃসংস্করণে সেগুলি সংশোধিত হইবে। কিন্তু সপ্তম সংস্করণেরও পুস্তক দেখিলাম, সে সকল দোষ তদবস্থই রহিয়াছে! বঙ্কিম বাবুর পুস্তকগুলি বাঙ্গালা-সাহিত্য-সাগরের উজ্জ্বল রত্ন—সে সকল রত্নকে ওরূপ কীটানুবিদ্ধ দেখিলে আমাদের ক্লেশবোধ হয়। আমরা এবারে সে সকল দোষের আর পুনরুল্লেখ করিলাম না, কিন্তু বঙ্কিম বাবুকে অনুনয় করিতেছি, তিনি ঐরূপ দোষসকলের সংশোধন করিয়া আমাদের ক্লেশ দূর-করুন।

কপালকুণ্ডলা (২য় সংস্করণ)—২৫০ বৎসর গত হইল গঙ্গা-সাগর হইতে প্রত্যাগমনকারী নবকুমার নামক এক ব্রাহ্মণযুবক ঘটনা-ক্রমে একাকী হিজলীর সমুদ্রকূলে পরিত্যক্ত হইয়া এক কাপালিকের আশ্রয় গ্রহণকরেন। কাপালিক আপন যোগসিদ্ধির বাসনায় তাঁহাকে বলি দিবার উদ্যোগ করিলে—কাপালিকেরই প্রতিপালিতা কপাল-কুণ্ডলানাম্নী এক পরমরূপবতী রমণী তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন। নব-কুমার অনূঢ়া সেই প্রাণদাত্রীকে বিবাহ করিয়া সমভিব্যাহারে গ্রহণ-পূর্ব্বক নিজবাসস্থান সপ্তগ্রামের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথি-মধ্যে মতিবিবি নামে এক যুবতী যবনীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। মতি-বিবি বাস্তবিক ব্রাহ্মণকন্যা এবং নবকুমারেরই পূর্ব্বপরিণীতা পত্নী। মুসলমানদিগের উৎপীড়নে উঁহার পিতা সপরিবারে মুসলমানধর্ম্মা-বলম্বী ও জাতিভ্রষ্ট হইয়া আগ্‌রায় গিয়া বাস করিয়াছিলেন, তথায় রূপলাবণ্যসম্পন্না মতিবিবি বাদসাহপুত্র প্রভৃতি আগ্‌রার অনেক আমীর ওম্‌রার সহিত দূষিতচরিতা হইয়া বিস্তর ধন ও গৌরব লাভ-

করে। এই সময়ে সে নিজের কোন দুরভিসন্ধিসাধনার্থ উড়িষ্যা গিয়াছিল—তথা হইতে প্রত্যাগমন সময়ে পথিমধ্যে নবকুমারের সাক্ষাৎ ও পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি গাঢ়ানুরাগা হইয়া পড়ে; কিন্তু তৎকালে সে ভাব প্রকাশ না করিয়া গন্তব্য স্থানে গমন করিল। নবকুমারও সপ্তগ্রামে আসিয়া পত্নীসহবাসে কিছুকাল যাপন করিলেন। মতিবিবির ইচ্ছা ছিল, জাহাঙ্গীর বাদসাহ হইলে সে তাঁহার প্রধান মহিষী হইবে; সে অভিলাষ সিদ্ধ না হওয়ায় আপন পূর্ব্বস্বামীর সহবাসে কালযাপন করিবার অভিলাষে সপ্তগ্রামে আসিল, এবং রূপ গুণ ধন রত্ন প্রভৃতি দ্বারা নবকুমারের মন ভুলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু যখন্ কোনরূপে কৃতকার্য্য হইল না, তখন্ কপালকুণ্ডলার অনিষ্টসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল। ঐ সময়ে হিজলীর কাপালিকও সন্ধান করিয়া কপালকুণ্ডলার অমঙ্গলসাধনার্থ ঐ স্থানে আসিয়াছিল। মতিবিবি বা পদ্মাবতী তাহার সহিত মিলিল। পদ্মাবতীর মানস সফল হইল—তাহার কৌশলে কপালকুণ্ডলাকে দুশ্চরিতা বলিয়া নবকুমারের প্রতীতি জন্মিল; কাপালিক সুরাপায়নদ্বারা নবকুমারের বুদ্ধিভ্রংশ করিয়া তাঁহাদের উভয়কেই গঙ্গাতীরস্থ শ্মশানে লইয়া গেল; তথায় সহসা গঙ্গার তট ভগ্ন হওয়ায় কপালকুণ্ডলা জলমগ্না হইয়া অদৃশ্যা হইলেন—এই স্থূল উপাখ্যান অবলম্বনকরিয়া এই আখ্যায়িকা বিরচিত। ইহা যদিও দুর্গেশনন্দিনীর ন্যায় ইতিহাসমূলক নহে, তথাপি স্থানে স্থানে অনেক ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

মৃণালিনীর স্থূল বিবরণ এই যে, মগধরাজের পুত্র হেমচন্দ্র মৃণালিনীনাম্নী মথুরার এক বৌদ্ধকন্যার প্রতি আসক্ত হইয়া গোপনে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া বণিক্‌বেশে কিয়ৎকাল তথায় অবস্থান করেন, এই সময়ে বখ্‌তিয়ার খিলিজী মগধরাজ্য জয়করিয়া লয়েন। হেমচন্দ্রের গুরু মাধবাচার্য্য হেমচন্দ্রের দ্বারাই অপহৃত রাজ্যের পুন-

অহঙ্কারের বাসনা করিয়া তাঁহাকে মৃণালিনীর সহিত বিযুক্ত রাখিবার অভিলাষে কৌশলপূর্ব্বক মৃণালিনীকে গৌড়নগরস্থ আপন শিষ্যালয়ে পাঠাইয়া দেন এবং বঙ্গেশ্বরের সহিত মিলিত হইয়া যবনজয় করিবার উদ্দেশে হেমচন্দ্রকে বঙ্গদেশে প্রেরণকরেন। হেমচন্দ্র প্রথমে গৌড়নগরে আসিয়া এক ভিখারিণীর দ্বারা মৃণালিনীর সন্ধান করেন কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার হইবার পূর্ব্বেই মাধবাচার্য্য তথায় উপস্থিত হইয়া হেমচন্দ্রকে নবদ্বীপে লইয়া আইসেন। মৃণালিনীও মাধবাচার্য্য-শিষ্যভবনে অপ্রকৃত কারণে অপমানিতা হইয়া উক্ত ভিখারিণীর সহিত নবদ্বীপে আসিয়াই অবস্থান করেন। ঐ সময়ে বথ্তিয়ার খিলিজী, নবদ্বীপাধিপতি লাক্ষ্মণ্যসেনের ধর্ম্মাধিকরণিক পশুপতির বিশ্বাসঘাতকতায় অক্লেশে নবদ্বীপ জয়করিলেন—হেমচন্দ্র প্রতিবন্ধকতা করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন না, কিন্তু ঐ স্থানেই অনেক বিঘ্ন বিপত্তির পর মৃণালিনীর সহিত তাঁহার সমাগম হইল। অনন্তর তাঁহারা গৃহদাহদগ্ধ পতির অনুমরণসময়ে পশুপতি-পত্নী মনোরমা-কর্তৃক প্রদত্ত বিপুল অর্থরাশি গ্রহণকরিয়া সমুদ্রকূলে গমনপূর্ব্বক এক নূতনপুরী নির্ম্মাণকরিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনীর সমালোচনায় আমরা কিঞ্চিৎ অধিক স্থান প্রদানকরিয়াছি—উপস্থিত আখ্যায়িকাদ্বয়ে তত অধিক স্থান দিতে পারিবনা। অতএব সঙ্ক্ষেপে বলিতেছি যে, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী দুইখানিই এতজ্জাতীয় পুস্তকের মধ্যে উৎকৃষ্ট পুস্তক হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। বঙ্কিমবাবু ইঙ্গরেজিতে বিলক্ষণ কৃতবিদ্য লোক; তিনি ইউরোপীয় প্রধান প্রধান কবিদিগের রচিত অনেক আখ্যায়িকাপুস্তক অধ্যয়নকরিয়াছেন, সুতরাং কি প্রণালীতে বর্ণনীয় পাত্রগণের কার্য্যকলাপ নিবদ্ধ হইলে ইউরোপীয়-রুচি-সম্পন্ন পাঠকদিগের কৌতূহলোদ্দীপক হইবে, তাহা উত্তম জানেন এবং গ্রন্থের সর্ব্বস্থানেই আপনার সেই জ্ঞানের প্রচুর উদাহরণ প্রদর্শনকরিয়াছেন।

তিনি নবকুমার, কাপালিক, কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবির এবং হেমচন্দ্র, মৃণালিনী, গিরিজায়া, মাধবাচার্য্য, পশুপতি, মনোরমা প্রভৃতির চরিতগুলি অধিক স্থলেই স্বভাবসঙ্গত ও মনোহররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। পাঠের সময়ে প্রায় সকলগুলিই চিত্তক্ষেত্রে সজীবভাবে যেন বিচরণ করিতে থাকে; ইহা রচয়িতার সামান্য নৈপুণ্য নহে। এই দুই পুস্তকেই কতকগুলি গীত ও কবিতা নিবেশিত আছে, তাহার কএকটী অতি মনোরম হইয়াছে, বিস্তৃতিভয়ে আমরা তাহার কিছু উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

কপালকুণ্ডলার মতিবিবি—লুৎফ উন্নিসা—বা পদ্মাবতীকে গ্রন্থকার মুখে যেরূপ রূপবতী বলিয়াছেন, তাঁহার বর্ণনাপাঠ করিয়া আমরা উহার সে প্রকার রূপ দেখিতে পাইলাম না—আমাদের চক্ষুতে মতিবিবি বাটামুখী এক ধুমোধামা মাগী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহাহউক, তাহার বুদ্ধিকৌশল, অধ্যবসায়, নবকুমারের প্রতি সেই প্রখর অনুরাগ, তাঁহাকে পাইবার জন্য সেই সেই দুশ্চেষ্টা, তন্মধ্যেও মনের কিঞ্চিৎ উদারতা প্রভৃতি যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা তদ্বিধা কামিনীর পক্ষে সর্ব্বতোভাবেই সঙ্গত হইতে পারে।—অদৃষ্টদোষে সংসারসুখে বঞ্চিতা এক হতভাগিনীর চরিত বর্ণনকরিবার অভিলাষেই, বোধহয়, কবি কপালকুণ্ডলার সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। যদি সে অভিপ্রায় থাকে, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে, বলিতে হইবে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় গ্রন্থের নায়ক বা নায়িকার গুণ সকল এরূপ হওয়া উচিত, যাহা অন্যের স্পৃহনীয় হইতে পারে। কপালকুণ্ডলার রূপও অন্যান্য অনেক রমণীয় গুণ ছিল সত্য, কিন্তু তাঁহার তাদৃশী উদাসীনপ্রকৃতিকতা কি কোন সংসারীর বাঞ্ছনীয় হইতে পারে? কপালকুণ্ডলার ন্যায় কামিনীকে কোন পাঠক আপন গৃহিণী করিতে চাহেন কি?—আমরা ত কখনই না! স্ত্রীর যদি অলৌকিক রূপ থাকে—অন্যান্য বিষয়ে অসাধারণ গুণ থাকে, আর তোমার প্রতি তাহার

কিছুমাত্র অনুরাগ না থাকে—সংসারের সকল কার্য্যেই তাহার ঔদাসীন্য হয়, তবে সে স্ত্রীকে লইয়া তোমার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে?—কপালকুণ্ডলার সাংসারিক কোন বিষয়ে আস্থা ছিলনা—স্ত্রীজাতির সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয় গুণ যে পতিগতপ্রাণতা, আহা তাঁহার কিছুমাত্র ছিলনা—সুতরাং সে স্ত্রীর অপগমে নবকুমারের কোন ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আমাদের বোধহয়না।—আর এক কথা এই, কপালকুণ্ডলা অশুভান্ত আখ্যায়িকা; ইহার উপসংহারে নায়িকার মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং তদর্থ পাঠকদিগের শোক উপস্থিত হইবে। যাহাকে শোচনীয় করিতে হইবে, তাহার পূর্ব্বাবস্থা ভাল ছিল, অগ্রে সেরূপ বর্ণনা করিয়া রাখা আবশ্যক। সুখোচিত ব্যক্তির দুঃখদর্শনে মন যেরূপ আর্দ্র হয়, সামান্যাবস্থ লোকের দুরবস্থায় কখন সেরূপ হয়না। রাম যুধিষ্ঠিরাদি রাজপুত্র ও সুখাভ্যস্ত ছিলেন, এই জন্য, তাঁহারা বনগমন করিয়া ফলমূলাদি দ্বারা জীবনধারণ করিতে লাগিলেন, শুনিয়া আমরা কান্দিয়া অস্থির হই, কিন্তু সাঁওতাল, ভিল্ প্রভৃতি কত অসভ্য জাতীয়েরা যে, যাবজ্জীবন বনে বনে ফিরিতেছে ও ফলমূলাদিদ্বারা উদরপূরণ করিতেছে, তাহাদের কথা শুনিয়া কিছুমাত্র ক্লেশবোধ করিনা! এ আখ্যায়িকার নায়িকা কপালকুণ্ডলার পূর্ব্বাবস্থা কিরূপ ছিল, গ্রন্থকার তাহা কোন্ স্থলে বর্ণনকরেন নাই; এমন কি তিনি কাহার কন্যা? কোন্ দেশে বাস করিতেন? কিরূপে খৃষ্টানদিগের হস্তগত হইয়াছিলেন? ইত্যাদি পরিচয়ও কোথাও দেওয়া হয়নাই, সুতরাং তাঁহার অমঙ্গলে পাঠকদিগের উচিতমত সমদুঃখতার আবির্ভাব হওয়া সম্ভব নহে।

মৃণালিনীর চরিত সেরূপ হয়নাই। তিনি ধনী লোকের কন্যা ও আদরের ধন ছিলেন, এজন্য তাঁহার সহিত পাঠকদিগের বরাবর সমদুঃখতা রহিয়া গিয়াছে। হৃষীকেশ ব্রাহ্মণের বাটী হইতে তাঁহার বিবাসন এবং নবদ্বীপস্থ সরোবরকূলে হেমচন্দ্রকর্ত্তৃক তাঁহার অবমাননা,

এ দুই স্থল পাঠ করিবার সময়ে বোধহয় অনেককেই সাশ্রুনেত্র হইতে হয়। এই উপাখ্যানস্থ ভিখারিণী গিরিজায়া যেন একটী আহ্লাদেপুতুল; বাচালতা কিঞ্চিৎ কম হইলে গিরিজায়া আরও মনোহারিণী হইত। মনোরমাকে গ্রন্থকার একটী অদ্ভুত পদার্থ করিয়া তুলিয়াছেন। উহার বিবরণ পাঠ করিতে মনে একপ্রকার আমোদ হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু এক স্ত্রীরই বহুরূপার ন্যায় একক্ষণে 'সরল বালিকা ভাবের' ও পরক্ষণেই 'গম্ভীরপ্রকৃতি প্রৌঢ়যুবতীভাবের' প্রাপ্তি হওয়া কতদূর স্বভাবসঙ্গত, তাহা আমরা বলিতে পারিনা।

আমরা এবিষয়ে আর প্রস্তাব বাহুল্য না করিয়া একটী বিষয়ের উল্লেখ মাত্র করিয়া নিরস্ত হইব। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

"কণ্টকে গঠিল বিধি মৃণাল অধমে" ইত্যাদি—সুতরাং তাঁহার মতে পদ্মের মৃণালে কণ্টক আছে; কিন্তু সেটী ভ্রম—এ ভ্রম কেবল যে, তাঁহারই হইয়াছে, তাহা নহে; অনেক বাঙ্গালা কবিরই রচনায় এই ভ্রম দেখিতে পাওয়া যায়। ৺লক্ষ্মীকান্তবিশ্বাসের পাঁচালীতে আছে—"পদ্মের মৃণালে কাঁটা, ঠাকুরে পিরালী খোঁটা" ইত্যাদি—মাইকেল মেঘনাদবধে (২য় সর্গে) লিখিয়াছেন "কণ্টকময় মৃণালে ফুটিল নলিনী" ইত্যাদি—সুতরাং এই ভ্রমকে এক প্রকার 'সাধারণ ভ্রম' বলিতে হইবে। কি জন্য বহুলোকের এরূপ ভ্রম হইল, তাহার কারণান্বেষণে আমাদের এই বোধহয় যে, পদ্মিনীর কোন্ পদার্থটীকে মৃণাল বলে, তাহা সকলের জানা নাই—অনেকের বোধ আছে যে, পুষ্পদণ্ডটীরই নাম মৃণাল। ঐ দণ্ড ঈষৎ হরিতবর্ণ এবং তাহাতে কণ্টক আছে সত্য, কিন্তু সেটী মৃণাল নহে; অমরসিংহ তাহাকে নালা ও নাল শব্দে অভিহিত করিয়াছেন—স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইলে তাহাকে 'পদ্মনাল' বলাযায়। কোন কোন আভিধানিকের মতে মৃণালশব্দে পদ্মনালও বুঝায় সত্য বটে—কিন্তু সংস্কৃত কবিরা মৃণালশব্দের ঐ অর্থে কখন প্রয়োগ করেননাই। তাঁহাদের মৃণাল

চন্দ্রের ন্যায় ধবলবর্ণ ও অপূর্ব্ব কোমল পদার্থ। তাঁহারা বিরহসন্তপ্তা নবীনা কামিনীদিগকে তাপোপশমের নিমিত্ত মৃণালবলয় ও মৃণালহার পরাইয়া থাকেন। রত্নাবলী শকুন্তলা নৈষধ কাদম্বরী প্রভৃতিগ্রন্থে ইহার ভূরিভূরি উদাহরণ আছে, অতএব সে সকল উল্লেখকরিবার প্রয়োজন * নাই। মৃণাল কণ্টকময় হইলে তাহার হার বলয়াদি রচনাকরিয়া কবিরা অন্তরজ্বালায় জ্বলিত অবলাদিগকে আবার কণ্টক-ক্ষতজন্য শারীরিক জ্বালা দিতে যাইতেন না। ফল কথা পদ্মের নাল মৃণাল নহে—মূল হইতে তালআঁঠির কলের মত যে মোটা সিকড় মাটীর ভিতর প্রবেশ করে, তাহাকেই মৃণাল কহে; উহাতে কণ্টক থাকে না—উহা যেমন শুভ্র তেমনি কোমল। সচরাচর উহাকে মোলাম (বোধহয় মৃণালশব্দেরই অপভ্রংশ) বলে। মোলাম খাওয়া যায়, এজন্য বাজারেও কখন কখন বিক্রীত হয়।

আমরা এই প্রসঙ্গে আর একটী সাধারণ ভ্রমের কথা উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলামনা।—অনেকের বোধ আছে যে, কুমুদিনীশব্দের অর্থ কুমুদপুষ্প এবং পদ্মিনী কমলিনী প্রভৃতি শব্দের অর্থ পদ্মপুষ্প। কিন্তু বস্তুগত্যা তাহা নহে—কুমুদিনী শব্দে পত্রপুষ্প-দণ্ড প্রভৃতি সমেত কুমুদলতা (কুমুদের ঝাড়) এবং পদ্মিনী কমলিনী নলিনী সরোজিনী প্রভৃতি শব্দে ঐরূপ সমুদয়সমেত পদ্মলতাকে † বুঝায়। আমরা উক্তরূপ দুইপ্রকার ভ্রমেরই নিরাসার্থ প্রমাণস্বরূপ অমরকোষ হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

---

* তথাপি দুইটী লিখি—

পরিচ্যুত স্তৎকুচকুম্ভমধ্যাৎ কিংশোষ মায়াসি মৃণালহার।
ন সূক্ষ্মতন্তোরপি তাবকস্য তত্রাবকাশো ভবতঃ কথং স্যাৎ॥ রত্নাবলী॥

অয়ংসতে শ্যামলতামনোহরং বিশেষশোভার্থ মিবোজ্ঝিতাম্বরঃ।
মৃণালরূপেণ নবো নিশাকরঃ করং সমেত্যোভয়কোটি মাশ্রিতঃ॥ শকুন্তলা॥

† মূলনালদলোৎফুল্ল ফলৈঃ সমুদিতা পুনঃ।
পদ্মিনী প্রোচ্যতে প্রাজ্ঞৈ র্বিসিন্যাদিশ্চ সাস্মৃতা॥ (রাজনির্ঘণ্ট)

কুমুদিনীর নাম।

"অথ কুমুদ্বতী। কুমুদিন্যাং" +

পদ্মিনীর নাম।

+"নলিন্যান্তু বিসিনী পদ্মিনীমুখাঃ" +

পদ্মের নাম।

+"বা পুংসি পদ্মং নলিনং" * *

রক্তোৎপলং কোকনদং +

পদ্মনালের নাম।

+"নালা—নালম্" +

মৃণালের নাম।

+"অথাস্ত্রিয়াং। মৃণালংবিসম্" ইত্যাদি

দুর্গেশনন্দিনীর ভাষাগত যেরূপ গুণদোষ আছে, এ দুই পুস্তকের ভাষাতেও সেই সেইরূপ গুণ দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে।

বঙ্গদর্শন—এই নামে একখানি মাসিকপত্রিকা সন ১২৭৯ সালের বৈশাখমাস হইতে প্রচারিত হইয়াছিল। ইহা কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত বিলক্ষণ তেজের সহিত বঙ্গদেশের সর্ব্বস্থলে বিচরণ করিয়াছিল। দুঃখের বিষয় বঙ্কিমবাবু উহার সম্পাদকতা পরিত্যাগ করায় উহা ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইয়া এক্ষণে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে!

চন্দ্রশেখর—বিষবৃক্ষ—আনন্দমঠ—দেবী-চৌধুরাণী—রজনী—কমলাকান্তের দপ্তর প্রভৃতি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র আরও অনেকগুলি আখ্যায়িকা পুস্তক বঙ্কিমবাবুর বিরচিত আছে। আমরা দুর্গেশনন্দিনীর যেরূপে সমালোচনা করিয়াছি, এ সকল পুস্তকেরও সেইরূপে সমালোচনা করিতে যাইলে এক বঙ্কিমবাবুর পুস্তকের সমালোচনাতেই আমাদের এই ক্ষুদ্র পুস্তক পর্য্যবসিত হইয়া যায়। অতএব আমরা তাহা করিতে পারিলাম না। বঙ্কিম বাবুর আখ্যায়িকার মোহিনী শক্তি এদেশীয় লোকের কথা দূরে থাকুক, ইঙ্গলণ্ড জর্ম্মান প্রভৃতি দূরদেশীয় ভিন্ন জাতীয় লোকদিগকেও আবর্জ্জিত করিয়াছে;—শুনিয়াছি দুর্গেশনন্দিনী ইঙ্গরেজি ও জর্ম্মান ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে! অতএব

উল্লিখিত চন্দ্রশেখর প্রভৃতি বিষয়ে এই কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, বঙ্কিমবাবুর আখ্যায়িকাপুস্তক যেরূপ হইয়া থাকে, ওগুলিও অবিকল সেইরূপই হইয়াছে।

কৃষ্ণচরিত্র ১মভাগ—এখানি মহাভারতবর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা—আখ্যায়িকাপুস্তক নহে। এরূপ পুস্তক বিষয়ে মতামত প্রদর্শন করা আমাদের এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। এতদ্বিষয়ে আমাদের এইমাত্র বক্তব্য যে, ইহার রচনা যুক্তিমতী ওজস্বিনী ও বঙ্কিমবাবুর আখ্যায়িকারচনার ন্যায়ই মধুবর্ষিণী ও চিত্তাকর্ষিণী।

নীতিসার প্রভৃতি।

৺দ্বারকানাথবিদ্যাভূষণমহাশয় নীতিসার প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থের প্রণয়ন করিয়াছেন। ১৭৪২ শকে [খৃঃ ১৮২০ অব্দে] কলিকাতায় দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোঁতা নামক গ্রামে ৺হরচন্দ্রন্যায়রত্নমহাশয়ের ঔরসে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁরা দাক্ষিণাত্য বৈদিকশ্রেণি ব্রাহ্মণ। দ্বারকানাথ ১৮৩২ খৃঃ অব্দে কলিকাতার সংস্কৃতকালেজে প্রবিষ্ট হইয়া ১৮৪৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থানপূর্ব্বক অতি প্রশংসিত ছাত্ররূপে তথাকার পাঠ্য সমুদয় অধ্যয়নকরেন—এই সঙ্গে কিঞ্চিৎ ইঙ্গরেজিশিক্ষাও তাঁহার হইয়াছিল। উক্ত ১৮৪৫ খৃঃ অব্দেই তিনি ঐ কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়া কিছুদিন পরেই ব্যাকরণাধ্যাপকতার পদ লাভকরেন। বিদ্যাসাগরমহাশয় যৎকালে কালেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, তখন্ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কিয়ৎকালের জন্য তাঁহার সহকারী হইয়াছিলেন। অনন্তর তথাকার সাহিত্যাধ্যাপকের পদে অনেক দিন অবস্থিত থাকিয়া পেন্সন গ্রহণ করত অনেকদিন বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন। গত ১৮৮৬ খৃঃ অব্দের ২২এ আগষ্টে তাঁহার পরলোক হইয়াছে!

সংস্কৃত কালেজে অবস্থানকালেই যখন্ গবর্ণমেণ্টের আদেশে চারি দিকে বাঙ্গালা পাঠশালাসকল স্থাপিতহইতে আরম্ভহয়, সেই সময়ে—অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৮৫৫ অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে—বিদ্যাভূষণ মহাশয় ২ দুইভাগ নীতিসার এবং রোম ও গ্রীসের ইতিহাস রচনাকরেন। এই সময়ে সংস্কৃতকালেজের একজন কৃতবিদ্য ছাত্র 'সোমপ্রকাশ' নামক এক সংবাদপত্র প্রচারের বাসনায় সমুদয় উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন; নানাকারণবশতঃ তিনি তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে না পারায় ১৭৮০ শকের অগ্রহায়ণ [খৃঃ ১৮৫৮ অব্দের নবেম্বর] হইতে ইনি এই পত্রিকার সম্পাদকতা গ্রহণকরিয়া সাপ্তাহিকরূপে উহা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। সেই অবধি তাঁহার জীবনকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকর্ত্তৃকই ঐ পত্র প্রচারিত হইয়াছিল। এই পত্রিকাসম্পাদকতা নিবন্ধন অবকাশাভাবেই, বোধহয়, তিনি আর কোন গ্রন্থরচনায় হস্তার্পণ করিতে পারেন নাই। এই কালমধ্যে কেবল 'ভূষণসার' নামে একখানি ক্ষুদ্র বাঙ্গলাব্যাকরণ এবং বিশ্বেশ্বরবিলাপনামক একখানি ক্ষুদ্র পদ্য পুস্তক তাঁহার লেখনীহইতে নির্গত হইয়াছে।

নীতিসার দুই ভাগ—ইঙ্গরেজি ও সংস্কৃত নানাগ্রন্থ হইতে নীতিবাক্য সকল সঙ্কলনকরিয়া এই দুই পুস্তক বিরচিত হইয়াছে। যৎকালে এই পুস্তকের রচনা হয়, তখন্ বালকদিগের পাঠোপযোগী নীতিবিষয়ক পুস্তক অতি অল্প ছিল, অতএব এই পুস্তকদ্বয়ের প্রচার দ্বারা ছাত্রদিগের নীতিশিক্ষাবিষয়ে অনেক উপকার হইয়াছে, বলিতে হইবে। ইহাদের ভাষা যেমন সরল, তেমনি বিশুদ্ধ; অনেক বিদ্যালয়েই এই পুস্তকের পাঠনা হইয়াথাকে, সুতরাং দেশীয় লোকেরা যে, ইহাদের গুণগ্রহণ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

'রোমরাজ্যের ইতিহাস' ও 'গ্রীসদেশের ইতিহাস' এই দুই পুস্তক বিষয়ে কোন অভিপ্রায় প্রকাশকরা আমাদের তত উদ্দেশ্য নহে। অতএব আমরা এইমাত্র বলিব যে, ঐ দুই দেশের যে

সকল ইতিহাস এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, এই দুই পুস্তক তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সুতরাং সমধিকবিষয়সম্বদ্ধ। ইহাদের—বিশেষতঃ রোমরাজ্যের ইতিহাসের—ভাষাও এরূপ সুন্দর যে, ইহাদিগকে সাহিত্য-মধ্যে নিবেশিত করিলেও হানি হয় না। দুঃখের বিষয়, এরূপ উৎকৃষ্ট পুস্তকও কোন বিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট নাই!

সোমপ্রকাশ—বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নাম ও সম্ভ্রম দেশমধ্যে যে, এত দূর বাড়িয়াছিল, নীতিসার বা ইতিহাসরচনা তাহার হেতু নহে—সোমপ্রকাশপত্রের সম্পাদকতাই তাহার একমাত্র কারণ। তিনি এই পত্রের উন্নতিকরণবাসনায় যে, কত পরিশ্রম করিয়াছিলেন—ইঙ্গরেজি ও সংস্কৃত কত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—ও কত বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। সংবাদপত্র মাত্রেই শ্রেণীবিশেষের পক্ষপাতদোষে কিঞ্চিৎ দূষিত হইয়া থাকে; সোম-প্রকাশ সেই সাধারণ দোষে একবারে নির্লিপ্ত, একথা বলিলে, হয় ত পাঠকগণ আমাদিগকে চাটুকার মনে করিবেন; এজন্য এই বলাযাই-তেছে যে, সোমপ্রকাশে ঐ দোষ বড়ই অল্প লক্ষিত হইত। যুক্তিবল অবলম্বনকরিয়াই সোমপ্রকাশ বিচার করিত, এবং সেই সকল যুক্তি সম্পাদকের সরল ও বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ হইতেই বহির্গত হইত। বিচারের সময়ে বিবাদমল্ল হইয়া বাচ্যাবাচ্যবোধবিহীন হইতে সোম-প্রকাশকে আমরা কখন দেখি নাই। বিপক্ষে গালি দিলেও সোম-প্রকাশ বিজ্ঞতা ও গাম্ভীর্য্যের সহিত তাহার উত্তর দিয়া থাকিত। গাম্ভীর্য্যরক্ষা সোমপ্রকাশের এক প্রধান ও রমণীয় গুণ। সে দিনও বহুবিবাহসম্পর্কে যে বিচার হইয়াগিয়াছে, তাহাতে সোমপ্রকাশের ন্যায় কেহই গাম্ভীর্য্যরক্ষা করিতে পারেননাই। এই সকল গুণ থাকায় সোমপ্রকাশ বাঙ্গালা সংবাদপত্রসমূহের শীর্ষস্থানে আরোহণ করিয়া-ছিল। দেশীয় ও ইউরোপীয় সকল সমাজেই সোমপ্রকাশ পরম সমাদর পাইয়াছে। দেশীয় সমাজকে বিশুদ্ধবাঙ্গালাশিক্ষাপ্রদানে সোমপ্রকাশ

প্রচুররূপে সহায়তা করিয়াছে। অধিক কি অনেকে সোমপ্রকাশ পাঠ-করিয়াই বিশুদ্ধরূপে বাঙ্গালারচনা শিক্ষাকরিয়াছেন।

চিন্তাতরঙ্গিণী প্রভৃতি।

শ্রীযুত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চিন্তাতরঙ্গিণী, বীরবাহুকাব্য, বৃত্র-সংহার, ছায়াময়ী, দশমহাবিদ্যা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ৮|৯ খানি কবিতাগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইনি জেলা হুগলীর অন্তঃপাতী গুলিটা নামক গ্রামে মাতামহাবাসে ১৭৬০ শকে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নিবাস উত্তরপাড়া—নাম ৺কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয়ের ৪ পুত্রের মধ্যে ইনি জ্যেষ্ঠ। হেমচন্দ্র বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের নিকট যথারীতি বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ২০ বৎসর বয়ঃক্রম-সময়ে খিদিরপুরে গমন করেন এবং কলিকাতার হিন্দু কালেজে ভর্ত্তি হইয়া ঐ বিদ্যালয়ে ও তৎপরে প্রেসিডেন্সি কালেজে অধ্যয়নপূর্ব্বক তথাকার জুনিয়র ও সিনিয়র স্কলার্সিপ প্রাপ্ত হয়েন এবং সেই স্থানেই এণ্ট্রান্স পরীক্ষা প্রদান করেন। তৎপরে কালেজপরিত্যাগপূর্ব্বক কয়েক বৎসর ইতস্ততঃ বিষয় কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়েন ও তাহা করিবার সময়েই পরীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক যথাক্রমে বি, এ, ও বি, এল, উপাধি লাভকরেন। অনন্তর কয়েক মাস মুন্সেফের কার্য্য সম্পাদন-করিয়া ১৮৬২ খৃঃ অব্দে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী কার্য্য আরম্ভ-করিয়াছেন এবং বিদ্যাবুদ্ধির আধিক্যবশতঃ সবিশেষ দক্ষতাসহকারে কার্য্যসম্পাদন করায় পরম গৌরব ও সম্মানের সহিত অদ্যাপি সেই কার্য্যই করিতেছেন। হাইকোর্টে প্রবিষ্ট হইবার কিয়ৎকাল পরেই ইনি কলিকাতাবিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ফেলোরূপে পরিগণিত হয়েন।

চিন্তাতরঙ্গিণীই, বোধহয়, হেমচন্দ্রবাবুর প্রথম পুস্তক। কোন

জমীদারপুত্র গুরুজনকর্ত্তৃক বিষয়রক্ষার্থে জালকরণ ও মিথ্যাকথনের জন্য প্রণোদিত হয়েন এবং তৎকার্য্যে অসমর্থ হইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন, এই মূল ঘটনা অবলম্বনপূর্ব্বক, প্রাচীনেরা নব্যসম্প্রদায়ের মনোভাব না বুঝিয়া কার্য্য করিলে কিরূপ অনিষ্টোৎপত্তি হয়, তাহাই উপাখ্যানবর্ণনচ্ছলে ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। এই পুস্তক একবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এল, এ, কোর্সমধ্যে নিবিষ্ট হইয়াছিল এবং এক সময়ে ইহা সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে বহুল সমাদর পাইয়াছিল। আমাদের স্মরণ হয়, একদা কোন ব্যক্তি অপর একজনকে দিবার জন্য নবপ্রকাশিত চিন্তাতরঙ্গিণীর এক খণ্ড কাহারও হস্তে দিয়া পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন "সীতাপ্রেরিত মধুফল মারুতি রামচন্দ্রকে না দিয়া যেমন স্বয়ংই ভোগ করিয়াছিলেন, দেখিবেন, ইহা যেন সেরূপ না হয়!" উল্লিখিত ব্যক্তির উক্তরূপ উক্তির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাকরিয়া দিবার প্রয়োজন নাই—পাঠকগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

চিন্তাতরঙ্গিণী অতি ক্ষুদ্র পুস্তক—৩০ পৃষ্ঠমাত্র। ইহাতে সমালোচ্য বিষয় অধিক নাই—তবে ইহা শিক্ষাপ্রদ। ইহার ভাষা সরল, মধুর ও প্রায় নির্দ্দোষ—"নারিনু" "নারিনু" "কই" "কই" ইত্যাদিস্থলে পয়ার-রচনা-নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

বৃত্রসংহার কাব্য—হেমচন্দ্রবাবুর প্রণীত সকল পুস্তক অপেক্ষা বৃহত্তর। হেমবাবু যখন্ মাইকেল মধুসূদনদত্ত-প্রণীত মেঘনাদবধের টীকা লেখেন, বোধহয়, তৎকালেই ঐ পুস্তকের অনুকরণে এবং ঐরূপ প্রণালীতে কাব্য লিখিতে তাঁহার ইচ্ছা জন্মে—বৃত্রসংহার সেই ইচ্ছার ফল।

শঙ্করের বরে লব্ধপ্রভাব বৃত্রাসুর দেবগণকে পরাজিত করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন;—দেবগণ পাতালে, শচী নৈমিষারণ্যে এবং দেবরাজ ইন্দ্র নিয়তির উপাসনার্থ কুমেরু পর্ব্বতে বহুকাল অব-

স্থিত হয়েন। বৃত্রপত্নী ঐন্দ্রিলা শচীকে দাসী করিবার জন্য বৃত্রকে উত্তেজিত করিয়া নিজপুত্র রুদ্রপীড় দ্বারা নৈমিষারণ্য হইতে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া স্বর্গমধ্যে কারারুদ্ধ ও অপমানিত করেন। এদিকে ইন্দ্র নিয়তির উপাসনা শেষকরিয়া শঙ্করের নিকটে গমন করিলে তিনি দধীচ মুনির অস্থি দ্বারা বজ্রনির্ম্মাণ করাইয়া তদ্দ্বারা বৃত্রবধ করিবার জন্য উপদেশ দেন, এবং শচীর অপমানে কুপিত গৌরী, বিরিঞ্চি ও বিষ্ণুর উত্তেজনায় বৃত্রাসুরের ভাগ্যলিপি খণ্ডন করেন। অনন্তর দেব ও দানবে বিস্তর সঙ্গ্রাম হয় এবং পরিশেষে দেবরাজের শরজালে বিদ্ধ হইয়া রুদ্রপীড় এবং বজ্রায়ুধে প্রহত হইয়া বৃত্রাসুর প্রাণত্যাগ করিলে গর্ব্বমত্তা ঐন্দ্রিলা হতাশায় উন্মত্ত হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে থাকেন—ইহাই এই গ্রন্থের সঙ্‌ক্ষিপ্ত উপাখ্যান। মহাভারতের বনপর্ব্বে বৃত্রবধের উপাখ্যান বর্ণিত আছে। কিন্তু অঙ্কুরেও বৃক্ষে যেরূপ প্রভেদ, ঐ উপাখ্যান ও বৃত্রসংহার কাব্যের উপাখ্যানে সেইরূপ প্রভেদ। মহাভারতবর্ণিত অতি সঙ্‌ক্ষিপ্ত বৃত্রবধ বিবরণকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া কবি কল্পনাবলে তদুপরি এই বৃত্রসংহারকাব্যরূপ বিশাল প্রাসাদের গঠন করিয়াছেন।

এই কাব্যে বৃত্রাসুর, রুদ্রপীড়, ঐন্দ্রিলা, ইন্দুবালা, ইন্দ্র, জয়ন্ত, অনল, বরুণ, শচী, দধীচ মুনি প্রভৃতি অতি সুন্দর ও যথোপযুক্তরূপেই বর্ণিত হইয়াছেন। বৃত্র ও রুদ্র পীড়ের বীরত্ব, ঐন্দ্রিলার গর্ব্ব ও দুরভিলাষ পূরণের বাঞ্ছা, ইন্দুবালার মনের কোমলতা, ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর সহিষ্ণুতা, অনলদেবের ঔদ্ধত্য, বরুণের গাম্ভীর্য্য, দধীচের লোকহিতার্থ প্রাণত্যাগ, বিশ্বকর্ম্মার বজ্রনির্ম্মাণ—এ সকল ব্যাপার পাঠমাত্র চিত্তমধ্যে যেন অঙ্কিত হইয়া যায়। রুদ্রপীড় ও ইন্দুবালা মেঘনাদবধের ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার স্থানীয়। তন্মধ্যে রুদ্রপীড় কিয়ৎপরিমাণে ইন্দ্রজিতের অনুরূপ হইলেও ইন্দুবালা প্রমীলা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথগ্‌বিধ পদার্থ। ইন্দুবালার পতিপ্রেম, পতিকৃত সামরিক নিষ্ঠুর কার্য্যের চিন্তায় মনের সেই সেই

ভাব, পর দুঃখকাতরতা, পতির নিধন শ্রবণেই মৃত্যু—এ সকল কোমলতা ও মধুরতার একশেষ!

বৃত্রসংহারকাব্য দেবাসুর-সংগ্রাম-সংক্রান্ত; সুতরাং ইহাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কার্ত্তিকেয় অগ্নি বরুণ ইন্দ্র জয়ন্ত মদন গৌরী শচী রতি প্রভৃতি অনেক দেবদেবীর ক্রিয়াকলাপ এবং অমরাবতী, ইন্দ্রভবন, পাতালপুরী, সুমেরু, কৈলাস, বিশ্বকর্ম্মার শিল্পশালা, মন্দাকিনী, দেবাসুরের পুনঃ-পুনঃ নানারূপ যুদ্ধ প্রভৃতি মানবনয়নের অগোচর বহুবিধ অলৌকিক বস্তুর বর্ণন আছে, সে সকলের যুক্তাযুক্ততার বিচারকরা অনাবশ্যক। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, যুদ্ধকার্য্য পুনঃপুনঃ ও অতিরিক্ত-রূপেই বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কোন কোন স্থলে বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয় নাই।

এই পুস্তকে ছন্দ মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর দুইরূপই আছে। তন্মধ্যেও আবার প্রকারভেদ আছে। সংস্কৃত ছন্দের অনুরূপ হইবে ভাবিয়া কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দের চারি পঙ্‌ক্তিতে বাক্যশেষ করিয়াছেন। ফলতঃ মেঘনাদবধের ছন্দ অপেক্ষা বৃত্রসংহারের ছন্দ অনেক বিচিত্র ও শ্রুতি-মধুর হইয়াছে।

হেমচন্দ্রবাবু স্বয়ংই বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন যে, তিনি বাল্যকাল হইতে ইঙ্গরেজী শিক্ষা করিয়াছেন এবং সংস্কৃত জানেন না, সুতরাং তাঁহার পুস্তকে ইঙ্গরেজি ভাবসঙ্কলন ও সংস্কৃতানভিজ্ঞতার দোষ দৃষ্ট হওয়া সম্ভব। বাস্তবিক তাহাই হইয়াছে—

"ভুঞ্জুক অদৃষ্ট তবে তিক্ত আস্বাদনে চির যুদ্ধে সুরতেজে দানব দুর্ম্মতি।'

ইত্যাদি স্থল সকলের অস্থি মাংস সমুদয়ই ইঙ্গরেজি। 'মিথ্যুক' 'লজ্জাকর' ইত্যাদি ভূরি ভূরি প্রয়োগ সংস্কৃতের নিতান্ত বিরোধী। আর এক কথা, তিনি অনেক স্থলেই অকারণে "সে" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা "অসুর মর্দ্দন আখ্যা কি হেতু সে তবে"—"থাকিতে হইবে স্বর্গে কন্দর্প সে যথা'—'না দিয়াছি কহ কিবা সে তোমায়'—

ইত্যাদি। ফলতঃ বৃত্রসংহার বীররসাশ্রিত একখানি উচ্চ অঙ্গের কাব্য-গ্রন্থ। ইহা সুরুচি-সম্ভূতা উদারভাবোদ্দীপিকা কল্পনাশক্তির উদাহরণস্থল। ইহার ভাষাটী একটু মার্জ্জিত ও বিশদ হইলে আরও রমণীয় হইত। পাঠকদিগের প্রদর্শনার্থ বৃত্রসংহারের কিয়দংশ নিম্নভাগে উদ্ধৃত হইল।

নৈমিষারণ্যে অবস্থিতা শচীকে মাতা ঐন্দ্রিলার দাসী করিয়া আনিয়া দিবার জন্য রুদ্রপীড়ের তথায় গমনের পর রুদ্রপীড়-পত্নী ইন্দুবালার সহচরী রতি সমীপে খেদ—

কহে ইন্দুবালা, ফেলি গাঢ়শ্বাস, নেত্র আর্দ্র অশ্রুজলে,
"বীরপত্নী হায়, সবার পূজিতা, সকলে আমায় বলে!
পতি যোদ্ধা যার, তাহার অন্তরে, কত যে সতত ভয়,
জানে সে কজন, ভাবে সে কজন, বীরপত্নী কি সে হয়!
কতবার কত, করেছি নিষেধ, না জানি কি যুদ্ধপণ!
যশ-তৃষা হায়, মিটে নাকি তাঁর, যশ কি স্বাদু এমন!
পল অনুপল, মম চিত্তে ভয়, সতত অন্তরে দহি।
সে ভয় কি তাঁর, না হয় হৃদয়ে, সমরের দাহ সহি!"
কহিয়া এতেক, উঠি অন্য মনে, অস্থির-চরণে গতি,
ভ্রমে গৃহ মাঝে, গৃহসজ্জা যত নেহালে যতনে অতি।
* * * *
সকলি কোমল, প্রিয়ের আমার, সমরে শুধু নিদয়,
হেন সুকোমল, হৃদয় তাঁহার, কেমনে কঠোর হয়!
আমিও রমণী, রমণীও শচী, তবে তিনি কেন তার,
না করিয়া দয়া, হইয়া নিঠুর, ধরিতে গেলা ধরায়?
কি হবে শচীর, পতি কাছে নাই, মহাবীর পতি মম!
আমিও যদ্যপি, পড়ি সে কথন, বিপদে শচীর সম!
ভাবিতে সে কথা, থাকিয়া এখানে, আমার (ই) হৃদয় কাঁপে!
না জানি একাকী, গহন কাননে, শচীভাবে কত তাপে!
ঐন্দ্রিল-দুহিতা, সেবিতে কিঙ্করী, স্বর্গে কি ছিল না কেহ?
ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বরী, দানবমহিষী, দাসী চাহি ভ্রমে সেহ!
আমারে না কেন, কহিলা মহিষী, আমি সেবিতাম তাঁয়।

পুরে না কি তাঁর, সাধের ভাণ্ডার, শচী না সেবিলে পায়?
কেন আ(ই) লা দৈত্য, এ অমরালয়ে, আছিল আপন দেশ;
পরে দিয়া পীড়া, লভিলা এখন, কি আশা মিটিবে শেষ!
যার দিয়া তারে, ফিরি যদি দেশে, যান পুনঃ দৈত্যপতি;
এ পোড়া আশঙ্কা, এ যন্ত্রণা যত, তবে সে থাকে না রতি!"

ছায়াময়ী—পদ্যকাব্য,—পল্লবনামক সপ্ত পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ইহার স্থূল বিবরণ এই যে, কোন ব্যক্তি প্রিয়তমা কন্যার মৃত্যুতে শোকাকুল হইয়া কন্যার শব ক্রোড়ে করিয়া নানাদেশ পরিভ্রমণ করে। অনন্তর একদিন সন্ধ্যাসময়ে নদীকূলবর্ত্তী এক শ্মশানে শব স্থাপনপূর্ব্বক তৎসন্নিধানে বসিয়া শ্মশানস্থ ভূত প্রেত পিশাচদিগের ক্রীড়া কৌতুকাদিদর্শনে;—শরীরের ধ্বংসেই জীবাত্মার ধ্বংস হয় কিনা?—পরকাল ও তাহার সুখ দুঃখ প্রভৃতি মনুষ্যের কল্পনামাত্র কিনা?—আমার সেই প্রিয়তমা কন্যা কি এই পিশাচীদের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? কি কি করিতেছে?—ইত্যাদি বিবিধরূপ চিন্তা তাহার মনোমধ্যে উদিত হইল। সেই চিন্তার সমকালেই জ্যোৎস্নাময় গগনদেশ হইতে একদেবী তাহার সন্নিধানে আসিয়া তাহাকে গ্রহণপূর্ব্বক উর্দ্ধদেশে চলিয়া গেলেন এবং নক্ষত্র লোকে উপস্থিত হইয়া তাহাদের অভ্যন্তরভাগে পাপকারী জীবাত্মাদিগের নানাবিধ নরকযাতনা প্রদর্শন করাইলেন এবং বিশ্বকেন্দ্রস্থ ধর্ম্মরাজের বিচারপ্রণালী দেখাইবার পর তাহাকে পুনর্ব্বার মর্ত্য ভূমিতে আনিয়া বলিয়া দিলেন যে, আমিই তোমার সেই কন্যা—এক্ষণে অশরীরিণী হইয়াছি।

গ্রন্থকারের কবিত্ব ও কল্পনাশক্তি যেরূপ উচ্চ, তাহা বৃত্রসংহারকাব্যের সমালোচনায় বলা হইয়াছে, এ কাব্যেও তাহার স্থল প্রচুরতরই আছে। তিনি কাব্যে যে সকল নরক ও যমের ধর্ম্মাধিকরণ প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত কি অসঙ্গত? সত্য কি অসত্য?

তাহা বলিবার যো নাই; কারণ উহার প্রমাণসঙ্গ্রহার্থ ইচ্ছা করিয়া এখন্ তথায় যাইতে, বোধহয়, কেহই প্রস্তুত হইবে না!—ঐ গ্রন্থের প্রারম্ভে পরকালাদিবিষয়ের যেরূপ প্রশ্ন সকল উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে আশা জন্মিয়াছিল—যে সে সকল প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা হইবে। কিন্তু তাহা কিছুই হয় নাই। ছায়াময়ী শেষে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অস্পষ্ট বাক্যমাত্র। মেঘনাদবধ কাব্যে মায়াদেবী রামচন্দ্রকে নরকযন্ত্রণা ও স্বর্গসুখ দুইই দেখাইয়ছেন, কিন্তু ছায়াময়ীর পিতার অদৃষ্টে নরকদর্শন ভিন্ন আর কিছুই ঘটে নাই। পরকালে স্বর্গ নরক দুই আছে বলিয়াই সাধারণের সংস্কার। যিনি পাঠকদিগকে একটীর বিভীষিকা দেখাইলেন, অপরটীর প্রলোভনও তাঁহার দেখান কর্ত্তব্য ছিল।

আর এক কথা, গ্রন্থকার নরকবাসীদিগের মধ্যে টৈটস্ ওট্স্, নীরো, কংস, সিরাজ-উদ্দৌলা, ক্লিওপেট্রা প্রভৃতির নামোল্লেখ করিয়াছেন, এবং তন্মধ্যে অশুচি প্রণয়ে আসক্তা বলিয়া ভারতচন্দ্রের বিদ্যাকেও নরকে ফেলিয়াছেন। কিন্তু অন্নদামঙ্গল পাঠকরিয়া বিদ্যাকে অসতী বলিয়া, বোধহয়, কাহার প্রতীতি জন্মে না। ভারতের বিদ্যা অসতী হইলে কালিদাসের শকুন্তলাও অসতী হইয়া পড়েন!

দশ মহাবিদ্যা—ইহা একখানি ক্ষুদ্র গীতিকাব্য। কবি ইহাতে যে সকল স্বোদ্ভাবিত নানাবিধ নূতন ছন্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার অনেকগুলি বিলক্ষণ মধুর হইয়াছে। দশমহাবিদ্যা বলিলে পাঠকগণ যাহা বুঝেন, ইহা ঠিক তাহা নহে। সতী-শরীর-ধ্বংসের পর মহাদেব বিলাপ করিয়া বিচেতন হইলে নারদ সেই স্থানে আসিয়া গান ও বীণাবাদন করিলেন। বিশ্বনাথ তাহাতে প্রাপ্তচেতন হইয়া নারদকে কহিলেন যে 'সতীকে আমি দেখিতে পাইতেছি'। 'সতী এক্ষণে কোথায়?' এই কথা নারদ জিজ্ঞাসা করিলে, মহাদেব মহাকাশমধ্যে সিংহ কন্যা প্রভৃতি দশটী রাশির স্থানে দশটী মহাপুরী দশ মহাবিদ্যা নামে দেখাইয়া দিলেন, এবং সেই প্রসঙ্গে তত্ত্ব কথার

অনেক রহস্য নারদকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। ওরূপ নিগূঢ় তত্ত্বরহস্যের উদ্‌ভেদ করিয়া পাঠকগণকে বুঝান আমাদের এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। অতএব আমরা সে বিষয়ে ক্ষান্ত থাকিলাম। বৃত্রসংহার, ছায়াময়ী ও দশ মহাবিদ্যা এই তিন খানি পুস্তক পাঠ করিয়া হেমচন্দ্র বাবুকে 'আন্তরিক্ষ কবি' বলিতে আমাদের ইচ্ছা হইতেছে। কারণ, দেখা যাইতেছে যে, তিনি পার্থিব পদার্থ অপেক্ষা অন্তরিক্ষস্থিত পদার্থের বর্ণন করিতে অধিক ভাল বাসেন;—স্বর্গ, সুরপুরী, সুমেরু, বিদ্যুৎ, বজ্র, গ্রহগণ, নক্ষত্রমণ্ডল, রাশিচক্র স্থান প্রভৃতির বর্ণনা করা এবং তন্মধ্যে কল্পনাপ্রসূত নানাবিধ নিগূঢ় তাৎপর্য্যের স্থাপন ও ব্যাখ্যা করা তাহার নিদর্শন। হেমচন্দ্র বাবু ইঙ্গরেজিতে সুশিক্ষিত উচ্চাশয়-সম্পন্ন লোক; অতএব তাঁহার কবিতা সকল বিমলরুচিসম্পন্ন নব্য সম্প্রদায়ের প্রীতিকর হইবে, তাহার উল্লেখ করাই বাহুল্য।

দশ মহাবিদ্যায় প্রকাশিত একটী নূতন ছন্দের কিয়দংশ নিম্নভাগে উদ্ধৃত হইল —

"রে সতি, অরে সতি! কান্দিল পশুপতি, পাগর শিব প্রমথেশ॥
সেহ যোগ সাধন, কি হেতু ঘুচাইলি, ভিক্ষুকে বসাইলি ঘরে।
কি হেতু তেয়াগিলি, কেনই সমাপিলি, সে সাধ এত দিন পরে॥
রে সতি রে সতি! কান্দিল পশুপতি, পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগমগন হর, তাপস যত দিন, ততদিন না ছিল ক্লেশ॥"

বীরবাহু কাব্য ও কবিতাবলী—এই নামে হেমচন্দ্র বাবুর রচিত আরও দুই খানি পদ্য গ্রন্থ আছে। প্রথম খানি ইতিবৃত্ত অবলম্বনে রচিত ও প্রণালীবদ্ধ; দ্বিতীয় খানি পূর্ব্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার সংগ্রহ। হেমচন্দ্র বাবুর কবিত্ব ও কল্পনা শক্তি এ দুই পুস্তকেও যথেষ্ট পরিমাণেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

সাময়িক পুস্তিকা ও সংবাদপত্র।

সাময়িক পুস্তিকা ও সংবাদপত্রে জনসাধারণের যেরূপ ভাষাচর্চ্চা হয়, অন্যরূপ পুস্তকদ্বারা বোধহয় সেরূপ হয়না। ঐ সকল পুস্তিকা ও পত্র সময়ে সময়ে প্রকাশিত হয়, সুতরাং পূর্ব্ববারের পত্রে লিখিত বিষয়সকল পাঠকরিয়া, পরবারের পত্রে আবার কি নূতন বিষয় প্রকটিত হয়, তাহা জানিবার জন্য সহজেই পাঠকের মনে কৌতূহল উদ্বুদ্ধ হয়। সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানপ্রদ বিষয়ের কিয়দংশ কোন পত্রে পাঠকরিয়া আনন্দ জন্মিলে তাহার অবশেষ পাঠ না করিয়া থাকা যায় না; মধ্যে বিশ্রাম পাওয়াযায় এজন্য কৌতূহলের আরও একটু উদ্দীপ্তি হয়। সামাজিক ব্যবস্থার গুণ দোষের উল্লেখ, রাজনীতিবিষয়ে বাদানুবাদ, ব্যক্তিবিশেষের উদারচরিত ও বিশাল কীর্ত্তির কীর্ত্তন, প্রধান পদস্থ পুরুষদিগের ন্যায্যান্যায্য ব্যবহারের উদ্ঘোষণ, এক স্থানে বসিয়া নানাদেশীয় নানাপ্রদেশীয় নানাবিধ ঘটনার সংবাদলাভ ইত্যাদি বিষয় সকল কাহার প্রীতিকর না হয়? সভ্যজনপদমাত্রেই সংবাদপত্র সাধারণের মুখস্বরূপ হয়—কারণ কোন বিবেচ্য বিষয় উপস্থিত হইলে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত মতই লোকে প্রায় অবলম্বন করিয়া থাকে, এবং সেই সেই মতকে আপন আপন মত বলিয়া প্রচার করিতে সঙ্কুচিত হয় না;—ভিন্ন ভিন্ন সংবাদপত্রে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকটিত হইলে, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের তুমুল বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। ফলতঃ রাজপুরুষেরা লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংবাদপত্রে প্রকাশিত মতকেই প্রজাগণের সাধারণ মত বিবেচনা করিয়া তদনুসারে কার্য্য করেন। দেশবিশেষে বিখ্যাত সংবাদপত্রই রাজ্যতন্ত্রপরিচালনের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া থাকে। 'টাইম্‌স' নামক সংবাদপত্রকেই অনেকে ইঙ্গলণ্ডের রাজা বলিয়া নির্দ্দেশকরেন। ফলতঃ যে কোন দেশের হউক না কেন, তদ্দেশের সংবাদপত্রের সঙ্খ্যা দেখিলেই দেশীয়লোকের মনের ভাব ও জাতীয়ভাষার প্রতি অনুরাগ অনেক দূর বুঝিতে পারাযায়।

এই সংবাদপত্র ইঙ্গরেজবাহাদুরদিগের আগমনের পূর্ব্বে যে, এ দেশে একবারে ছিল না, তাহা বলা যাইতে পারে না। যে হেতু মুসলমানদিগের রাজ্যকালে—বিশেষতঃ আরঙ্গজেবের অধিকারসময়ে ইতিহাসমধ্যে সংবাদপত্রের উল্লেখ দেখিতেপাওয়াযায়। তবে একথা বলা যাইতে পারে যে, ঐ সংবাদপত্র মুদ্রিত হইত না—হস্তলিখিত থাকিত। যাহা হউক আমরা এস্থলে প্রথমে সাময়িকপুস্তিকা ও পরে সংবাদপত্রের বিষয়ে উল্লেখ করিব—১৮১৬ খৃঃ অব্দে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যনামা এক ব্যক্তি বেঙ্গল-গেজেট নামে এক পুস্তিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; উহাতে বিদ্যাসুন্দর, বেতালপঁচিশ প্রভৃতি কাব্য সকল প্রতিকৃতিসহ মুদ্রিত হইত। ইহার পরেই ১৮১৮ খৃঃ অব্দে পাদরী মার্সমান সাহেব শ্রীরামপুর হইতে দিগ্দর্শন নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন;—উহাতে সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় প্রবন্ধসকল লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু ঐ পত্র প্রথমসংখ্যার অধিক প্রকাশিত হয়নাই। ১৮১৯ খৃঃ অব্দে 'গস্পেল ম্যাগাজিন' নামে এক মাসিকপত্রিকা প্রকাশিত হয়; ইহাতে খৃষ্টধর্ম্মসম্পর্কীয় প্রবন্ধই অধিক থাকিত। ১৮২১ খৃঃ অব্দে প্রসিদ্ধ রামমোহন রায় 'ব্রাহ্মণিক ম্যাগাজিন্' নামে ইঙ্গরেজি ও বাঙ্গালায় এক পত্রিকা প্রকাশ করেন—ইহাতে মিসনরিদিগের সহিত বিচার ও বেদান্তমত সংস্থাপিত হইত। এইরূপে আরম্ভ করিয়া অনেকানেক সাময়িকপুস্তিকা গ্রীষ্মকালোদিত পতঙ্গপুঞ্জের ন্যায় জন্মলাভের কিয়ৎকাল পরেই অন্তর্ধান করিয়াছে, অতএব সে সমুদয়ের নামোল্লেখের প্রয়োজন নাই। তন্মধ্যে যে গুলি কিঞ্চিৎ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, কেবল সেই সকলেরই নাম উল্লিখিত হইতেছে। ১৮৪২ খৃঃ অব্দে প্রসিদ্ধ অক্ষয়কুমার দত্ত 'বিদ্যাদর্শন' নামে এক পুস্তিকা প্রকাশকরেন। কিন্তু ইহার পর বৎসরেই তিনি যে, তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায় সম্পাদকতা গ্রহণকরিয়াছিলেন, এ কথা তাঁহার জীবনচরিতমধ্যেই উল্লিখিত হইয়াছে। ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে আন্দুল নিবাসী রাজনারায়ণ মিত্র 'কায়স্থকিরণ' নামে এক পুস্তিকা

প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—উহাতে পৌরাণিক বচন উদ্ধৃত করিয়া, কায়স্থেরাও যে, যজ্ঞোপবীতধারণের যোগ্য, তদ্বিষয় প্রতিপাদিত হইত। কিন্তু ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে কালীকান্ত ভট্টাচার্য্যকর্ত্তৃক প্রকাশিত মুক্তাবলীনাম্নী পত্রিকাদ্বারা কায়স্থ-কিরণের মত খণ্ডিত হইয়াছিল। ঐ ১৮৪৬ অব্দেই নন্দকুমার কবিরত্ন নিত্যধর্ম্মরঞ্জিকা নামে যে এক পত্রিকা প্রকাশকরেন, তাহাতে বৈদান্তিক মতের বিরুদ্ধে পৌত্তলিকধর্ম্মসংরক্ষণার্থ চেষ্টা হয়। ১৮৫০ খৃঃ অব্দে সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা প্রকাশিত হয়; ইহাতে ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি বড় বড় লেখকেরা সহায়তা করিতেন, কিন্তু উহাও অধিককাল জীবিত থাকে নাই। ইহার কয়েক বৎসর পরে এই পত্রিকাই বালীতে 'শুভকরী' নামে মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্তকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল,—তাহাও দীর্ঘজীবিনী হয় নাই। ১৮৫১ খৃঃ অব্দে 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' বাহির হয়। গ্রন্থকারদিগকে অর্থ-প্রদানাদি দ্বারা উৎসাহ দিয়া সাধারণের পাঠোপযোগী পুস্তক রচনা করাইয়া লইবার জন্য ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় 'বর্ণাকিউলার লিটরে-চর সোসাইটী' নামক এক সমাজ সংস্থাপিত হয়—ঐ সমাজ পরে স্কুলবুক সোসাইটীর সহিত মিলিত হইয়াছে। সমাজের একটী প্রধান দোষ ছিল, তাঁহারা গ্রন্থকারদিগকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া গ্রন্থ ক্রয়করিয়া লইতেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থ অতিসামান্য; তাহা লইয়া গ্রন্থ বিক্রয়করা কোন ভাল গ্রন্থকারই লাভজনক মনে করিতেননা, সুতরাং ঐ সমাজের সাহায্যে অধিক ভাল গ্রন্থ প্রচারিতহয়নাই, এবং রাজেন্দ্রলালমিত্র, মধু-স্দনমুখোপাধ্যায়, রামনারায়ণবিদ্যারত্ন প্রভৃতি সমাজের সম্পৃক্ত কয়েক জন ভিন্ন অল্প লোকেই ঐ সাহায্য লইয়া গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন। যাহা হউক বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদকতায় বিবিধার্থসংগ্রহ কয়েক বৎসর প্রচারিত হইলে পর, উক্ত সোসাইটী উহার প্রচারের ভারগ্রহণ করেন। ঐ পত্রে সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্প, বস্তুতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের বহুলজ্ঞানপ্রদ প্রবন্ধ সকল, মধ্যে মধ্যে প্রতিকৃতি-

সমেত, প্রকাশিত হইত। ঐ পত্রের ভাষা সর্ব্বস্থলে সরল ও মধুর হইত না, কিন্তু ঐ পত্রদ্বারা রাজেন্দ্র বাবুর বিদ্যা, বুদ্ধি, সদনুরাগ, অনুসন্ধিৎসা প্রভৃতি ভূরি ভূরি সদ্‌গুণের প্রচুর পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। বলিতে কি, বিবিধার্থসংগ্রহগুলি একত্র সম্বদ্ধকরিয়া নিকটে রাখিলে একটী রত্ন-ভাণ্ডার সঞ্চিতকরাহয়। আমরা ঐ রত্নসঙ্গ্রাহক রাজেন্দ্রবাবুর নিকট শতবার কৃতজ্ঞতাস্বীকার করি। বিবিধার্থসংগ্রহ কিছুকাল ৺কালীপ্রসন্ন সিংহকর্ত্তৃক চালিত হইয়াছিল। তখন্ উহার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া 'রহস্যসন্দর্ভ' হয় এবং রাজেন্দ্রবাবু উহার সম্পাদকতা প্রাণনাথদত্তকে প্রদান করেন। এক্ষণে তাহাও আর জীবিত নাই। ১৮৫৪ খৃঃঅব্দে বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ সিকদারকর্ত্তৃক 'মাসিক পত্রিকা' নামে এক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে। প্যারীচাঁদবাবুর আলালী ভাষার বিষয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে—সুতরাং এ পত্রিকার ভাষাবিষয়ে আর কিছু বলিতে হইবেনা। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে শ্রীজগন্মোহনতর্কালঙ্কার 'বিজ্ঞান কৌমুদী' নামে এক পত্রিকা প্রকাশকরেন, তাহা কিয়ৎকাল মাত্র উত্তম-রূপে চলিয়া দেহত্যাগ করিয়াছে। যাহাহউক এইরূপে যে সকল সাময়িক পুস্তিকা অল্পকালের জন্য আবির্ভূত হইয়া তিরোহিত হইয়াছে, তাহাদের নামোল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন;—যে গুলি এখনও প্রচলিত আছে, এবং যাহাদের কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা আছে, স্থানান্তরে তাহাদেরই বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইবে।

এই সাময়িক পুস্তিকার প্রসঙ্গে বাঙ্গালা পঞ্জিকার বিষয়ে উল্লেখ করিলে বোধহয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা। পঞ্জিকা আমাদের সমস্ত ধর্ম্মকার্য্যের পরিচালিকা—সুতরাং ইহা যে, কতকাল হইতে চলিতেছে, তাহার নির্ণয়চেষ্টা বিফল। সুতরাং তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া, এক্ষণে যেরূপ মুদ্রিতপঞ্জিকাসকল বাহির হইতেছে, ঐরূপ পঞ্জিকা কতদিন হইতে প্রকাশিত হইতেছে, আমরা ইহাতে কেবল সেই কথারই উল্লেখ করিব।—এক্ষণে পাঁজির বামপার্শ্বে অঙ্কদ্বারা সাঙ্কেতিকরূপে যে গণনা

লেখা থাকে, পূর্ব্বে কেবল ঐরূপই পঞ্জিকা ছিল—ব্রাহ্মণপণ্ডিত বা দৈবজ্ঞগণ তাহা ব্যবহার করিতেন,—সাধারণের তাহা বোধগম্য হইতনা। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে রামহরি নামক এক ব্যক্তি পঞ্জিকাস্থ অঙ্কের প্রতিপাদ্য অর্থসকল ভাষায় লিখিয়া শ্রীরামপুর হইতে এক পঞ্জিকা প্রকাশিত করেন। উহাতে সূর্য্যমণ্ডলের একটী চিত্রময় প্রতিরূপ মুদ্রাঙ্কিত ছিল। ১৮২৪ খৃঃঅব্দে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ বৃহৎ এক নূতন পঞ্জিকা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। ১৮২৫ খৃঃঅব্দে ৺বিশ্বনাথতর্কভূষণকর্ত্তৃক এক পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়। ইহাই 'কালেজের পঞ্জিকা' নামে খ্যাত হইয়াছিল। অনন্তর বৎসর বৎসর নূতন নূতন উন্নতিযোগসহকারে নূতন নূতন পঞ্জিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। এক্ষণে কলিকাতায় অনেকানেক নূতন পঞ্জিকা প্রকাশিত হইতেছে;—প্রতি বৎসর ১০০,০০০ এক লক্ষেরও অধিক পঞ্জিকা বিক্রীত হয়।

অতঃপর সংবাদপত্রের বিষয় উল্লেখ্য হইতেছে।—শ্রীরামপুরই উহার আদিম প্রকাশ স্থান। ১৮১৮ খৃঃঅব্দের ২১এ আগষ্ট মার্শমান সাহেব 'সমাচার দর্পণ' নামে এক সাপ্তাহিকপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভকরেন। উহাতে ইঙ্গরেজি বাঙ্গালা দুইই থাকিত। মিসনরিদিগের এই নূতনকার্য্যে পরমপরিতুষ্ট হইয়া গবর্ণর জেনরেল লর্ড হেষ্টিংস্ সাহেব উৎসাহবর্দ্ধনার্থ তাৎকালিক ইঙ্গরেজিসংবাদপত্রের ডাকমাশুলের চতুর্থাংশে উহার প্রচলনের অনুমতি দিয়াছিলেন এবং তৎপরে লর্ড আম্‌হর্ষ্ট বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে উহার এক এক শত খণ্ড গ্রহণকরিতে সম্মত হইয়াছিলেন। এই পত্র ১৮৪১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। কলিকাতার ৺ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামমোহন রায় উভয়ে মিলিত হইয়া ১৮১৯ খৃঃ অব্দে 'কৌমুদী' নামে একখানি পত্রিকা প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু উহাতে সতীদিগের সহমরণনিবারণপক্ষ সমর্থিত হওয়ায় বন্দ্যোপাধ্যায় উহার সংস্রব পরিত্যাগপূর্ব্বক ১৮২২ অব্দে 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে অপর একপত্র সপ্তাহে দুইবার করিয়া প্রকাশ করিতে

আরম্ভ করেন। এই পত্রে ব্রাহ্ম ও খৃষ্টীয়ানদিগের মতের প্রতিবাদ করিয়া প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের সংরক্ষণচেষ্টার সপক্ষতা থাকায়, সর্ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কলিকাতার প্রধান প্রধান লোকেরা উহার বিলক্ষণ সহায়তা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত সমাচারদর্পণ ও চন্দ্রিকায় ধর্ম্মসম্পর্কে কয়েক বৎসর বহুল বাদানুবাদ হইয়াছিল; ব্রাহ্মদিগের প্রতিকূলে কলিকাতায় যে ধর্ম্মসভা সংস্থাপিত হয়, চন্দ্রিকাই তাহার মুখস্বরূপ ছিল—ফলতঃ এক সময়ে এই চন্দ্রিকা দেশমধ্যে বিলক্ষণ আধিপত্য করিয়াছে। এই পত্রিকা অদ্যাপি জীবিত আছে, কিন্তু এখন্ আর তাদৃশ প্রভা নাই। চন্দ্রিকার পর 'তিমিরনাশক' ও তৎপরে ১৮২৫ অব্দে ৺নীলরত্ন হালদারকর্ত্তৃক বঙ্গদূত প্রকাশিত হয়। ইহাতে শাস্ত্রসঙ্গত বিচারই অনেক থাকিত। ইহার পরে ১৮৩০ অব্দে সংবাদপ্রভাকর-প্রকাশের বিষয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সময়ে সতীদাহনিবারণ উপলক্ষে দেশমধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া যায় এবং সেই সময়ে ঐ কার্য্যের অনুকূলে ও প্রতিকূলে মাসিক সাপ্তাহিক প্রভৃতি অনেকগুলি পত্র প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু সে সকল অধিক দিন থাকে নাই। ১৮৩৫ অব্দে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রদোয়' দৃষ্ট হয়। উহা অদ্যাপি প্রাত্যহিকরূপে প্রচারিত হইতেছে। অতঃপর ১৮৩৯ সালে ৺গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যকর্ত্তৃক সংবাদভাস্কর ও রসরাজ নামে দুই পত্র প্রকাশিত হয়। ভাস্কর সপ্তাহে তিনবার ও রসরাজ দুইবার বহির্গত হইত। ভট্টাচার্য্য খর্ব্বকায় পুরুষ ছিলেন এজন্য, অনেকে তাঁহাকে 'গুড়্গুড়ে' বলিত। ঈশ্বরগুপ্ত যেরূপ পদ্যের, গুড়্গুড়ে ভট্টাচার্য্য সেইরূপ গদ্যের রচনায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ভাস্করের গদ্যরচনা সকলেই প্রশংসা করিত। কুৎসিত রসরাজের মৃত্যুর কথা পূর্ব্বেই বলাগিয়াছে; দুঃখের বিষয় প্রাচীন ভাস্করও কিছু দিন হইল অস্তমিত হইয়াছে। ১৮৪০ অব্দে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেট প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়; ইহাতে আইন, গবর্ণমেণ্টকৃত নানাবিধ বিজ্ঞাপন ও কর্ম্মচারিগণের নিয়োগাদি অনুজ্ঞা-

স্লকলের অনুবাদ থাকে। এই বৎসরেই কাশীমবাজারের রাজা ৺কৃষ্ণনাথ রায় মুর্শীদাবাদপত্রিকা নামে এক পত্র প্রকাশ করেন। উহাদ্বারা নিজ প্রজাগণের অভীষ্টসাধন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিয়ৎকাল-পরেই জন্মদাতার সহিতই ঐ পত্র বিলীন হয়। ১৮৪২ সালে প্রসিদ্ধ ৺রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাঁদ মিত্র ইঙ্গরেজি ও বাঙ্গালায় "বেঙ্গল-স্পেক্টেটর' নামক এক পত্র প্রকাশ করেন;—ইহা দুই বৎসর স্থায়ী হয়। ১৮৪৬ অব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'পাষণ্ডপীড়ন' এবং ১৮৪৭ সালে 'সুধীরঞ্জন' নির্গত হয়; ইহাদের বিষয় আর এক স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সময়ে অনেক গুলি জঘন্য পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে এক খানির নাম 'আক্কেলগুড়ুম্'। ইতি পূর্ব্বে সংবাদপত্র সম্পাদকেরা যাহা ইচ্ছা লিখিতে পারিতেন না; গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত কর্ম্মচারীদ্বারা পরীক্ষিত না হইলে কোন প্রবন্ধই প্রকাশিত হইতে পারিত না। ১৮৩৫ খৃঃঅব্দে গবর্ণর জেনরেল্ মেট্কাফ্ সাহেব সে নিয়ম রহিত করিয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন। কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত কতক গুলি অনুদারাশয় লোকে সেই স্বাধীনতার বিলক্ষণ দুর্ব্যবহার করিয়া আক্কেলগুড়ুম্ প্রভৃতি জঘন্য পত্র প্রকাশ করিয়াছিল। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ৺রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রসসাগর নামে এক দ্ব্যাহিকপত্র প্রকাশকরেন; ইহা ৬ বৎসর অবস্থিত ছিল। ১৮৬০ সালে পরিদর্শক নামে এক পত্র প্রকাশিত হয়; ইহা প্রথমে সাপ্তাহিক ও পরে প্রাত্যহিক হইয়াছিল। শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন গোস্বামী ইহার প্রথম সৃষ্টি করেন; কালীপ্রসন্ন সিংহও কিছুকাল ইহার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন —কিন্তু দীর্ঘকাল জীবিত রাখিতে পারেন নাই। এইরূপে কত কত সংবাদপত্রের অল্পকাল মধ্যেই জন্ম বৃদ্ধি ও লয় হইয়াছে, তাহার সঙ্খ্যা করা কঠিন। এতদ্দেহিতৈষী পাদরী জে, লঙ্ সাহেবের অনুগ্রহে আমরা বহুসঙ্খ্যক সাময়িক পুস্তিকা ও সংবাদপত্রের বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, অনাবশ্যকবোধে সেই সমুদয় প্রকাশকরিলাম না।

এক্ষণে যে সমস্ত সাময়িকপুস্তিকা ও সংবাদপত্র এপর্য্যন্ত প্রচলিত আছে, এবং আমরা যাহাদের সন্ধান জানিতে পারিয়াছি, সঙ্ক্ষিপ্তভাবে তাহাদেরই উল্লেখমাত্র করিয়া এপ্রকরণ সমাপ্ত করিব। ঐ সকল পত্রের মধ্যে—নিম্নলিখিতগুলি—

মাসিক—তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা, নবজীবন, প্রচার, আয়ুর্ব্বেদসঞ্জীবনী, শিল্পপুষ্পাঞ্জলি, বিজ্ঞানদর্পণ, কৃষিগেজেট, ভারতী, কারিকর দর্পণ, পাবনা-বামাবোধিনীসভাপ্রচারিত বামাবোধিনীপত্রিকা, ও ভারতশ্রমজীবী। এ সকলগুলিই কলিকতা হইতে প্রকাশিত।

সাপ্তাহিক—সোমপ্রকাশ, এডুকেশন গেজেট, ঢাকা প্রকাশ, শ্রীমনোমোহন বসুর মধ্যস্থ, আনন্দবাজারপত্রিকা, রঙ্গপুর-দিক্‌প্রকাশ, শ্রীহট্টের পরিদর্শক, মুর্শীদাবাদপত্রিকা, বহরমপুরের প্রতীকার, বৌলিয়া-ধর্ম্মসভা-প্রকাশিত হিন্দুরঞ্জিকা, গবর্ণমেণ্টপ্রচারিত বাঙ্গালাগেজেট, সুলভ সমাচার, ভারতমিহির, নববিভাকর ও সাধারণী, বঙ্গরবি, সুরভি ও পতাকা, বিজলী, জগদ্বাসী, ভারতবাসী, বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী, সময়, সহচর, ময়মনসিংহের চারুবার্ত্তা, বর্দ্ধমান-সঞ্জীবনী, নোয়াখালির পূর্ব্ববঙ্গবাসী, মেদিনীপুরের নবমেদিনী, চট্টগ্রামের সংশোধিনী, চন্দননগরের প্রজাবন্ধু ও ধূমকেতু, ঢাকার গরিব, কান্দিপত্রিকা, এবং বারাণসীর সুনীতি সংবাদ।

প্রাত্যহিক—সমাচার চন্দ্রিকা, সংবাদপ্রভাকর, পূর্ণচন্দ্রোদয়, বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা এবং দৈনিক।

এই সকল ভিন্ন সংস্কৃত ও বাঙ্গালা আরও অনেকগুলি সাময়িক-পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে। পঞ্জিকা ভিন্ন বাঙ্গালা সাময়িকপুস্তিকা ও সংবাদপত্রে সর্ব্বসমেত প্রায় ৬০ খানি পত্রিকা কলিকাতা ও মফস্বলে প্রকাশিত হয়। অতএব প্রতি পত্রিকার ন্যূনসঙ্খ্যায় যদি ৩০০ করিয়া গ্রাহকের গড় ধরা যায়, তবে ঐ সমস্ত পত্রিকার অন্যূন ১৮০০০ গ্রাহক আছে, বলা যাইতে পারে। অতএব দেশের মধ্যে প্রায় ২০০০০ লোক সংবাদপত্রপাঠের রসজ্ঞ হইয়াছেন, বলিতে হইবে।

ব্যাকরণ।

আদ্য ও মধ্যকালে কেহ বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনাকরেন নাই—ইদানীন্তনকালে বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে, একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে এবং ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, ১৭০০ শকে [১৭৭৮ খৃঃ অব্দে] হালহেড্ নামক একজন ইঙ্গরেজ সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালাব্যাকরণ প্রকাশ-করেন। ঐ ব্যাকরণ আমরা দেখিতে পাই নাই, সুতরাং উহা কিরূপ প্রণালীতে লিখিত হইয়াছিল, বলিতে পারি না। অনুমান হয়, ইঙ্গরেজি-ব্যাকরণের রীতিই উহাতে অবলম্বিত হইয়া থাকিবে। যাহা হউক হালহেড্ সাহেবের পর কেরি সাহেব, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য, হটন্ সাহেব, রামমোহন রায়, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, ভগবচ্চন্দ্র বিশারদ, ব্রজকিশোর গুপ্ত, কীথ সাহেব, ক্ষেত্রমোহন, নন্দকুমার বিদ্যারত্ন, মুক্তা-রাম বিদ্যাবাগীশ, শ্যামাচরণ সরকার, ওয়েঙ্গার সাহেব প্রভৃতি অনে-কানেক মহাশয় বাঙ্গালাব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন। ঐ সকল ব্যাক-রণের মধ্যে কয়েকখানি ইঙ্গরেজির অনুকৃতি, কয়েকখানি সংস্কৃত মুগ্ধ-বোধের অবিকল অনুবাদ এবং কোন কোন খানি নিতান্ত অপভাষা-শব্দ সকলেরও সাধনপ্রক্রিয়া-সমন্বিত। সুতরাং ইহাদের কোনখানিই সর্ব্ব-বিধ লোকের অনুমোদিত হয় নাই।

ইহার পরে লোহারাম শিরোরত্ন ও শ্রীমন্তবিদ্যাভূষণ এক এক বাঙ্গালাব্যাকরণ প্রস্তুত করেন। এক্ষণে আরও অনেকগুলি ঐরূপ বাঙ্গালাব্যাকরণ বিরচিত হইয়াছে—তন্মধ্যে আমরা কতকগুলির উল্লেখ করিলাম—নীলমণি মুখোপাধ্যায়প্রণীত বোধসার ও নববোধব্যাকরণ, বাঙ্গালাবোধ ব্যাকরণ, মথুরানাথ তর্করত্নের ব্যাকরণচন্দ্রিকা, জগচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ব্যাক[illegible]প্রবেশ, কেদারনাথতর্করত্নের ব্যাকরণমঞ্জরী, দ্বারকানাথবিদ্যাভূষণপ্রণীত ভূষণসারব্যাকরণ, জয়গোপাল গোস্বামীর লঘুব্যাকরণ, লোহারামশিরোরত্নরচিত বাঙ্গালাব্যাকরণ, শশিভূষণ

তর্করত্নের সংস্কৃতশিক্ষোপযোগী বাঙ্গালাব্যাকরণ, বিষ্ণুচরণনন্দিকৃত বিষ্ণুসারব্যাকরণ, সরলব্যাকরণ, রাজকুমারসর্ব্বাধিকারিরচিত বাঙ্গালাব্যাকরণ, যশোদানন্দন সরকারের সঞ্জীবনী, এবং কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নপ্রণীত বাঙ্গালাব্যাকরণ। এই সকল ব্যাকরণের কোন কোন খানির শেষভাগে বাঙ্গালা ছন্দ ও বাঙ্গালা অলঙ্কার সকলও বিনিবেশিত হইয়াছে। এই সকল ব্যাকরণই এক্ষণে বিদ্যালয়ে পঠিত হইতেছে।

ছন্দ।

আদ্য ও মধ্যকালে পয়ার, ত্রিপদী, এবং মধ্যে মধ্যে একাবলী, দিগক্ষরা, ভঙ্গপয়ার, মালঝাঁপ, দীর্ঘ লঘু ও ভঙ্গ ত্রিপদী এবং চতুষ্পদী—এই কয়েকটীমাত্র ছন্দ সচরাচর ব্যবহৃত হইত। মধ্যকালের শেষে কবিরঞ্জন কতকগুলি নূতনবিধ ছন্দ প্রবর্ত্তিত করেন। তৎপরে রায়গুণাকর—অনন্তর তর্কালঙ্কার এবং তাঁহার পরে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অনেক ছন্দ বাঙ্গালায় অবতারিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে ঈশ্বরগুপ্ত ভিন্ন অপর সকলেরই প্রবর্ত্তিত নূতন ছন্দসকল সংস্কৃতমূলক। তৎপরে যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েক জন কবি ইঙ্গরেজি ছন্দোবিশেষের অনুকরণে কয়েক প্রকার নূতন ছন্দের উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহাঁদের উদ্ভাবিত ছন্দ সকলে ১ম ও ৩য় পঙ্‌ক্তিতে এবং ২য় ও ৪র্থ পঙ্‌ক্তিতে মিল—ইত্যাদিরূপ মিত্রাক্ষরতাসম্পৃক্ত কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য এবং পয়ার ও ত্রিপদীর একত্রীকরণ ভিন্ন অপর কোন চমৎকারিতা অনুভূত হয় না। মাইকেল মধুসূদনদত্ত পয়ারের অন্ত্যবর্ণের মিল উঠাইয়া দিয়া অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দঃসৃষ্টির যশোলাভ করিয়াছেন, একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সংস্কৃত ছন্দের অনুকৃতি ভিন্ন যে সকল নূতন ছন্দ উদ্ভাবিত হইয়াছে, তৎসমস্তই প্রায় পয়ারও ত্রিপদীর রূপান্তরমাত্র—

অর্থাৎ পয়ারের আদি ও অন্তে ২।১ অক্ষর বাড়াইয়া বা কমাইয়া কোন স্থলে বা পয়ার ও ত্রিপদীকে মিশ্রিত করিয়া, তাহাদের নিবন্ধন হইয়াছে। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, অক্ষরের ঐরূপ ন্যূনাধিক্য করায় বা পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতিকে মিশ্রিত করায়, স্থলবিশেষে ছন্দের বিলক্ষণ মধুরতা জন্মিয়াছে। ফলতঃ সংস্কৃতের অনুকরণ ও পয়ারাদির রূপান্তরকরণ দ্বারা এক্ষণে বাঙ্গালায় অনেকবিধ ছন্দ প্রচলিত হইয়াছে। লালমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত কাব্যনির্ণয় নামক পুস্তকে একটী ছন্দঃপরিচ্ছেদ নিবিষ্ট হইয়াছে। উহাতে তিনি, পর্য্যায়সম, পর্য্যায় ও শেষসম, অর্দ্ধসম, পর্য্যায়বিষম, পয়ার, ভঙ্গপয়ার, রঙ্গিল পয়ার, দীর্ঘ-লঘু তরল-ভঙ্গ ও হীনপদ ত্রিপদী, দীর্ঘ-লঘু-অধিকপদ চতুষ্পদী, মালঝাঁপ, একাবলী, দীর্ঘ ও লঘু ললিত, কুসুমমালিকা, মালতী, তূণক, দিগক্ষরা, তরলপয়ার, অমিত্রাক্ষর, পজ্ঝটিকা, গজগতি, দ্রুতগতি, তোটক, ভুজঙ্গ-প্রয়াত, অনুষ্টুপ, রুচিরা, ক্রৌঞ্চপদা, সোমরাজী, চম্পক ও বিশাখ এই ৩৭ প্রকার ছন্দের সোদাহরণ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সে সকল এস্থলে বিশেষরূপে উল্লেখ করা বাহুল্য।

কবিরঞ্জন, রায়গুণাকর ও তর্কালঙ্কার যে কয়েকটি সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গালায় গ্রহণকরিয়াছেন, তদ্ভিন্ন ইন্দ্রবজ্রা, বসন্ততিলক, মালিনী ও শার্দ্দূলবিক্রীড়িত প্রভৃতি অপর সংস্কৃত ছন্দের বাঙ্গালায় অবতারণা করিতে অনেকে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের বোধে কেহই কৃতকার্য্য হয়েননাই। এতাবতা এই সিদ্ধান্ত করা যাইতেপারে যে, সংস্কৃত 'ক্ষুদ্র' ছন্দসকল বাঙ্গালার উপযোগী হয়—'দীর্ঘ' ছন্দ উপযোগী হয়না।

আদ্যকালের শেষভাগে আমরা পয়ার ও ত্রিপদীর লক্ষণনির্দ্দেশ করিয়াছি। কিন্তু তৎকাল-প্রচলিত পয়ারাদি অপেক্ষা এক্ষণকার পয়ারাদি অনেক বিশুদ্ধ হইয়াছে। পদের মধ্যে যতি না পড়িলে, এবং প্রতি অর্দ্ধের উপান্তিম স্বর ও অন্তিম হল্ বর্ণ এ উভয়ের মিল থাকিলে তাহাকে বিশুদ্ধ পয়ার বলা যায়। প্রাচীনকালের পয়ারে অন্তিম হলের

মিল প্রায় থাকিত, উপান্তিম স্বরের মিল সর্ব্বত্র থাকিত না। ত্রিপদীও এইরূপ। বাহুল্যভয়ে যতিভঙ্গের উদাহরণ না দিয়া পয়ারস্থ মিলের দুইটী উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

সত্যকথা সদা কবে হ'য়ে সাবধান।
মিথ্যাবাদী যথা তথা হয় হতমান॥

এস্থলে 'ধান'—'মান' ইহাদের মিল বিশুদ্ধ হইয়াছে—কিন্তু

খোঁড়াকে বলিয়া খোঁড়া কাণা জনে কাণা।
কদাপি তাদের মনে দিওনা বেদনা॥

এস্থলে 'কাণা' 'দনা' এ মিল তত বিশুদ্ধ হয়নাই—দনার পরিবর্ত্তে 'দানা' হইলে উত্তম বিশুদ্ধ হইত।

চলিত পয়ার ও ত্রিপদী ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েক প্রকার ছন্দ আমাদের দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে—আমরা তাহার কয়েকটীমাত্র উদ্ধৃত করিলাম—পাঠকগণ সন্ধানকরিয়া দেখিবেন, এইরূপ ছন্দোবদ্ধ কত শ্লোক দেশমধ্যে স্ত্রীসমাজে প্রচলিত আছে।—

" আয় রৌদ্র হেনে। ছাগল দেব মেনে॥" ইত্যাদি
"শুশুনী কলমী ন ন করে। রাজার বেটা পক্ষী মারে।
মারণ পক্ষী সুখের বিল। সোণার কৌটা রূপার খিল।।
খিল খুল্‌তে হাতে ছড়। আমার ভাই বাপ লক্ষেশ্বর" ॥ ২ ॥
"শর শর শর। আমার ভাই গাঁয়ের বর॥
বর বর ডাক পড়ে। গুও গাছে গুও ফলে॥
আমার ভাই চিব্‌য়ে ফেলে, অন্য লোকের ভাই কুড়্‌য়ে খায়॥" ৩ ॥
"শিল শিলেটন্‌ শিলে বাটন শিলা আছে ঘরে।
স্বর্গে থেকে মহাদেব বলে গৌরী কি বত্ত করে॥
আশ নাড়ন পাশ নাড়ন তোলা গঙ্গাজল।
এই পেয়ে তুষ্ট হলেন ভোলা মহেশ্বর॥ ৪॥ ইত্যাদি

———০ঃ০———

অলঙ্কার।

বাঙ্গালাভাষা অতি দুঃখিনী। ইহার নিজের কিছুমাত্র অলঙ্কার নাই। যাহা ২।৪খান ইহার গাত্রে দেখা যায়, তাহা মাতামহীর (সংস্কৃত-ভাষার) নিকট প্রাপ্ত। বাঙ্গালা যখন্ বালিকা ছিল, তখন্ মাতামহীর ভারী ভারী মোটা মোটা যে সকল অলঙ্কার (অনুপ্রাস উপমা রূপকাদি) তাহাই লইয়া সন্তুষ্ট ছিল—এখন্ যুবতী হইয়াছে, এখন্ আর সে সকল পুরাতন মোটা অলঙ্কারে উহার মন উঠে না—এখন্ জড়াও অলঙ্কারের (প্রতিবস্তূপমা নিদর্শনা সমাসোক্তি প্রভৃতির) প্রতি লোভ হইয়াছে, এবং ছলে বলে কৌশলে এক এক খানি করিয়া বৃদ্ধার অনেক অলঙ্কারই আত্মসাৎ করিতেছে। কামিনীগণের অলঙ্কার পরিবার সাধ পাঠক-দিগের অবিদিত নাই। 'মল্' বলিয়া দশ সের রূপার বেড়ী দিলেও মনের সুখে পরিবেন; কাণ ছিঁড়িয়া যায়—তবু সোণা পরিবেন—শেষে না হয় সোণার কাণ গড়াইবেন! ভাগ্যবন্ত গৃহের অনেক গৃহিণী অলঙ্কারের ভরে চলিতে পারেননা—ভাল দেখায় না, তবু অলঙ্কারে সাজিয়া 'আহ্লাদে পুতুল' হইয়া বসিয়া থাকিবেন!। বুড়া আয়ীর গায়ের সমস্ত অলঙ্কার বাঙ্গালার গাএ সাজিবে না—বড় জঙ্গী হইবে—ইহা বাঙ্গালা বোঝে না, তাহা নহে; তবু যে, সে অলঙ্কারের ঝুড়ি মাথায় করিতে চাহে, সে তাহার জাতির গুণ!

আদ্য ও মধ্যকালে অনুপ্রাস উপমা রূপক প্রভৃতি কয়েকটীমাত্র অলঙ্কার বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইত, এক্ষণে ক্রমে অনেকগুলি সংস্কৃত অলঙ্কার ইহাতে গৃহীত হইতেছে। এখন্ অনেকে বাঙ্গালা ব্যাকরণের শেষে একটী অল-ঙ্কারপরিচ্ছেদ বিনিবিষ্ট করিতেছেন। অলঙ্কার বিষয়ে ২।১ খানি পৃথক্ গ্রন্থও প্রস্তুত হইয়াছে। পূর্ব্বোল্লিখিত কাব্যনির্ণয় নামক পুস্তকে শ্লেষ, অনুপ্রাস, যমক, ভাষাসম, পুনরুক্তবদাভাস, উপমা, রূপক, ভ্রান্তিমান্, অসঙ্গতি, উৎপ্রেক্ষা, ব্যতিরেক, অর্থান্তরন্যাস, স্বভাবোক্তি, অতিশয়োক্তি,

বিরোধ, নিদর্শনা, ব্যাঘাত, কাব্যলিঙ্গ, পর্য্যায়োক্ত, অপহ্নুতি, পরিবৃত্তি, ব্যাজস্তুতি, সমাসোক্তি, প্রতিবস্তূপমা, তুল্যযোগিতা, দৃষ্টান্ত, বিভাবনা, সন্দেহ, অপ্রস্তুতপ্রশংসা, বিশেষোক্তি, প্রভৃতি অনেকগুলি অলঙ্কার সলক্ষণ সোদাহরণ উল্লিখিত হইয়াছে। সংস্কৃতেই এই সকল অলঙ্কারের অনেকগুলি বিশেষ বৈচিত্র্যাধায়ক নহে—বাঙ্গালার কথা সুদূর পরাহত।

ভাষা।

আদ্য, মধ্য ও ইদানীন্তনকালে বাঙ্গালাভাষার অবস্থা কিরূপ ছিল এবং ক্রমে তাহার কিরূপ পরিবর্ত্ত হইয়া আসিতেছে, তাহা তত্তৎকাল-রচিত গ্রন্থচয়ের সমালোচনাবসরেই উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ ভাষার সহিত ভাষান্তরের মিশ্রণ কোথায় কিরূপ হইয়াছে? সে কথা সর্ব্বস্থলে বলা হয় নাই, এক্ষণে সংক্ষেপে তদ্বিষয়েই কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে।—আদ্যকালের ভাষায় হিন্দী বল—ব্রজভাষা বল—প্রাকৃত বল—অপর ভাষা বল—যাহা কিছু মিশ্রিত ছিল, তাহা পূর্ব্বে এক প্রকার উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ঐ সময়ে ইহার মধ্যে আরবী, পারসী, ইঙ্গরেজী প্রভৃতি কোন বিদেশীয় ভাষা লব্ধপ্রবেশ হয় নাই; কারণ তৎকালে কোন বিদেশীয় জাতি বহুলরূপে দেশমধ্যে অবস্থান করেন নাই। কিন্তু মধ্যকালীন ভাষার যে সকল উদাহরণ এই গ্রন্থেই পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে, তৎপাঠে সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইবে যে, মুসলমানদিগের আধিপত্যের চিহ্নস্বরূপ তৎকালীন বাঙ্গালার মধ্যে আরবী, পারসী, উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষার প্রচুর শব্দের বহুল মিশ্রণ হইয়া গিয়াছে—এত মিশ্রণ যে, আমরা উহাদের অনেক শব্দকে ভিন্নভাষার শব্দ বলিয়া বুঝিতেই পারিনা। বর্ত্তমানকালে আবার ইঙ্গরেজ বাহাদুরদিগের রাজত্বনিবন্ধন দিন দিন ভূরিভূরি ইঙ্গরেজি শব্দ বাঙ্গালার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। সুতরাং এক্ষণে বাঙ্গালা, সংস্কৃত, প্রাকৃত, আরবী, পারসী, ইঙ্গরেজী

প্রাকৃতি কত ভাষায় মিশ্রিত হইয়া যে, কিরূপ খেচরী হইতেছে, তাহা বিজ্ঞ পাঠকগণ বুঝিতেই পারিতেছেন।

কথোপকথনে চলিতভাষা কিম্বা সংস্কৃতগর্ভক ভাষা এখন্ পুস্তকাদিতে ব্যবহারকরা কর্ত্তব্য? এবিষয়ে এক্ষণে যে বিচার উঠিয়াছে, পূর্ব্বে একস্থলে তাহার যথামতি মীমাংসাকরা গিয়াছে। অতএব তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। এক্ষণে ভাষার রচনা প্রণালী লইয়া ২।৪টী কথা বলা আবশ্যক হইতেছে—বাঙ্গালাভাষার রচনা প্রণালীশিক্ষার্থ রচনাবলী প্রভৃতি ২।১ খানি পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, অতএব তৎপাঠে ঐ বিষয়ের সবিশেষ জ্ঞানলাভ হওয়া সম্ভব। আমরা সে সকল বিষয়ে অধিক হস্তক্ষেপ করিবনা, স্থূলরূপে কেবল এই কথা বলিব যে,বাঙ্গালা আমাদের মাতৃভাষা; ইহার রচনা প্রণালী শিক্ষা করিবার জন্য পুস্তকগত নিয়মাবলী অভ্যাস করিতে হয়না; এ পর্য্যন্ত যে সকল মহাশয় বাঙ্গালারচনা করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন, তাঁহাদের কেহই ঐরূপ পুস্তক অধ্যয়নকরেননাই। অশ্লীল, দুশ্রব, দুর্ব্বোধ ও ব্যাকরণদুষ্ট নাহয়,এইরূপবুঝিয়াবাক্যবিন্যাস করিতে পারিলেই উৎকৃষ্টরচয়িতৃমধ্যে গণ্য হইতে পারাযায়। ফলকথাবাঙ্গালা রচনা করিতে হইলে—"বাক্যমধ্যে প্রথমে কর্ত্তা, শেষে ক্রিয়া ও মধ্যভাগে কর্ম্ম করণ প্রভৃতি অপরাপর কারক ও অসমাপিকা ক্রিয়া পদাদি বসাইতে হইবে। সঙ্খ্যাবাচক ও বিশেষণ পদসকল বিশেষ্যের পূর্ব্বেই বসিবে।—বিশেষণ যদি বিধেয় অর্থাৎ প্রধানরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়, তবে বিশেষ্যের পরে বসিবে, যথা নন্দ বড় মূর্খ; এখানে মূর্খ পদ বিশেষণ হইলেও বিশেষ্যের পরে বসিয়াছে।—বিশেষণ; বিশেষ্যের সমলিঙ্গ হয়; কিন্তু পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে বিশেষণের রূপভেদ হয় না, যথা সুন্দর ফল বা সুন্দর পুরুষ। স্ত্রীলিঙ্গে বিশেষণের রূপভেদ হয়, যথা সুন্দরী নারী। যেখানে বিশেষণ পদ স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত করিলে দুশ্রব হয় বা বক্তার পাণ্ডিত্যপ্রকাশ দেখায়, সেখানে তাহাদিগকে অমনি বিন্যস্ত করাই সৎপরামর্শ; ক্ষুদ্রা নৌকা বা মেঘাচ্ছন্না রজনী ইত্যাদি না বলিয়া ক্ষুদ্র নৌকা বা মেঘাচ্ছন্ন রজনী

ইত্যাদি বলাই ভাল। কিন্তু যেখানে বিশেষণপদ এরূপ যে, তাহাকে স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত না করিলে সে পদ পুংলিঙ্গের মত হইয়া পড়ে, সেখানে সে সকলকে অবশ্যই স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত করিতে হইবে;—যথা গতিশালী নৌকা ও জ্যোৎস্নাবান্ রজনী ইত্যাদি না বলিয়া গতিশালিনী নৌকা ও জ্যোৎস্নাবতী রজনী ইত্যাদি বলিতেই হইবে। বাঙ্গালারচনায় এই নিয়মের প্রতি কিছু বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, নচেৎ অনেকস্থলে ভ্রম হইয়া পড়ে—ইত্যাদি প্রকারে নিয়ম সকল প্রতিপালন করিতে হইবে," এবম্বিধ বাক্যবিন্যাস ও নিয়মনির্দ্দেশপূর্ব্বক গ্রন্থবাহুল্য করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে, এই জন্য সে বিষয়ে নিরস্ত থাকিয়া বাঙ্গালা রচনায় বা বাঙ্গালাকথোপকথনে শব্দগত যে সকল সাধারণভ্রম আছে—এমন কি, বিশেষ বিজ্ঞলোকেরাও কখন কখন অজ্ঞাতভাবে যে সকল ভ্রমে পতিত হয়েন, এখন্ তাদৃশ কতিপয় ভ্রমের উল্লেখ করিয়াই এ প্রকরণ পরিত্যাগ করিব। সে সকল ভ্রম এই———

(১) "অত্র আদালতের বিচারে"—বিশেষ্য ও বিশেষণপদের সমবিভক্তিকত্ব হওয়া চাই; এস্থলে 'আদালতের' এই বিশেষ্যপদ সম্বন্ধবোধক ৬ষ্ঠ্যন্ত এবং 'অত্র' এই সর্ব্বনাম বিশেষণপদ অধিকরণবোধক ৭ম্যন্ত; সুতরাং ইহাদের পরস্পর অন্বয় হইতে পারে না—'অত্র আদালতে'—বলিলে চলিত। (২) "অধীনী"—ব্যাকরণের নিয়মানুসারে অধীনা হয়। (৩) "অলস"—ইহা বিশেষণ শব্দ; কিন্তু অনেকে ইহাকে বিশেষ্যবোধে প্রয়োগকরেন—যথা 'তাহার অলস নাই', এস্থলে 'আলস্য নাই' হইবে। (৪) "আগত দিনে যাইব"—আ-পূর্ব্বক গম ধাতুর উত্তর অতীতকালে ত প্রত্যয় করিয়া 'আগত' পদ সিদ্ধ হইয়াছে; উহার অর্থ যাহা আসিয়াছে—যাহা আসিবে—নহে; কিন্তু যে দিন পরে আসিবে সেই দিনে যাইব, এই অর্থে উহা প্রযুক্ত হয়, সুতরাং সে প্রয়োগ অশুদ্ধ; ঐ অর্থে 'আগামী দিনে যাইব' এইরূপ বলা কর্ত্তব্য। (৫) "কায়া"—

কায় শব্দ অকারান্ত পুংলিঙ্গ—আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ নহে। (৬) "একথা গ্রাহ্যযোগ্য নহে"—'গ্রাহ্য' এই পদের অর্থ গ্রহণযোগ্য, অতএব তৎসহ আবার 'যোগ্য' পদের প্রয়োগ অনাবশ্যক; 'একথা গ্রাহ্য নহে' এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হয়। (৭) "চন্দ্রিমা"—চন্দ্রিকা—চন্দ্রকিরণ—জ্যোৎস্না—এই অর্থে অনেকে চন্দ্রিমা শব্দ প্রয়োগ করেন, কিন্তু "চন্দ্রিমা" এরূপ শব্দই নাই। (৮) "তৎকালীন সে ছিল না"—'তৎকালীন' এই পদ বিশেষণ, উহা বিশেষ্যসাপেক্ষ, কিন্তু উক্তরূপ বাক্যে উহার বিশেষ্য কিছু থাকে না, 'তৎকালে সে ছিল না, এই বলা উচিত। (৯) "দারাসুত নাই"—অনেকের বোধ আছে যে 'দারা' শব্দে পত্নী বুঝায়, উহা আকারান্ত ও স্ত্রীলিঙ্গ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; 'দার' এই অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের অর্থ পত্নী—দারপরিগ্রহ, পরদারহরণ ইত্যাদি প্রয়োগে উহা স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। (১০) "দাসী—দাস্যাঃ"—আদালতসম্পৃক্ত অনেক লোকেরই সংস্কার এই যে, শূদ্রজাতীয় স্ত্রীলোকের নামের পর 'দাসী' পদ থাকিলে তাহাকে সধবা এবং 'দাস্যাঃ' পদ থাকিলে তাহাকে বিধবা বুঝিতে হইবে; কিন্তু ইহা যে কিরূপ ভ্রম, তাহা অতি অল্পমাত্রও সংস্কৃতবোধ যাঁহাদের আছে, তাঁহারাও অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। দাসীপদ কর্ত্তৃকারকবোধক প্রথমান্ত এবং দাস্যাঃ পদ সম্বন্ধবোধক ষষ্ঠ্যন্ত; এতদ্ভিন্ন ঐ উভয়পদের অর্থগত আর কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই। যদি দাসী বলিলে 'সধবা' বুঝায়, তবে দাস্যাঃ বলিলে 'সধবা' ভিন্ন আর কিছুই বুঝাইবে না। "দেবী—দেব্যাঃ" "শ্রীমতী—শ্রীমত্যাঃ" ইত্যাদি স্থলেও অনেকের ঐরূপ ভ্রম আছে। (১১) "নিরাকরণ"—নির্ণয়রূপ অর্থবোধার্থ অনেকে নিরাকরণ শব্দ প্রয়োগকরিয়া থাকেন; যথা 'এবিষয়ের এখনও নিরাকরণ হয় নাই' কিন্তু নিরাকরণ শব্দে নির্ণয়—মীমাংসা—বুঝায় না, উহার অর্থ দূরীকরণ—প্রত্যাখ্যান। বোধহয় "সংশয় নিরাকরণ" শব্দে সন্দেহভঞ্জন—মীমাংসা—বুঝায়, তাহা হইতেই ঐ ভ্রমের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। (১২) "নিশি"

—অনেক বিজ্ঞলোকেও 'নিশির শিশির পড়ে' ইত্যাদি প্রয়োগ করিয়াছেন। সংস্কৃত নিশা শব্দের সপ্তমীর এক বচনে 'নিশি' পদ সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু 'নিশি' এরূপ শব্দ কুত্রাপি নাই; সুতরাং উহার ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'নিশির' এরূপ সম্বন্ধপদ হইতে পারেনা। (১৩) "মনান্তর"—মনঃ+ অন্তর—এই দুই পদের সন্ধি হইলে মনোন্তর হয়—মনান্তর হয় না, অতএব মনান্তর শব্দ অসাধু। (১৪) "যদ্যপিও "—সংস্কৃত অপি শব্দের বাঙ্গালা অর্থ 'ও,' সুতরাং যদ্যপি শব্দের অর্থ যদিও, অতএব ঐ 'যদ্যপি'র উত্তর আবার 'ও' দেওয়া কেবল পৌনরুক্ত্য। যদ্যপিওর ন্যায় 'তথাপিও' ভ্রান্ত-প্রয়োগ। (১৫) "যদ্যপি স্যাৎ সে ভাল হয়"—যদ্যপিস্যাৎ একবারে অব্যয়পদ নহে, "যদ্যপি" অব্যয়—'স্যাৎ' সংস্কৃত ক্রিয়াপদ— উহার অর্থ 'হয়' অতএব যদ্যপিস্যাৎ সে ভাল হয়——এই বাক্যকে অন্যরূপে বলিতে গেলে——যদ্যপি হয় সে ভাল হয়——এইরূপ হইয়া পড়ে। অতএব বাঙ্গালায় 'যদ্যপিস্যাৎ' না বলিয়া 'যদ্যপি' বলাই বিধেয়। (১৬) 'সতীত্ব'—এই শব্দটী এক্ষণে বাঙ্গালায় বিস্তীর্ণরূপে প্রচলিত, কিন্তু ব্যাকরণানুসারে ইহা সাধুশব্দ নহে। সৎ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে সতী হয়, তাহার উত্তর ভাবার্থে ত্ব প্রত্যয় করিলে ব্যাকরণের নিয়মানুসারে ঐ ত্ব পরেতে পূর্ব্বস্থিত স্ত্রীপ্রত্যয় ঈকারের লোপ হইয়া 'সত্ত্ব' পদ হইয়া পড়ে; কিন্তু তাহাও শুনিতে ভাল লাগে না, এইজন্য চতুরেরা 'সত্ত্ব' 'সতীত্ব'এ উভয়েরই পরিহার করিয়া সতীভাব, সতীধর্ম্ম, পাতিব্রত্য ইত্যাদি শব্দদ্বারা ঐ অর্থের প্রকাশ করিয়াথাকেন। (১৭) সবিনয়পূর্ব্বক নিবেদন—এই বাক্য এরূপে নাবলিয়া 'সবিনয়নিবেদন' বা, 'বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন' এই বলাই কর্ত্তব্য; কারণ সবিনয় ও বিনয়পূর্ব্বক বহুব্রীহিসমাসনিষ্পন্ন এই দুইটী পদ 'নিবেদন' এই পদের বিশেষণ হইতে পারে, সবিনয়পূর্ব্বক—ইহা কোনরূপেবিশেষণ হইতে পারেনা; উহার সমাস ও অর্থসঙ্গতি হয়না। (১৮) "সন্তানসন্ততি" — অনেকের বোধ আছে, সন্তান শব্দের অর্থ পুত্র এবং সন্ততি শব্দের অর্থ কন্যা; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে—ঐ দুইশব্দেরই অর্থ পুত্র ও কন্যা

উভয়। সংপূর্ব্বক তন ধাতুর উত্তর ঘণ প্রত্যয়করিয়া সিদ্ধ "সন্তান" শব্দটী পুংলিঙ্গ এবং ক্তি প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ "সন্ততি" শব্দটী স্ত্রীলিঙ্গ, সুতরাং ঐ শব্দদ্বয়ের লিঙ্গগত ভেদ ভিন্ন অর্থগত কোন ভেদ নাই। (১৯)· 'সাক্ষী'—এইটী বিশেষণ বা ধর্ম্মিপদ—ধর্ম্মপদ নহে; এজন্য 'তিনি ইহাতে সাক্ষী আছেন, এরূপ বলা যায়, কিন্তু 'তাঁহাকে সাক্ষী দিতে হইবে' এরূপ বলা যাইতে পারে না। ধর্ম্মপদ করিতে হইলে উহার উত্তর ভাবার্থ প্রত্যয় করিয়া সাক্ষিত্ব বা সাক্ষ্য করিতে হয়,যথা তোমাকে সাক্ষ্য দিতে হইবে ইত্যাদি। (২০) "সৌজন্যতা"—সুজন শব্দের উত্তর ভাবার্থক ষ্ণ্য প্রত্যয় করিয়া সৌজন্য হয়, উহার অর্থ সুজনতা; অতএব ঐ সৌজন্য শব্দের উত্তর আবার ভাবার্থক তা প্রত্যয় করিবার কোন প্রয়োজন নাই— সৌজন্য বা সুজনতা, ইহার অন্যতর বলিলেই বক্তার অভিপ্রেত সিদ্ধ হইবে। বাহুল্যতা, গৌরবতা, লাঘবতা,দারিদ্রতা, সৌহৃদ্যতা, স্থৈর্য্যতা, ইত্যাদি পদও ঐরূপ। (২১) "সৃজন"—এই শব্দটী এত প্রচলিত যে, ইহাকে অশুদ্ধ বলিতে সঙ্কুচিত হইতে হয়। আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, সৃজধাতুর উত্তর অনট্ প্রত্যয় করিলে কোনরূপেই 'সৃজন' পদ সিদ্ধ হয় না—'সর্জ্জন' হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহা অব্যবহার-নিবন্ধন ভাল শুনায় না। যাহাহউক, যখন্ সৃজন পদ অসিদ্ধই হইতেছে, তখন্ উহা প্রচলিত হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে—বরং সৃজন ও সর্জ্জন উভয়েরই পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক সৃষ্টি প্রভৃতি শব্দদ্বারা তৎস্থান পূরণ করা কর্ত্তব্য, অতএব "সৃজন করেছ তুমি করিছ পালন" ইত্যাদি না বলিয়া "করিয়াছ সৃষ্টি তুমি করিছ পালন" ইত্যাদিরূপ বলাই ভাল। (২২) "সন্মত"--সং+মত এই দুই শব্দের সন্ধিতে ব্যাকরণের নিয়মানুসারে ং অনুস্বার স্থানে ম্ হইয়া সম্মত হয়—সন্মত হয় না। সন্মতি ও সন্মান এইরূপ অশুদ্ধ। (২৩) "সিঞ্চন"—এই পদ ব্যাকরণে সিদ্ধ হয় না—সেচন হয়। (২৪) 'জন্মিল' এই অর্থে অনেকে 'জন্মাইল' পদ ব্যবহার করেন, তাহা অশুদ্ধ।

(২৫) কেহ কেহ "মস্তকোন্নত করিল" এইরূপ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা ভাল হয় না। "মস্তক উন্নত" এই দুই পদ পৃথক্ রাখাই কর্ত্তব্য। (২৬) কোন কোন ব্যক্তি "সোৎসুকচিত্তে" এই রূপ প্রয়োগ করেন,—তাহা অসাধু। যেহেতু উৎসুক শব্দই বিশেষণ, তৎপূর্ব্বে আবার স যোগ করিবার প্রয়োজন নাই।

উক্তরূপ যে সকল অসাধু প্রয়োগের কথা উল্লিখিত হইল, গবর্ণমেণ্টের আদালত সকলেই ইহাদের সমধিক প্রচলন; অতএব তথাকার কৃতবিদ্য মহাশয়েরা যত্নবান্ না হইলে এ সকলের সংশোধনের উপায় নাই। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, আমাদের প্রদর্শিত অসাধু প্রয়োগ সকল কুশাগ্রমতি বৈয়াকরণেরা ব্যাকরণের কূটতাসাহায্যে সাধু করিতে না পারেন এমত নহে, কিন্তু চলিত ভাষায় ব্যাকরণের কূটতাযোজনা করিয়া অনার্ষ অপপ্রয়োগ রক্ষাকরা আমাদিগের অভিমত নহে। এই জন্যই আমরা ঐ সকলকে অসাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম।

উপসংহার।

আমাদের পুস্তক বহ্বায়ত হইয়া উঠিল। ইহার আর অধিক বিস্তৃতি করা এক্ষণে সুবিধাজনক হইতেছে না। অতএব কতকগুলি গ্রন্থ ও গ্রন্থকারসম্পৃক্ত বিবরণ সঙ্ক্ষেপে লিখিত হইল—সে বিবরণ এই———

জেলা নদিয়ার অন্তর্গত কাঁচকুলিগ্রামনিবাসী ৺ তারাশঙ্কর তর্করত্ন কাদম্বরী ও রাসেলাস নামক দুইখানি বাঙ্গালা পুস্তক লেখেন। ১ম খানি সংস্কৃতের ও ২য় খানি ইঙ্গরেজির অনুবাদ। কাদম্বরী দেশমধ্যে বহু-সমাদৃত।———২৪ পরগণার বড়িশাগ্রাম নিবাসী শ্রীযুত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার বিষ্ণুপুরাণ, কল্কিপুরাণ, পরাশরসংহিতা প্রভৃতি অনেক সংস্কৃতগ্রন্থের অনুবাদ করিয়া এবং সময়ে সময়ে পরিদর্শক, বিজ্ঞানকৌমুদী

প্রভৃতি সংবাদপত্র প্রচারকরিয়া বঙ্গভাষার যথেষ্ট সৌষ্ঠবসম্পাদনকরিয়াছেন।——ঢাকা জিলার অন্তর্গত ভয়াকরগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব, প্রভাতচিন্তা, নিভৃতচিন্তা, ভ্রান্তিবিনোদ, সঙ্গীত মঞ্জরী, ও সমাজ শোধনী এই কয়েকখানি পুস্তক রচনাকরিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ইনি বান্ধব নামক পত্রের সম্পাদক। কালীপ্রসন্ন বাবুকে "বঙ্গদেশের শিরোরত্ন" বলিয়া অনেকের বোধ আছে; তাঁহার নিভৃতচিন্তা পাঠ করিলে, বোধ হয়, সকলেরই সেই বোধ হইবে।——কলিকাতার ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহ হুতোমপেঁচার নক্সা লিখিয়াছেন এবং সমস্ত মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছেন। হুতোমপেঁচা রহস্যপূর্ণ হইলেও উহার অভ্যন্তরে বিলক্ষণ নীতি আছে। ভারতানুবাদে তাঁহাকে অনেক পণ্ডিতের সাহায্য লইতে হইয়াছিল।——জিলা নদিয়ার অন্তর্গত গোস্বামী দুর্গাপুর নিবাসী ৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কবিতামালা, মিত্রবিলাপ, কাব্যকলাপ, রাজবালা, মেঘদূত, বাঙ্গালার ইতিহাস, নানাপ্রবন্ধ প্রভৃতি অনেকগুলি পুস্তকের প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি অকালে কালকবলিত না হইলে তাঁহার নিকট হইতে আরও কত উপাদেয় বস্তু পাওয়া যাইত।——ঢাকার ৺ হরিশ্চন্দ্র মিত্র পদ্যকৌমুদী, কবিতাকৌমুদী, চারুকবিতা, নির্ব্বাসিতা সীতা, কীচকবধ কাব্য ও মিত্রপ্রকাশ রচনাকরিয়াছিলেন। হিন্দুহিতৈষিণী পত্রিকা ইঁহারই দ্বারা সম্পাদিতহইত। ইনি পূর্ব্ব বাঙ্গালার একজন খ্যাতনামা কবি।——কলিকাতার সন্নিহিত সুঁড়োগ্রাম নিবাসী ডাক্তরোপাধিক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্রাকৃত ভূগোল, শিল্পিকদর্শন ও বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। বিবিধার্থ সঙ্গ্রহের বিষয় এই পুস্তকের ৩০০ পৃষ্ঠে একবার উল্লিখিত হইয়াছে। রাজেন্দ্র বাবু প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধায়ী বলিয়া দেশমধ্যে বিখ্যাত——কলিকাতার ৺ নীলমণি বসাক আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস, বত্রিশ সিংহাসন, নবনারী ও কয়েক খণ্ড ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিয়া বাঙ্গালাপাঠীদিগের বিস্তর উপকার করিয়াছেন।——কলিকাতা—

নিবাসী ৺ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (রেবেরেণ্ড কে, এম, বানুর্জী বলিয়া প্রসিদ্ধ) এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বেঙ্গালিন্সিস্, স্ত্রীশিক্ষা, ষড়্‌দর্শন-সংবাদ প্রভৃতি অনেকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ইহাঁর ভাষা কিঞ্চিৎ ইঙ্গরেজি-গন্ধি এবং প্রায় সকল গ্রন্থই খ্রীষ্টান ধর্ম্মের নিতান্ত পক্ষপাতী সত্য, কিন্তু ইহাঁর গ্রন্থ হইতে অনেক বিষয়ের অনেক তথ্য শিক্ষা করিতে পারা যায়।——জেলা খুল্‌নার অন্তর্বর্ত্তী সেনহাটীগ্রাম-নিবাসী শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (বৈদ্যজাতীয়) সদ্ভাবশতক, মোহভোগ, কৈবল্য-তত্ত্ব প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। সদ্ভাবশতকে গ্রন্থকারের চিন্তাশীলতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।——২৪ পরগণার অন্তর্গত বোড়ালগ্রামবাসী শ্রীযুত রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মধর্ম্মের বক্তৃতা, ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা, হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা, সেকাল আর একাল, প্রভৃতি অনেক গুলি বাঙ্গালা পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার সকল পুস্তকই প্রায় ব্রাহ্মধর্ম্মবিষয়ক, এবং বক্তৃতাই তন্মধ্যে অধিক।——বর্দ্ধমানান্তর্গত রামচন্দ্রপুর নিবাসী শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ রায় "রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী" নামক বৃহদাকারের একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। উহার অভ্যন্তরে অবসর সরোজিনী, নিভৃতনিবাস, লৌহকারাগার, অনলে বিজলী, তারক-সংহার, হিরণ্ময়ী প্রভৃতি পদ্য ও গদ্যে লিখিত ছোট বড় অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে। তদ্ভিন্ন তিনি সংস্কৃত মূল রামায়ণকে অবলম্বন করিয়া পদ্যে তাহার অনুবাদ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার কবিত্ব বিশেষ প্রশংসনীয়।——গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরনিবাসী ৺ লোহারাম শিরোরত্ন দুই খণ্ড বাঙ্গালা ব্যাকরণ, সংস্কৃত মালতী মাধব নাটকের অনুবাদ ও নীতি-পুষ্পাঞ্জলি নামক একখানি পদ্য পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। লোহারামের বাঙ্গালা ব্যাকরণ দেশমধ্যে বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ।——অম্বিকা-কাল্‌না-নিবাসী শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন বৃহৎ ও ক্ষুদ্র দুই খণ্ড বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ১ম ও ২য় ভাগ কাব্যোদ্যান, পদ্যকৌমুদী, কৌতুক কথা প্রভৃতি কয়েকখানি বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়নকরিয়াছেন। ইহার কয়েক

খানি অনেক বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে অধীত হইয়া থাকে।——মুর্শীদাবাদ— বহরমপুরনিবাসী ডাক্তর-উপাধিযুক্ত রামদাস সেন তিন ভাগ ঐতিহাসিক রহস্য ও রত্ন রহস্য নামক পুস্তক গুলি রচনা করিয়াছেন। এই সকল পুস্তকে ভারতের পুরাতন তত্ত্বের বহুল অনুসন্ধান লক্ষিত হইয়া থাকে।—চুঁচুড়া নিবাসী শ্রীযুত নিমাইচাঁদ শীল এঁরাই আবার বড়লোক, চন্দ্রাবতী, ধ্রুবচরিত্র ও তীর্থমহিমা নামে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট নাটক এবং সুবর্ণবণিকের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত এবং বৈশ্যত্ব সংস্থাপন বিষয়ক গ্রন্থ এবং আর আর কয়েকখানি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনাকরিয়াছেন।———চুঁচুড়ায় কৃতনিবাস শ্রীযুত ব্রহ্মমোহনমল্লিক রণজিৎসিংহের জীবনচরিত লিখিয়াছেন এবং ইউক্লিডের জ্যামিতির অত্যুৎকৃষ্ট বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন।——— মজিলপুরনিবাসী শ্রীযুত শিবনাথ শাস্ত্রী নির্ব্বাসিতের বিলাপ, মেজবৌ, হিমাদ্রিকুসুম, পুষ্পমালা ও আর আর কয়েকখানি ক্ষুদ্র পুস্তকের রচনা করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মবিষয়ে ইহাঁর বক্তৃতা সকল বিলক্ষণ প্রীতিপ্রদ।— জিলা নদিয়ার অন্তর্গত গোস্বামী-দুর্গাপুর-নিবাসী শ্রীযুত রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় স্বাস্থ্যরক্ষা ও ভূবিদ্যা নামক দুই খানি পুস্তক রচনাকরিয়াছেন। ঐ দুই পুস্তকই অনেক বিদ্যালয়ে প্রচলিত।———কোণনগর-নিবাসী শ্রীযুত যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় তিন ভাগ পদ্যপাঠ, ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সেক্সপিয়রের গল্প লিখিয়াছেন। ইহাঁর পদ্যপাঠগুলি প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত।———ঢাকার অন্তর্গত তেওতাগ্রাম-নিবাসী শ্রীযুত রজনীকান্ত গুপ্ত পাণিনিবিচার, সিপাহিযুদ্ধের বিবরণ, ভারতকাহিনী, সাহিত্যসংগ্রহ, প্রবন্ধকুসুম, নবচরিত প্রভৃতি অনেকগুলি ভাল পুস্তক লিখিয়াছেন।———কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত (সিবিলিয়ান্) "ইউরোপে তিন বৎসর" "বঙ্গবিজেতা" "মাধবীকঙ্কণ" প্রভৃতি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য ও অপরাপর বিষয়ে ইহাঁর ইঙ্গরেজিতে লিখিত প্রবন্ধও আছে।——— গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরনিবাসী শ্রীযুত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় রাজস্থানের

পুরাবৃত্ত, জয়াবতীর উপাখ্যান, মণিমালিনী নাটক, পদ্যপাদপ, কবিচরিত প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন। আমাদের এই পুস্তকের প্রণয়নসময়ে কবিচরিত হইতেও অনেক সাহায্য পাওয়াগিয়াছে।——কলিকাতায় কৃতনিবাস ৺ মধুসূদন মুখোপাধ্যায় গার্হস্থ্য পুস্তকালয়ের সংসৃষ্ট থাকিয়া ছোট বড় অনেকগুলি বাঙ্গালাপুস্তক রচনাকরিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সুশীলার উপাখ্যান বহুসমাদৃত।——গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরনিবাসী শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় মৃণ্ময়ী, বিমলা, দুইভগিনী, কমলকুমারী, মা ও মেয়ে, ও প্রতাপ সিংহ নামক কয়েক খানি উপন্যাস পুস্তক লিখিয়াছেন। এগুলি পাঠকদিগের বিলক্ষণচিত্তাকর্ষক ও বহু-সমাদৃত।——জেলা যশোহরের অন্তর্গত মহেশপুর নিবাসীশ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী নরদেহনির্ণয়, অর্থব্যবহার, ও প্রকৃতি-পাঠ প্রণয়নদ্বারা বিদ্যার্থী ছাত্রবৃন্দের উপকার করিয়াছেন।—২৪পরগণার অন্তর্গত মজিলপুরনিবাসী শ্রীযুত হেমচন্দ্রভট্টাচার্য্য সমস্ত বাল্মীকিরামায়ণের বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন।—বর্দ্ধমানমহারাজ ৺মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর মহাভারত ও রামায়ণের বাঙ্গালা অনুবাদ করাইয়া বাঙ্গালা পাঠার্থীদিগের বিশেষ ইষ্টসাধন করিয়াছেন।——নদিয়া জিলার অন্তর্গত মামজোয়ানি নিবাসী ৺ শ্যামাচরণ সরকার (ব্রাহ্মণ) ব্যবস্থাদর্পণ রচনা-করিয়া আইন ব্যবসায়ী লোকের যে কত উপকার করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। তাঁহার রচিত বাঙ্গালাব্যাকরণ প্রভৃতি আরও কয়েক খানি পুস্তক আছে।——কলিকাতার শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কড়ি ও কোমল, ছবি ও গান, বৌঠাকুরাণীর হাট, ইউরোপপ্রবাসীর পত্র প্রভৃতি কয়েক খানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ইনি একজন সুকবি।——কলিকাতায় কৃতনিবাস শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন শব্দসার নামকউৎকৃষ্ট বাঙ্গালা অভিধান দশকুমার ও রচনাসার প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন। ২৪ পরগণার অন্তর্গত কোদালিয়াবাসী ৺আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কলিকাতা তত্ত্ববোধিনী সভায় অবস্থিতি পূর্ব্বক বেদান্তসম্পৃক্ত অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন।—নবদ্বীপনিবাসী

শ্রীযুত তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় ভূগোলবিবরণ ও ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রণয়ন দ্বারা বাঙ্গালা পাঠীদিগের বিস্তর উপকার সাধন করিয়াছেন। ভূগোলবিবরণ সর্ব্বত্র বহুসমাদৃত।——কলিকাতানিবাসী শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নীতিবোধ ও টেলেমেকসের কিয়দংশ প্রচারিত করিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে নীতিবোধ দেশমধ্যে বহুলপ্রচার ছিল।——কলিকাতার শ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সরোজিনী, পুরুবিক্রম ও অশ্রুমতী নামক তিন খানি সুন্দর নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন।—— নদিয়ার অন্তর্গত গরীবপুরনিবাসী শ্রীযুত যদুনাথ মুখোপাধ্যায় (ডাক্তর) শরীরপালন, ধাত্রীশিক্ষা, জ্বরচিকিৎসা, রোগবিচার, চিকিৎসাকল্পক্রম, চিকিৎসাদর্শন, উদ্ভিদবিচার প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থের প্রণয়ন করিয়াছেন। যদিও ইহার মধ্যে অধিকাংশই চিকিৎসাবিষয়ক, তথাপি তদ্দ্বারাও বাঙ্গালাভাষার অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।——চুঁচুড়াবাসী শ্রীযুত অক্ষয়চন্দ্র সরকার গোচারণের মাঠ প্রভৃতি কয়েক খানি পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন সাধারণী ও নবজীবন নামক সাময়িক পত্রিকার ইনি সম্পাদক। বঙ্গভাষার অনুশীলনে নিরত থাকিবার জন্যই ইনি অপর বিষয়কার্য্য ত্যাগ করিয়াছেন।——কলিকাতার প্রসিদ্ধ শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী দীপনির্ব্বাণ, পৃথিবী, বসন্তোৎসব, ছিন্নমুকুল, মালতী, গাথা প্রভৃতি অনেকগুলি পুস্তকের প্রণয়ন করিয়াছেন। ভারতী নামে যে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, এক্ষণে ইনিই তাহার সম্পাদিকা। ফলতঃ দেবী স্বর্ণকুমারী অস্মদ্দেশীয় কামিনীকুলের মধ্যে একটী কমনীয় রত্ন।

এতদ্ভিন্ন, কলিকাতার দক্ষিণ বড়িশাগ্রামনিবাসী ৺জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, লাঙ্গলবেড়েনিবাসী ৺ভরতচন্দ্র শিরোমণি, কলিকাতায় কৃতনিবাস, শ্রীযুত নীলমণি মুখোপাধ্যায়—নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়—প্রতাপচন্দ্র ঘোষ—সূর্য্যকুমার অধিকারী—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—৺রামকমল ভট্টাচার্য্য—প্রসন্নকুমারসর্ব্বাধিকারী—মুক্তারাম

বিদ্যাবাগীশ—রামনারায়ণবিদ্যারত্ন—চন্দ্রকান্ততর্কভূষণ—মধুসূদনবাচস্পতি—দ্বারকানাথরায়—হরিমোহনগুপ্ত, কালনার তারানাথতর্কবাচস্পতি—কৃষ্ণকিশোরবন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা শিবপুরের ৺হরিনাথন্যায়রত্ন—রামকৃষ্ণপুরের শ্রীযুত কৃষ্ণকমলভট্টাচার্য্য—শান্তিপুরের জয়গোপালগোস্বামী—হালিসহরের ৺গোপালচন্দ্রবন্দ্যোপাধ্যায়—চুঁচুড়ার শ্রীযুতনিমাইচরণসিংহ, গোপালচন্দ্রগুপ্ত—বহরমপুরের রামনারায়ণবিদ্যারত্ন—নবদ্বীপের দ্বারকানাথভট্টাচার্য্য—ও মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—দিনাজপুরের মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী-কোণনগরের শিবচন্দ্র দেব—সুবর্ণপুরের ৺ সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—বলাগড়—চাঁদড়ার রামনারায়ণ মিত্র—খিদিরপুরের ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—২৪ পরগণার কাঁঠালপাড়ানিবাসী সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ভাটপাড়ানিবাসী কৃষ্ণচন্দ্র রায়—হুগলীর ৺হরচন্দ্র ঘোষ—রাণাঘাটের শ্রীযুত কালীময় ঘটক, চট্টগ্রামের নবীনচন্দ্র সেন—হুগলী—কৈকালানিবাসী চন্দ্রনাথ সেন—নৈহাটীর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বর্দ্ধমান—গঙ্গাটিকুরীনিবাসী ইন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রভৃতি বাঙ্গালা গ্রন্থরচয়িতা অনেকানেক মহাশয়দিগের বিষয়ে এবং তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ সকল বিষয়ে এবারে বিশেষ কোন কথা বলিতে পারিলাম না। যদি আমাদিগের জীবদ্দশায় এ পুস্তকের ভাগ্যে পুনঃ সংস্করণ সঙ্ঘটিত হয়, তাহা হইলে তৎকালে আবার বাঞ্ছানুরূপ কার্য্যের কিছু না কিছু সংসাধন করিবার চেষ্টা করিব।—এবার এই পর্য্যন্ত।

———০:০:০———

সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র।

পত্র	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১	১২	১২৪০	১৩৪০
৩৭	১৭	করতি	কিরতি
৭৮	১০	ভাগায়	ভাষায়
৭৯	৯	জায়াবতী	জয়াবতী
ঐ	১৯	স্বাভাবাদি	স্বভাবাদি
৯৪	১৯	পূত্র	পুত্র
ঐ	২০	সে বাস্ত বাটী	যে বাস্ত বাটী
১০৯	১৭	দয়া যাঁরে সতত	সদা যাঁরে সদয়া
১১২	১০	রাজারে	বাজারে
১১৭	২	প্রবহমাণ	প্রবাহিণী
১১৯	৭	কিঙ্কর	কিঙ্করী
১৫৯	৪	১৩৯৬	১৬৯৬
১৮৮	২২	তিনি	তিন
১৯১	২৫	দর্শেন	দর্শনে
২৫৫	১৯	করাইতেছেন	করাইয়াছেন
২৭২	২৩ | ২৪	ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্যকলাপ	ক্ষত্রিয়োচিত আচার, বীরোচিত সাহস, প্রেমিকোচিত অনু-রাগ, ধার্ম্মিকোচিত কার্য্যকলাপ,
২৭৫	৫	দর্শনমাত্র	দর্শনমাত্রে

রাজা লক্ষ্মণসেনের প্রদত্ত তাম্রশাসনের

প্রতিলিপি।

এই স্থলে স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র তাম্রফলকে
উৎকীর্ণ একটী দেবীমূর্ত্তি কীলক-
দ্বারা সম্বদ্ধ আছে।

ওঁ নমো নারায়ণায়।

বিদ্যুদ্‌যস্য মণিদ্যুতিঃ ফণিপতে র্ব্বালেন্দুরিন্দ্রায়ুধং
বারি স্বর্গতরঙ্গিণী সিতশিরোমালা বলাকাবলিঃ।
ধ্যানাভ্যাসসমীরণোপনিহিতঃ শ্রেয়োঽঙ্কুরোদ্‌ভূতয়ে
ভূয়াদ্বঃ স ভবার্ত্তিতাপ-ভিদুরঃ শম্ভোঃ সপর্য্যাম্বুদঃ ॥১॥

আনন্দোঽম্বুনিধৌ চকোরনিকরে দুঃখচ্ছিদাত্যন্তিকী-
রুদ্ধাবেহতমোহতীরতিপতাবেকোঽহ মেবেতিধীঃ। (?)
যস্যামী অমৃতাত্মনঃ সমুদয়স্ত্যাশুপ্রকাশাজ্জগ-
ত্যত্রের্ধ্যানপরস্য বা পরিণতজ্যোতিস্তদাস্তাংমুদে ॥ ২ ॥

সেবাবনম্রনৃপকোটিকিরীটরোচিরম্বুল্লসৎপদনখদ্যুতিবল্লরীভিঃ।
তেজোবিষজ্বরমুষো দ্বিষতা মভূবন্ ভূমীভুজঃস্ফুটমথৌষধনাথবংশে ॥৩॥

আকৌমারবিকস্বরৈ র্দিশিদিশি প্রস্যন্দিভির্দোর্যশঃ-
প্রালেয়ৈররিরাজবক্ত্রনলিনম্লানীঃ সমুন্মীলয়ন্।
হেমন্তঃ স্ফুটমেব সেনজননক্ষেত্রৌঘপুণ্যাবলী-
শালিশ্লাঘ্যবিপাকপীবরগুণ স্তেষা মভূদ্বংশজঃ ॥৪॥

যদীয়ৈরদ্যাপি প্রচিতভুজতেজঃসহচরৈ র্যশোভিঃশোভন্তেপরিধিপরি-
[ণদ্ধাঃকরদিশঃ। (?)
ততঃকাঞ্চীলীলাচতুর চতুরম্ভোধিলহরীপরীতোর্ব্বীভর্ত্তাঽজনি বিজয়-
[সেনঃ স বিজয়ী ॥৫॥

প্রত্যক্ষঃ কলিসম্পদা মনলসো বেদায়নৈকাধ্বগঃ
সদ্গ্রামঃ শ্রিতজঙ্গমাকৃতি রভূ দ্বল্লালসেন স্ততঃ।
যশ্চেতো যমমেব শৌর্য্যবিজয়ী দস্তৌষধং তৎক্ষণা
দক্ষীণা রচয়াঞ্চকার বশগাঃ স্বস্মিন্ পরেষাং শ্রিয়ঃ ॥ ৬ ॥

সংভুক্তান্যদিগঙ্গনাগুণগণাভোগপ্রলোভাদ্দিশা
মীশৈরংশসমর্পণেন ঘটিত স্তত্ত্বপ্রভাবস্ফুটৈঃ।
দোরুন্মক্ষপিতারি-সঙ্গর রসো রাজন্য ধর্ম্মাশ্রয়ঃ
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনভূপতিরতঃ সৌজন্যসীমাঽজনি ॥৭॥

স খলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিতশ্রীমজ্জয়স্কন্ধবীরান্মহারাজাধিরাজ-শ্রীবল্লালসেনপাদানুধ্যানাৎ পরমেশ্বরপরম বীরসিংহপরম স্তম্ভাবক মহা-রাজাধিরাজঃ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবঃ সমুদ্রং প্রতীর্য্য রাজরাজন্যকরাজ্ঞীরাণক রাজপুত্র রাজামাত্য পুরোহিত ধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাসান্ধিবিগ্রহিক মহাসেনাপতি মহামুদ্রাবিক্ষত অন্তর দুর্ভয়দ পরিক মহাক্ষপাটলিক মহাপ্রতীহার মহা-ভোগিক মহাপীঠপতি মহাগণপ দৌঃস্বারিক চৌরোদ্ধরণিক নৌবলহস্ত্যশ্ব-গোমহিষাজাবিকাদিব্যাপ্রতকগৌল্মিক দণ্ডপাণিক দণ্ডনায়ক বিষয়পত্যা-দীন্ বন্যাংশ্চ সকল রাজপাদোপজীবিনোঽক্ষধ্যক্ষপ্রচারোক্তানিহাকীর্ত্তি-তান্ চড়ভচ্ছজাতীয়ান্ জানপদান্ ক্ষেত্রকরান্ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তরান্ যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতিচ। মত মস্ত ভবতাম্—যথা পৌণ্ড্র বর্দ্ধনস্তকান্তঃপাতিনি খাড়ীমণ্ডলিকান্তল্লপুরচতুরকে পূর্ব্বে শান্ত্যশাবিক-প্রভাসশাসনং সীমা—দক্ষিণে চিতাড়িখাতার্দ্ধং সীমা—পশ্চিমে শান্ত্য-শাবিক রামদেবশাসন পূর্ব্বপার্শ্বঃ সীমা—উত্তরে শান্ত্যশাবিক বিষ্ণুপাণি-গড়োলীকেশব গড়োলীভূমী সীমা—ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নঃ শ্রীমদুগ্রমাধব